# মির্যা আসাদুল্লাহ্ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতা : বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ


তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ ইস্রাফীল
অধ্যাপক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০।

গবেষক
মোঃ আলমগীর হোসেন
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২

উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।


নভেম্বর , ২০১৬

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণা পত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য দাখিলকৃত মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতা : বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব, একক, ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভখানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য অথবা অন্য কোন সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দাখিল করিনি এবং আমার জানা মতে, ইতঃপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

(মোঃ আলমগীর হোসেন )
পিএইচ.ডি গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮১
শিক্ষাবর্ষ : ২০১১-২০১২
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন কর্তৃক দাখিলকৃত মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ *গালিবের উর্দু কবিতা : বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ* শীর্ষক পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি উক্ত গবেষকের একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চুড়ান্ত কপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য দাখিল করার অনুমতি প্রদান করছি।

( ড. মোঃ ইস্রাফীল )
অধ্যাপক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা-১০০০

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতা : বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ইস্রাফীল। তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নির্দেশনা ও আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা সহজ হতো না। তাই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুস সবুর খান এ বিষয়ে আমাকে গুরত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেছেন। অত্র বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে এ কাজটি সমাধা করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তাছাড়া আমার নিজস্ব বিভাগ ( ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগ )-এর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. জাফর আহমদ ভুঁইয়া, অধ্যাপক ড. মাহমুদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, সহযোগী অধ্যাপক ড. রশীদ আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক ড. রেজাউল করীম, সহকারী অধ্যাপক জনাব গোলাম মাওলা, সহকারী অধ্যাপক জনাব্ হুসাইনুল বান্না প্রমুখের কাছ থেকে পেয়েছি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণাকর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহার করেছি। এসকল লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আমাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষকরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির গ্রন্থাগার সহকারী মোঃ আলমাছ এবং রীনা রানী সরকার। এজন্য আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

বিশেষভাবে স্মরণ করছি তাঁদের কথা, যাদের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমাকে একাডেমিক কর্মকাণ্ডসহ এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যুগিয়েছে। তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও প্রিয় সহধর্মিনী মিসেস রাশেদা গুলশান আরা।

গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর , ২০১৬

*Dhaka University Institutional Repository*

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব

(জন্ম ১৭ নভেম্বর , ১৭৯৭- মৃত্যু ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯)

*Dhaka University Institutional Repository*

# সূচিপত্র

**ভূমিকা** **১-৩**

**প্রথম অধ্যায়** **৪-৩৩**
মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের জীবনকথা

**দ্বিতীয় অধ্যায়** **৩৪-১৩০**
মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য

**তৃতীয় অধ্যায়** **১৩১-১৮০**
মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপ

**চতুর্থ অধ্যায়** **১৮১-২৭০**
মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিক

**উপসংহার** **২৭১-২৭২**

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

উর্দু কাব্য জগতে মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব এক সুপরিচিত নাম। তিনি ছিলেন কালের কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ এক যুগ শ্রেষ্ঠ কবি। শতাব্দী কাল পরেও কাব্য রসিকগণ গালিবকে উর্দু কাব্য সাহিত্যের সর্বোত্তম চূড়া বলে গণ্য করেন। জীবিতকালে কবিদের ভাগ্যে স্বীকৃতি জুটে না. এ প্রচলিত প্রবাদটি গালিবের বেলায় ছিল ব্যতিক্রম। তিনি জীবিত কালেই সারা ভারতে মহৎ কবি প্রতিভা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তার সময় সর্বাধিক মেধাবী কবি, দার্শনিক, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীল ও সর্বজনীন সাহিত্য প্রতিভা।

মির্যা গালিব ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর রোজ বুধবার আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রকৃত নাম হলো 'আসাদুল্লাহ খাঁ । গালিব তার উপনাম। 'মির্যা নওশাহ' তার উপাধি। তার পিতার নাম মির্যা আব্দুল্লাহ বেগ ও মায়ের নাম ইয্যাতুননিসা। তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন জাতিতে তুর্কী এবং আইবেক বংশধর।

গালিব অল্প বয়সে পিতৃহারা হন। পিতার মৃত্যুর পর তার লালন-পালনের ভার নেন চাচা নসরুল্লাহ বেগ। নসরুল্লাহ বেগ মারাঠা শাসনাধীনে আগ্রার সুবাদার ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরই যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাতির পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তিনিও ইনতিকাল করেন। গালিবের বয়স তখন নয় বছর। গালিব নানার বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মাতৃভাষা উর্দু ছাড়াও গালিব ফার্সী ভাষায়ও বুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সাহিত্য ও কবিতার একটা বড় অংশ ফার্সী ভাষায় রচিত। তিনি আরবি ভাষাও জানতেন। তার প্রথম শিক্ষক ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ মোয়াজ্জম। ইরান থেকে আগত নও মুসলিম 'মোল্লা আব্দুস সামাদ' নামক বিজ্ঞ পর্যটক গালিবের লেখাপড়ায় বিশেষ সাহায্য করেন।

গালিব নিজে এবং তার পারিপার্শ্বিক জগতই ছিল তার আসল শিক্ষাদাতা। তার শৈশব কাটে আগ্রার গুলাবখানা নামে পরিচিত একটি মহল্লায়। বলতে গেলে এটা ছিল ফার্সী শিক্ষার কেন্দ্র। এই অনুকূল পরিবেশে থেকে তিনি ফার্সী ভাষায় পারদর্শি হয়ে উঠেন। এরপর তিনি দিল্লী চলে আসেন। সেখানেও তিনি পড়াশুনার ভাল পরিবেশ পান। জওক, মুমিন-এর মত কবি এবং মাওলানা ফজলে হক্ক খায়রাবাদী, শাহ ইসমাইল, শাহ আব্দুল আজিজ, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী এরকম বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন ঐ এলাকার বাসিন্দা। তাই তিনি এসকল পণ্ডিতদের সংস্পর্শে থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। যৌবনকাল পর্যন্ত গালিব মাতুলালয়ে অতি প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন। গালিব অল্প বয়সেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল 'উমরাও বেগম'।

মির্যা গালিব পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যার প্রতিফলন ঘটে তার সৃষ্ট কাব্যে। তিনি বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেন এবং মসনভী 'আবরা-ই গোহারবারে' এ

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেন। এসব কারণে তার মধ্যে জীবন ও কাব্য সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তা চেতনার সাথেও মির্যা গালিবের চিন্তার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরো উন্নত হয়। ১৮৩৭ সালে 'মায়খানায়ে আরজু' শিরোনামে তার ফার্সী কবিতা ও গদ্য সংকলন প্রকাশিত হয় এবং তার সাথে কিছু নতুন লেখা সংযোজিত হয়।

১৮৫৪ সালে দিল্লিতে কবি জওকের ইনতিকাল হলে গালিবকে সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সভাকবি নিয়োগ করা হয়। তার দায়িত্ব পড়ে সম্রাটের গযল সুরের পরিমার্জনের। নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার বলে অতি অল্প দিনেই গালিব সম্রাটের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। সম্রাট গালিবকে 'নিযামুদ্দৌলা দবিরুল মুলক নিযাম জং' খেতাবে ভূষিত করেন। তাকে তৈমুরদের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পরে সম্রাট নির্দেশ দেন যে, ইতিহাসের শুরু হবে বিশ্ব জগতের সৃষ্টির সময় থেকে। এ আদেশ অসম্ভবকে সম্ভব করার আদেশ। যা পালন করা অসাধ্য। ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের নাম হবে 'মেহরে নিমরোজ' (মধ্যহ্ন সূর্য) আর দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হবে 'মাহ-ই নিমসাহ' (পূর্ণিমার চাঁদ)। ১৮৫৪ সালের আগষ্টে গালিব ব্যক্তিগতভাবে ইতিহাসের প্রথম খণ্ডটি সম্রাটকে উপহার দেন। সম্রাট খুশি হয়ে গালিবকে একটি কৃতিত্বের সনদ দেন। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়নি। আসলে গালিবও কোন ঐতিহাসিক ছিলেন না। কেবল ভাতার কারণেই তাকে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। এতে গালিবের আর্থিক অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হয়। কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সম্রাটকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী এ মহান কবি ইন্তেকাল করেন।

বাল্য শিক্ষক মোল্লা আব্দুস সামাদের তত্ত্বাবধানে বাল্যকালেই মির্যা গালিবের কবিতায় হাতেখড়ি। গালিব ফার্সী কবিতার মাধ্যমে কাব্যজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে শুধু উর্দু কার্ব্য চর্চায়ই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

অফুরন্ত প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা, সৃজনশীল সততগতিশীল এই জ্যোতিষ্মান সব্যসাচী কবি মেধা ও মননের সাথে প্রাণের সংযোগ, বিশ্বাসের সঙ্গে বুদ্ধির সুষম বিন্যাস ঘটিয়ে হয়ে উঠেছিলেন পরিশ্রমি এক কাব্য স্রষ্টা। নিয়োগ পান দিল্লির তৎকালীন সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের সভা কবির পদে। তার অসামান্য কাব্য তৎপরতায় এ মহান উর্দু কবি আকর্ষণ করেন সমকালের পাঠক হৃদয়।

গালিব ছিলেন বিপুল অভিজ্ঞতা ও গভীর দৃষ্টি সম্পন্ন কবি। তার কবিতায় সরাসরি কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত, আশা-নিরাশা, আমোদ-বেদনার প্রতিফলন ঘটেছে তার বিভিন্ন রূপের কবিতায়। তবে গালিবের উর্দু গযল হলো তার কবিতার মণি মুকুট। তার উর্দু গজলের বিষয় বৈচিত্র্য ও

*Dhaka University Institutional Repository*

শিল্পরূপ অনন্য। তাসাউফ, দর্শন, প্রেম, কৌতুক প্রভৃতি বিষয় তার গযলকে করেছে সমৃদ্ধ।

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতা : বিষয় বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়াও নিম্নোক্ত চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত।

১। মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের জীবনকথা
২। মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য
৩। মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপ
৪। মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিক

**গবেষক**

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রথম অধ্যায়

## মির্যা আসাদুল্লাহ্ খাঁ গালিবের জীবন কথা

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের উর্দু সাহিত্যের নয়, সমগ্র বিশ্বের কবিদের মাঝে 'মির্যা গালিব' নামে পরিচিত। তাঁর উর্দু গজল বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। গালিব তাঁর উর্দু গজলের মাধ্যমে বিশ্ব-মানবের মন জয় করেছেন। তিনি বিশ্বে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। হাফিজ, ওমর খৈয়াম, রুমি, শেখ সাদী প্রমুখ কবিদের নাম উচ্চারণের সাথে সাথে 'গালিব' নামটিও স্বত:স্ফুর্তভাবে মুখে চলে আসে। রুমি ও সাদীর সঙ্গে গালিবের অনেক পার্থক্য । কারণ রুমির পরিচয় 'মসনবী'র রচয়িতা হিসেবে, সাদীর পরিচয় 'গুলিস্তা' ও 'বোস্তা'র রচয়িতা হিসাবে আর গালিবের পরিচয় 'গজল' রচয়িতা হিসেবে। হাফিজ, ওমর খৈয়াম, রুমী, সাদী এক হাজার বছর আগের মানুষ। তা সত্ত্বেও তাঁদের সাথে গালিবের নামটি বেঁধে দেয়া হয়েছে ফারসী সাহিত্যের সর্বশেষ ধ্রুপদী কবি হিসেবে এবং বিপুল জনপ্রিয়তা ও পারস্পরিক ঐতিহ্যের কারণে।

মহান কবি মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব মোগল বংশোদ্ভুত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম হলো. আসাদুল্লাহ বেগ খাঁ। গালিব তাঁর কাব্যিক নাম। মির্যা নওশা হলো তাঁর কুনিয়াতি নাম। দিল্লির বাদশাহ সিরাজুদ্দীন বাহাদুর শাহের পক্ষ হতে প্রাপ্ত খেতাব হলো নযমুদ্দৌলা দবীরুল মুলক্ খান বাহাদুর নিজাম জং। তিনি ১৭৯৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারতের আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন।[১]

মির্যা গালিবের জন্মতারিখ নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। সে মত পার্থক্যগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো-

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ মুহাম্মদ হুসাইন রিজবী বলেন, মির্যা গালিবের জন্ম তারিখ ৮ রজব ১২১২ হিজরী মোতাবেক ২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭ সালের চতুর্থ সোমবার।

মাওলানা গোলাম রসূল মেহের তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গালিব' এর মধ্যে একই জন্মতারিখ উল্লেখ করেন। ড. মালিক রাম সাহেবও তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'জিকরে গালিব' এর মধ্যে একই জন্ম তারিখের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দেন।

কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তির মতে মির্যা গালিবের সঠিক জন্ম তারিখ হলো- ৮ই রজব ১২১২ হিজরী মোতাবেক ৮ জানুয়ারী ১৭৯৭ সালে প্রথম সোমবার। তিনি বলেন মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব সোমবার দিন ভারতের আগ্রাতে সুবহে সাদিক এর সময় ইন্ডিয়ান স্টান্ডার্ড টাইম অনুযায়ী ভোর ৫ টা ৩৬ মিনিটে জন্ম গ্রহণ করেন।[২]

গালিব নিজেই নিজ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

গালিব ১২৮০ হিজরীতে তাঁর বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী নওয়াব আলাউদ্দীন আহমদ খাঁ রইস লোহারুর কাছে একটি পত্র লেখেন তাতে গালিব উল্লেখ করেন-

میں ۱۲۱۲ھ میں پیدا ہوا ہوں۔ اب کے رجب کے مہینے سے انسترواں برس شروع ہوا ہے۔ [৩]

গালিব বলেন, আমি ১২১২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছি। এখন রজব মাস থেকে ঊনসত্তর বছর শুরু হলো।

মির্যা গালিব অন্য আরেকটি চিঠিতে নওয়াবের প্রশংসা করতে গিয়ে অকপটে লিখে ফেলেন-

قاعدہ عام یہ ہے ۔ کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں لیکن یوں بھی ہوا۔ کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیجکر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ ۸ رجب ۱۲۱۲ھ کو مجھے روبکاری کے واسطے یہاں (یعنی دنیا میں) بھیجا۔ [৪]

সাধারনত নিয়ম এ যে, জলভাগ এবং স্থলভাগ উভয় জগতে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে পাপীরা সাজা পেতে থাকে। কিন্তু এটা হয় যে, আলমে আরওয়াহ এই গুনাহগারকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে সাজা দিতে থাকেন। সুতরাং ৮ রজব ১২১২ হিজরীতে অর্থাৎ পৃথিবীকে আমাকে কষ্ট ও কান্না করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

খাজা গোলাম গাউস খাঁ বিজনুর এর কাছে একটি চিঠিতে লেখেন-

حضرت! میں اب چراغ سہری ہوں۔ رجب ۱۲۸۲ھ کی تاریخ سے اکھتر روں برس شروع ہو گیا۔ [৫]

Dhaka University Institutional Repository

গালিব লেখেন, জনাব আমি এখন সকালের উদিয়মান সূর্য। ১২৮২ হিজরীর রজব মাসে ৭১ বছর শুরু হয়ে গেছে।

গালিব তাঁর ফার্সী দিওয়ানে নিজ জন্ম তারিখ সম্পর্কে একটি হৃদয়গ্রাহী রুবায়ী অলংকরণ করেছেন। যাকে মানব জীবনের বিখ্যাত একটি দর্পণও বলা যেতে পারে।

غالب چوزناسازی فرجام نصیب

ہم خوف عدو دارم وہم ذوق حبیب

تاریخ ولادت من از عالم قدس

ہم شورش شوق آمد وہم لفظ غریب[৬]

গালিব এবং শোর্স শোক দুটোই গণনার দিক থেকে ১২১২ হিজরীতে এসেছে এবং দুটোই গালিবের জীবনের একটি সঠিক জীবনী মূলক নকশা প্রকাশিত হয়েছে।

## নাম ও উপাধি

মির্যা গালিবের প্রকৃত নাম, পরিচয়, উপাধী ও মর্যাদা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যবহুল উর্দু ও ফার্সী গ্রন্থ রয়েছে। গালিবের মোট ১২ টি রচনাবলী রয়েছে। তার মধ্য থেকে ' দস্তম্বু' অন্যতম। দস্তম্বুতে গালিব সিপাহী- বিদ্রোহের সময়ে সংগঠিত কাহিনীর বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করেছেন। ইহাতে ১৮৫৭ সালের ১১ মে থেকে ১ লা জুলাই পর্যন্ত সময়ের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল এর বর্ণনার সাথে সাথেই তাঁর নিজ জীবনের কাহিনীও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এটি মুন্সি শিবনারায়ণ আরামের পরামর্শ অনুযায়ী ছাপা হয়। এবং ছাপানো সমাপ্ত করে প্রথমে হরগোপাল তোফতা ও পরে শিবনারায়নের কাছে উপস্থাপন করেন।[৭]

গালিব তাঁর নাম ও উপাধী সম্পর্কে দাস্তম্বুর কিছু অংখে মুন্সি শিবনারায়নের কাছে পত্রের মাধ্যমে লিখে পাঠান। যার নমুনা নিম্নরূপ:-

' سنو میری جان ! نوابی کا مجھ کو خطاب ہے نجم الدولہ اطراف و جوانب کے امراء سب مجھ کو نواب کہتے ہیں، بلکہ بعض انگریز بھی نہ چنانچہ صاحب بہادر نے جوان دنوں ایک رو بکاری بھیجی ہے ۔ تو لفافہ پر نواب اسد اللہ خان لکھا ہے ۔ لیکن یاد رہے ۔ کہ نواب کے لفظ کے ساتھ میرزا یا میر نہیں لکھتے ۔ یہ خلاف دستور ہے ۔ یانواب اسد اللہ خان لکھو یا میرزا اسد اللہ خان اور بہادر کا لفظ دونوں حال میں واجب اور لازم ہے۔[৮]

*Dhaka University Institutional Repository*

শোন, আমার জান! নবাব সাহেব আমাকে নজমুদ্দৌলা উপাধি দিয়েছেন। বাদশাহর আশপাশের সবাই আমাকে নবাব বলেন ও লেখেন। গালিব তাঁর চিঠিতে ফিটফাটের সাথে নিজের নাম নবাব আসাদুল্লাহ খাঁ লেখেন। কিন্তু মনে রেখ যে, নবাব শব্দের সাথে মির্যা অথবা মির না লিখ। এটা নিয়মের বিপরীত। অথবা নবাব আসাদুল্লাহ খাঁ লেখা অথবা মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ এবং বাহাদুর শব্দটি দুই অবস্থাতেই অবশ্যকীয় এবং অপরিহার্য।

মুন্সি হরগোপাল তোফতা মির্যা গালিবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনি চিঠিতে মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ কেন লিখলেন না, আপনি নামের পূর্বে মির্যা লিখেছেন কিন্তু মাওলানা নবাব কেন লিখলেন? এর উত্তরে গালিব নিম্নের বক্তব্যটি তুলে ধরলেন- একটি পত্রালাপের মাধ্যমে-

سنو صاحب ! لفظ مبارک م، ح، م ، د ( محمد) کے ہر حرف پر میری جاں نثار ہے ۔ مگر چونکہ یہاں سے ولایت تک حکام کی ہاں یہ لفظ یعنی محمد اسد اللہ خان نہیں لکھا جاتا ۔ میں نے نہیں موقوف کر دیا ہے ۔ رہا میرزا و مولانا نواب اس میں سے ام کو اور بھائی (منشی نبی بخش حقیر) کو اختیار ہے جو چاہو لکھو۔ [৯]

শোন সাহেব! সম্মান সূচক মিম, হা, মিম, দাল অর্থাৎ মুহাম্মদ এর প্রতিটি অক্ষরের উপর আমার অন্তর জুড়ে যায়। কিন্তু এ থেকে জন্ম পর্যন্ত এই শব্দ অর্থাৎ মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ লেখা হয়নি। আমিও মাফ করে দিয়েছি। মির্যা অথবা মাওলানা অথবা নবাব এতে তুমি এবং ভাই ( নবী বখশ হাকির) তোমাদের স্বাধীন মত যা চাও লেখো ।

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি তৈমুর রাজ বংশ ও রাজ দরবারে দরবারী ইতিহাসকার ছিলেন। তৈমুর বংশের সর্বশেষ বাদশাহ সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ জাফর মির্যা গালিবকে ১৮৫০ সালের জুলাই মাসের শুরুতে তৈমুরশাহী বংশের এক ইতিহাস ফারসী ভাষায় লেখার দায়িত্ব দেন এবং এ জন্যে গালিবকে রাজ দরবার হতে বার্ষিক ৬০০ টাকা ভাতা মঞ্জুর করেন। এছাড়াও বাদশাহ গালিবকে নজমুদ্দৌলা, দবীরুল মুলক ও নিজাম জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন।

গালিব এই ইতিহাস রচনা দু' খণ্ডে সমাপ্ত করার প্রয়াস চালান, প্রথম খণ্ড বাদশাহ তৈমুর থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত ও দ্বিতীয় খণ্ড আকবর থেকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পর্যন্ত। এ কাজে বিভিন্ন তথ্য সূত্র ও ঐতিহাসিক সামগ্রি সংগ্রহ করে ফারসিতে অনুবাদের জন্য ও সহযোগিতা করার জন্য বাদশাহ তার মন্ত্রী ও শাহী হাকিম আহসানউল্লাহ খাঁকে সহযোগী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দেন। কয়েক বছর প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করে প্রথম খন্ড লালকেল্লার শাহী ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়ে ১৮৫৪ সালে 'মিহরে নিমরোজ' নামে প্রকাশিত হয়। এবং দ্বিতীয় খণ্ড তথ্য সামগ্রীর অভাবে আর লেখা হলো না।

বাদশাহের সাহিত্য গুরু মুহাম্মদ ইব্রাহীম জওকের মৃত্যুর পর বাদশাহ তাঁর স্থানে গালিবকে পরামর্শদাতা ও শিক্ষা গুরু হিসেবে নিয়োগ দান করেন। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের পূত্র মির্যা ফখরুদ্দীনও গালিবের পরামর্শ নিতে শুরু করে দিলেন। মির্যা ফখরুদ্দীন এ জন্য গালিবকে বার্ষিক ৫০০ টাকা নির্ধারিত করে দিলেন। পাশাপাশি অযোধ্যায় শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ এর পক্ষ থেকেও গালিব বার্ষিক ওযিফা পেতে থাকেন।[১০]

## উপনাম

গালিব প্রথমে ফার্সি সাহিত্যের বিশেষ চর্চা করলেও আস্তে আস্তে তাঁর মন উর্দুর প্রতি নিবিষ্ট হয়। তিনি যখন উদু কবিতা চর্চা করেন তখন তিনি কাব্যে 'আসাদ' কাব্য উপাধী ব্যবহার করতেন। কিন্তু তিনি যখন শুনতে পারলেন যে, আরো একজন কবি এ কাব্য উপাধি গ্রহণ করে কাব্য চর্চা করছেন। তখন তিনি এ উপাধি বাদ দিয়ে 'গালিব' উপাধী গ্রহণ করলেন।

১৮২৯ সালে এই নতুন কাব্য উপাধি গ্রহণ করলেও, তাঁর পূর্ববর্তী যে সকল কবিতা তিনি লিখেছিলেন তার অনেক স্থানেই কবির স্বাক্ষররূপে আসাদ নামই রয়ে গেছে।[১১]

মুন্সি শিবনারায়ন আরাম একবার এক স্থানে ভুল করে মীর আম্মানির (আসাদ) একটি কবিতা মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের কবিতা মনে করেন। কিন্তু তিনি পরে জানতে পারলেন যে, এটি গালিবের কবিতা নয়। এসকল সমস্যা এড়ানোর জন্য গালিবের এক বন্ধু যার নাম মৌলভী ফজলে হক তিনি গালিব কে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি এ উপাধি বাদ দিয়ে দাও। গালিব বন্ধুর পরামর্শে পরবর্তীতে আসাদ উপাধী ত্যাগ করেন,এবং 'গালিব' ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। এ ব্যবহারে গালিবের দিওয়ান থেকে একটি উর্দু কবিতা নিম্নরূপ:-

ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور[১২]

পৃথিবীতে কথা বলার মতো মানুষ অনেক আছে

কিন্তু গালিবের আছে কথা বলার আলাদা যোগ্যতা

মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন আজাদ এর 'আবে হায়াত' নামক গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে ১২৪৫ হিজরী মোতাবেক ১৮২৯ সালে 'গালিব' উপনামে কাব্য চর্চার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর শেষ বয়সে তিনি উর্দুতে যে সকল গজল রচনা করেছেন তার মধ্যে থেকে ১২ টি গজলে 'আসাদ' উপনাম ব্যবহার করেছেন।

তবে অনেক জায়গায় উপনামের পরিবর্তে পুরো নাম লিখে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নরূপ:

مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں

وہ دلوالے کہاں وہ جوانی کدھر کی۔[১৩]

হে আসাদুল্লাহ খাঁ যুগ তোমাকে আহত করেছে

সেই হৃদয়বান ব্যক্তিরা কোথায়

আর সেই যৌবনই বা কোথায়

মাওলানা মোহম্মদ হোসাইন আজাদ 'আবে হায়াতের' অন্যত্র গালিবের ছদ্মনাম পরিবর্তন সম্পর্কে একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নরূপ: -

اسد تم نے بنائی یہ غزل خوب

ارے اور شیر رحمت ہے خدا کی۔[১৪]

আসাদ তুমি অনেক সুন্দর গজল নির্মাণ করেছে।,

আর ইহা তো খোদা পাকের অনুগ্রহ মাত্র।

## বংশ পরিচয় ও মর্যাদা

মির্যা গালিব ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক। তাঁর বংশও ছিল খুব উচ্চমানের এবং আভিজাত্য মণ্ডিত। গালিব নিজেই তাঁর বংশ-গৌরব সম্বন্ধে নিজে কণ্ঠে গেয়েছেন–

غالب از خاک پاک تورانیم

لاجرم در نسب فرھندیم۔[১৫]

"হে গালিব, তুরানের পবিত্র মাটিতেই তুমি জন্মেছ,

সে জন্যই তোমার উচ্চ বংশজাত গৌরব।

Dhaka University Institutional Repository

গালিব তাঁর বংশ মর্যাদা নিয়ে খুব গর্ববোধ করতেন। কারণ গালিবের বংশধরগণ তুরস্কদেশীয় আইবেক বংশ হতে উদ্ভুত সেলজুকীয় সম্রাটের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তুরস্কে এক সময় সেলযুকি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দীর্ঘ দিন যাবত সমস্ত ইরান, তুরান, শাম , রোমের উপর শাসন করেন। কয়েক শতক পর সেলযুকি বংশের রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এবং সেলযুকিদের অনেকে অভাব-অনটনের কারণে রুজির খোঁজে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। এদের মধ্য হতে তরমুসখান নামী এক আমিরজাদা সমরকন্দে বসবাস করতেন, আর এই আমিরজাদা তরমুসখান হলো মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের দাদা।[১৬]

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের পিতামহের নাম হলো কুকান বেগ খাঁ, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী একজন তুর্কী সৈনিক ছিলেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমরকন্দ থেকে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এদেশে তাঁর জানা শোনা কিছু লোক মারফত ক্ষমতাসীন রাজপুরুষদের সহায়তা লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্নর মইনুল মুলকের কাছে আশ্রয় নেন। নবাব মইনুল মুলক ১৭৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তাঁর আশ্রয়দাতা কেউ না থাকার কারণে তিনি লাহোরে চলে যান, লাহোরে খুব অল্প সময় অবস্থানের পর তিনি দিল্লীতে চলে আসেন এবং দিল্লীর তৎকালিন নবাব জুলফিকারউদ্দৌলা মির্যা নজফ খানের আশ্রয় লাভ করেন। মির্যা নজফ খানের সুপারিশক্রমে গালিবের পিতামহ কুকান বেগ খাঁ দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে চাকরি লাভ করেন। বাদশাহ শাহ আলম তাকে পঞ্চাশ ঘোড়সওয়ারের নায়ক করে দেন। সেই সঙ্গে তাকে পিহাসুর ( বুলন্দশহর জেলা) জায়গীরের দায়িত্ব দেন, যার দ্বারা তিনি তার সৈন্যদের খরচ চালাতে পারেন। শর্ত সাপেক্ষে এই চাকরি করা তাঁর কাছে মোটেও ভালো লাগছিলোনা। তিনি ছিলেন ভাগ্যান্বেষী ও অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের মানুষ। তিনি বুঝতে পারেন এখানে এই নামান্য বেতনের চাকুরীতে উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। তাই বাধ্য হয়ে তিনি এ চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন।

এরপর জয়পুরে মহারাজার অধীনে সেনা বাহিনীর চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি অল্প দিন চাকুরী করার পর আগ্রায় চলে আসেন।[১৭]

গালিবের পিতামহের ভারতে অবস্থান ও চাকুরী সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তারই পাঠানো এক পত্রের মাধ্যমে যে পত্রটি তিনি মুন্সি হাবিবুল্লাহ খান জকার কাছে পাঠিয়েছিলেন-

میں قوم کا ترک سلجھوقی ہوں ۔ دادا امیر ماور نے انھر سے شاہ عالم کے وقت میں ہندوستان میں آیا ۔ سلطنت ضعیف ہوگئی ۔ صرف پچاس گھوڑے اور نقارہ و نشان سے شاہ عالم کا نوکر ہوا ۔ ایک پرگنہ سیر حاصل ذات کی تنخواہ اور رسالے کی تنخواہ میں پایا۔ بعد انتقال اس کے جو طوائف الملوک کا ہنگامہ گرم تھا۔ وہ علاقہ نہ رہا۔[১৮]

আমি তুর্কীর সেলযুকী সম্প্রদায় ভুক্ত। আমার পিতামহ বাদশাহ শাহ আলমের সময় ভারতে এসেছিলেন, তখন সালতানাতের অবস্থা খুব দুর্বল ছিল। মাত্র ৫০ অশ্বারোহী

অধিনায়ক হিসেবে শাহ আলমের অধীনে চাকুরি নেন। সৈন্য দেখা-শোনা সহ শর্ত সাপেক্ষে এক জায়গীর লাভ করেন। তাঁর (শাহ আলম) মৃত্যুর পর যখন তাওয়ায়েফুল মুলুকের পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল, তখন আমি ( কুকান বেগ খাঁ) সেখানে উপস্থিত ছিলাম না।

## কুকান বেগ খানের পরিবার

কুকান বেগ খানের পরিবার বেশ বড় ছিলো- তার অনেকগুলী সন্তান ছিলো। এর মধ্যে আমরা শুধু তাঁর দুই সন্তানের নাম জানতে পারি- একজন হলো আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ, আর অপরজন হলো নসরুল্লাহ বেগ খাঁ। তারা দুই ভাই পিতার মতো সৈনিক পেশা অবলম্বন করেন। ছোট ছেলে নসরুল্লাহ বেগ খাঁ মারাঠা বাহিনীতে যোগ দেন এবং ধীরে ধীরে উন্নতি কারতে সমর্থ হন ও গোয়ালিয়রের মহারাজার বেতনভোগী এক ফরাসী জেনারেল পেরোর অধীনে আগ্রা কেল্লার রক্ষীর চাকুরী লাভ করেন। [১৯]

কুকান বেগের বড় ছেলে আব্দুল্লাহ খানের বিয়ে হয় অবসরপ্রাপ্ত মোগল সেনা নায়ক খাজা গোলাম হোসাইন খাঁ কমিদানের মেয়ের সঙ্গে। মির্যা আব্দুল্লাহ বেগ খান তাঁর শ্বশুরালয়ে বসবাস করতেন। তাঁর ছেলে সন্তানগণ নানা বাড়ীতেই বড় হতে থাকে। [২০]

কাকুন বেগ খানের সন্তান সম্পর্কে ভিন্ন মত পাওয়া যায়। মির্যা গালিবের একটি চিঠির মাধ্যমে সঠিক তথ্যটি পাওয়া যায়। গালিব মুন্সি নবী-বখশ হাকিমের কাছে একটি চিঠি পাঠান, তাতে গালিব তাঁর ফুফুর মৃত্যুর সংবাদ বর্ণনা করে লেখেন-

آپ کو معلوم رہے کہ پرسوں میرے گویا نو آدمی مرے ۔ تین پھپیاں، تین چچا اور ایک باپ اور ایک دادی اور ایک دادا یعنی اس مرحومہ کے ہونے سے میں جانتا تھا کہ یہ تو آدمی زندہ ہیں ۔ اور اس کے مرنے سے میں نے جانا کہ یہ تو آدمی آج ایک بار مر گئے۔[২১]

(আপনি অবগত আছেন, ইতোমধ্যে আমার নয়জন মৃত্যুবরণ করেছে। তিন জন ফুফু, তিনজন চাচা এবং এক পিতা, এক পিতামহ এবং এক দাদি অর্থাৎ ঐ মরহুমা হওয়াতে আমি জেনে ছিলাম যে, এই নয়জন বেঁচে আছেন্ এবং তাদের মৃত্যুতে আমি জানতে পারলাম এই নয় জন একবারেই মরে গেছে। )

অতএব উপরে উল্লেখিত আলোচনা ও চিঠির ভাষ্যানুযায়ী আমরা বুঝতে পারলাম কাকুন বেগ খানের সাতজন সন্তান ছিল। যার মধ্য হতে চারজন ছিল ছেলে সন্তান এবং তিনজন ছিলো মেয়ে সন্তান। তিনি (কাকুন বেগ খান) বাদশাহ শাহ আলমের সময় ভারতে আসেন। শাহ আলমের রাজত্ব ছিলো ১৭৫৭-১৮০৬ সাল। এবং সেখানকার শাসক নবাব মইনুল মুলকের অধীনে গালিবের পিতামহ চাকুরী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

## গালিবের জীবন ও কর্ম পরিধি

মির্যা গালিবের পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খানের ভাগ্য তেমন প্রসন্ন ছিল না। গালিবের পিতা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। তিনি প্রথমে লখনো যান। সে সময় লখনোর উজির ছিলেন নবাব আসাফুদ্দৌলা ( ১৭৭৫-১৭৯৭) সেখানে তিনি তেমন সুবিধা করতে না পেরে তিনি অযোধ্যায় গিয়ে অবস্থান করেন। আবার অযোধ্যা থেকে হায়দারাবাদ গমন করেন। হায়দারাবাদের নবাব নিযাম আলী খান বাহাদুরের অধীনে তিনি শত অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। সেখানে কয়েক বছর থাকার পর নিজামের রাজদরবারের রইসদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে তাঁর চাকুরী চলে যায়। তখন তিনি হায়দারাবাদ হতে নিজ গৃহে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আলোয়ারের রাজা ভখতজির সিংহের (১৭৯১-১৮০৩) অধীনে কাজ করতে থাকেন। তখন এক বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করার জন্য তাঁকে সেখানে পাঠানো হলে সেখানেই তিনি ১৮০২ প্রাণত্যাগ করেন। তখন মির্যা আসাদুল্লাহ বেগ খাঁ গালিবের বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর।[২২]

মির্যা গালিব তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খানের বেদনাদায়ক ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন এক চিঠির মাধ্যমে মুন্সি হাবিবুল্লাহ খাঁ জকা হায়দারাবাদীর কাছে র্বণনা করেন। তিনি যা লিখেছেন তা হলো-

باپ میر عبد اللہ بیگ خان لکھون جا کر نواب آصف الدولہ کا نوکر رہا۔ بعد چند حیدر آباد جا کر نواب نظام علی خان کا نوکر ہوا تین سو سوروں کی جمعیت سے ملازم تھا۔ کئی برس وہاں رہا۔ وہ نوکری ایک خانہ جنگی کے بکھیڑے میں جاتی رہی ۔ والد نے گھر آکر الور کا قصد کیا۔ رائور راجہ بختاور سنگھ کا نوکر ہوا۔ وہاں کسی لڑائی میں مارا گیا۔ [২৩]

(আমার পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ বাহাদুর লক্ষ্ণৌ গিয়ে নবাব আসাফুদ্দৌলার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরে এক চন্দ্র দিনে হায়দারাবাদ গিয়ে নবাব নিযাম আলী খানের অধীনে চাকুরী নেন। তাঁর উপর তিনশত ঘোর সওয়ারের দায়িত্ব ছিল। কয়েক বছর তিনি সেখানেই অতিবাহিত তরেন। সেখানে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের ফলে তার চাকুরী চলে যায়। পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ ঘরে ফিরে আসেন এবং পরে আলোয়ারে চলে যান। রাও রাজা বখতিয়ার সিংহ এর অধীনে তাঁর চাকুরী হয়, সেখানে কোন এক বিদ্রোহে তিনি মারা যান।)

আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ বিবাহের পর তার সংসারে তিনটি আদরের সন্তান জন্ম লাভ করে। তার মধ্য হতে দু'টি সন্তান হলো ছেলে আর একটি সন্তান মেয়ে। ভাইয়ের মধ্য হতে মহান কবি মির্যা গালিব হলো বড়। যার প্রকৃত নাম আসাদুল্লাহ বেগ খাঁ। গালিবের ছোট ভাইয়ের নাম ইউসুফ আলী বেগ খাঁ। ছোট ভাই ইউসুফ আলী বেগ খাঁ মির্যা আসাদুল্লাহ বেগ খাঁ গালিবের চেয়ে দুই বছরের ছোট ছিলো। গালিব অতি অল্প সময়েই তাঁর মায়ের দুগ্ধ পান করার সুযোগ পান। পাশাপাশি গালিব তার মামীর দুগ্ধও পান করেন। গালিবের

Dhaka University Institutional Repository

বোন ছিলো তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে বড়। বোনের নাম ছোটি খানম। বোনের বিবাহ দেওয়া হয় মির্যা জীবন বেগ বদখ্শির সাহেবযাদা আকবর বেগ এর সাথে।[২৪]

আব্দুল্লাহ বেগ খানের মৃত্যুর পূর্ব থেকেই পরিবারে সবাই আগ্রাতেই থাকতেন। কেননা আব্দুল্লাহ বেগ খানের চঞ্চল, অস্থীর এবং বল্গাহীন জীবনের কারণে পরিবারের লোকেরা তার সঙ্গে থাকতে পারতেন না। সম্ভবত গালিবের মাতা তার পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত অংশ লাভ করে এর তার পরিমান ছিল যথেষ্ট। সেজন্য যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন গালিবের অর্থের তেমন কোন সমস্যা হয়নি। গালিবের মাতৃকুলের কিছু আত্মীয়-স্বজন ছিল এবং তাদেও নিজস্ব কিছু জমি সম্পদও ছিল যার কিছু অংশ আজও রয়ে গেছে। [২৫]

"তাজকেরা মাজহারুল আজায়েব' গ্রন্থে গালিবের পিতা সম্পর্কে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে , তা হলো-

*باپ اسد اللہ خان مزکور کہ عبد اللہ بیگ خان دلی کی ریاست چھوڑ کر اکبر آباد میں جارہا اسد اللہ خان اکبر آباد میں پیدا ہوا۔ عبد اللہ بیگ خان الوار میں روٗراجا بختیار سنگھ کا نوکر ہوا۔ اور وہاں ایک لڑائی میں بری بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ جس حال میں کہ اسد اللہ خان مذکور پانچ چھ برس کا تھا۔*[২৬]

আসাদুল্লাহ খানের পিতা আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ দিল্লি ছেড়ে আগ্রায় চলে যান। আসাদুল্লাহ আকবরার কাছেই জন্মগহণ করেন। আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ আলোয়ারের রাও রাজা বখতিয়ার সিং এর অধীনে চাকুরী নেন। এবং সেখানে এক যুদ্ধে বড়ই বীরত্বের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এ অবস্থায় আসাদুল্লাহ খানের বয়স হয়েছিল মাত্র পাঁচ/ছয় বছর।"

পিতার মৃত্যুর পর গালিব প্রায় চার বছর খুবই দীনতার মধ্যে ভুগেছিলেন। আব্দুল্লাহ বেগ খাঁ মারা যান ১৮০২ সালে। সে সময় উত্তর ভারতে ইংরেজদের ব্যাপক আধিপত্য ছিল। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন চাচা নসরুল্লাহ বেগ খাঁ। নসরুল্লাহ আগ্রার সুবেদার ছিলেন। ১৮০৩ সালে লর্ডলেক আগ্রার উপর হামলা করে এবং নসরুল্লাহ বেগ খানের শহরটি তাদের হাতে তুলে দেন। লর্ডলেক তাকে চারশত (৪০০) অশ্বারোহীর উপর ব্রিগেডিয়ার নিযুক্ত করেন এবং একহাজার সাতশত রূপী বেতন নির্ধারন করেন। এরপর নসরুল্লাহ বেগ খাঁ সেল্কে এবং সুনসা নামক দুইটি অঞ্চল যা বর্তমানে মথুরার অন্তর্গত মারাঠাদের হাত হতে ছিনিয়ে নেন। এতে খুশি হয়ে লর্ডলেক সাহেব তাঁকে এ দুইটি অঞ্চলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দান করেন। এইভাবে ব্যক্তিগত বেতন ভাতা বাবদ প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকার মালিক হন। এর দশ মাস পর ১৮০৬ সালে কোন এক যুদ্ধে নসরুল্লাহবেগ খাঁ হঠাৎ করে হাতির পৃষ্ঠ হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন গালিবের বয়স ছিল নয় বছর।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর অকাল মৃত্যুতে গালিবের পরিবারে নেমে এলো দ্বিতীয় বিপর্যয়। এর ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়েন। এমবতাস্থায় গালিবের পরিবারকে দেখার মতো পিতৃকুলের অবশিষ্ট আর কেউ থাকলো না।

মির্যা গালিব একটি চিঠিতে চৌধুরী আবদুল গফুর খাঁ সাহেব সরর মারহারদির কাছে লিখেন-

میں پانچ برس کا تھا کہ باپ مرا۔ نو برس کا تھا کہ چچا مرا۔ اس کی جاگیر کے عوض میرے اور میرے شر کا حقیقی کے واسطے شامل جاگیر نواب احمد بخش خان مرحوم دس ہزار روپے سال مقرر ہوئے انہوں نے نہ دیئے مگر تین ہزار روپے سال۔ [২৭]

(আমার বয়স যখন পাঁচ বছর ছিল তখন আমার পিতা মরা যান। যখন আমর বয়স নয় বছর তখন চাচা মারা যান। চাচার জায়গীরদার হিসেবে আমাদের পরিবারের জন্য দশ হাজার রূপি ধার্য ছিল। কিন্তু আহমদ বখশ খাঁ মরহুম তিন হাজারের বেশী দিতেন না। কিন্তু তাও আবার বাৎসরিক তিন হাজার। )

এরপরে সরকারের পক্ষ হতে জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা হয়। এবং ব্রিগেড ভেঙ্গে দেয়া হয়। এই ব্রিগেড হতে ৫০ জন অশ্বারোহী একটি দল খাজা হাজির নেতৃত্বে ফিরোজপুরের শাসক নবাব আহমদ বখশ এর নিকট সোপর্দ করা হয়। উক্ত নওয়াব কোন কোন জায়গীরের খাজনা স্বরূপ বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা রাজকোষে জমা করে। ১৮০৬ সালে ৪ঠা মে লর্ডলেক একটি নির্দেশ জারী করেন যে, উক্ত অংশ হতে ১৫,০০০ টাকা পঞ্চাশজন অশ্বারোহী বিশিষ্ট একটি সৈন্যদলের দেখা শোনার জন্য ব্যয় করা হবে। বাদ বাকী দশ হাজার নসরুল্লাহ খানের উত্তরাধীকারীদের বৃত্তি দান করা হবে। নসরুল্লাহ খানের ওয়ারিশগণের মধ্যে তারঁ মাতা, তিন বোন এবং ভাতিজা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। নওয়াব ১৮০৬ সালের ৭ জুন লর্ডলেক হতে এই মর্মে একটি আদেশ নামা লাভ করেন যে, নসরুল্লাহ বেগ খানের উত্তরাধীকারীদের কে বার্ষিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। যাদের মধ্যে খাজাও অন্তর্ভূক্ত থাকবেন। তিনি দুই হাজার রূপী করে পাবেন। মাত্র এক মাসের মাথায় প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের বৃত্তি দশ হাজার হতে কমে তিন হাজারে এসে দাঁড়ায়। এর মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের অংশ ছিল- ১,৫০০, গালিব পেতেন ৭৫০ এবং তার ছোট ভাই পেতেন অনুরূপ অংশ। [২৮]

## গালিবের মাতার পরিচয়

মির্যা গালিরেব মাতার নাম ইজ্জাতুন্নেসা বেগম। তাঁর মাতা অনেক শিক্ষিত ও উচ্চবংশের কন্যা ছিলেন। তিনি এতোই শিক্ষিত ছিলেন যে, যাবতীয় দলিল দস্তাবেজ পড়তে পারতেন।

Dhaka University Institutional Repository

গালিব তাঁর মাতাকে সম্পর্কে বলেন যে, আমার মাতা লেখাপড়া জানা একজন সচেতন নারী ছিলেন। গালিবের পূর্বপুরুষগণ বদখসাতে বসবাস করতেন বলে ধারণা করা হয়।

এ থেকে বলা হয়ে থাকে যে, গালিবের বংশও আফগানি রক্তের সাথে মিশে আছে। মির্যা ফরহাতুল্লা বেগ এর বংশের ধারাবাহিক বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, গালিবের বংশে আফগানি রক্ত ছিল। তিনি তাঁর বর্ণনায় এটাও বলেন যে, গালিবের মাতা কাশ্মিরী বংশ উদ্ভুত ছিলেন। কাজী আব্দুল ওয়াদুদ সাহেবও গালিবের মাতাকে কাশ্মিরী বলে উল্লেখ করেছেন। [২৯]

## গালিবের নানার পরিচিতি

গালিবের নানার নাম ছিল খাজা গোলাম হোসাইন খাঁ কমিদান। খাজা আলতাফ হোসাইন হালি মরহুম এর বর্ণনা অনুসারে, মিরাঠ সরকারের সেনা অফিসার এবং আগ্রার সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন গালিবের নানাজি। গালিব মুন্সি শিবনারায়ন আরাম এর কাছে একটি পত্রে লিখেন,

تم کو ہمارے خاندان اور اپنے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم ہے! مجھ سے سنو۔ تمھاری دادا کے والد عبد نجف خان میں میرے نان صاحب خواجہ غلام حسین خان کے رفیق تھے۔ میرے نانا نے نوکری ترک کر اور گھر بیٹھے تو تمھارے پر دادا نے بھی کمر کھول دی اور پھر کہیں نوکری نہ کی۔ یہ باتیں میرے ہوش سے پہلے کی ہیں۔ [৩০]

(তুমি আমাদের পরিবার এবং আমাদের পরিবারে একত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে কি অনুধাবন করছ? আমার কাছে শুনো, তোমার দাদার পিতা আবদে নজফ আমার নানা খাজা গোলাম হোসাইন খাঁ এর বন্ধু ছিলেন। যখন আমার নানা চাকুরী ছেড়ে ঘরে বসেছিলেন, তখন তোমার পরদাদাও হাল ছেড়ে দেন। এবং পুনরায় চাকুরী না করার কথা বলে। এটা যখন আমার বুদ্ধি হয় সে সময়ের কথা। )

## পারিবারিক অবস্থা

মির্যা গালিবের পিতার মৃত্যুর পর গালিবের চাচা নসরুল্লাহ বেগ খাঁ শেষ পর্যন্ত গালিবের ভরন পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু চাচা নসরুল্লাহবেগ খাঁ ১৮০৬ সালে একটি যুদ্ধে উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় ফিরোজপুর ঝিরকা ও লোহারুর দুটি রিয়াসাতের শাসক ছিলেন নবম আহমদ বখশ খাঁ। নবাব মরহুম নসরুল্লাহ বেগের সাথে সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে তিনি এতিম শিশুদের দেখ ভালের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি লর্ড লেককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নসরুল্লাহবেগ খানের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য বার্ষিক ১০,০০০ টাকা পেনশনের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো অল্প কিছু দিন পরে কোন কারণ ছাড়াই নতুন আদেশ নামার ভিত্তিতে ১০,০০০

Dhaka University Institutional Repository

টাকার পরিবর্তে বার্ষিক পেনশনের পরিমান ৫০০০ টাকা করে দেয়া হয়। সেখান থেকে খাজা হাজীকে এই ৫,০০০ টাকার একটা বড় অংশ অর্থাৎ বার্ষিক ২০০০ টাকা দেয়ার হুকুম দেয়া হলো। আর বাকী ৩,০০০ টাকা বার্ষিক পেনশন বরাদ্দ থাকলো গালিবের পরিবারের ছয় সদস্যের জন্য। এখানে গালিবকে বছরে ৭৫০ টাকা দেওয়া হতো। এছাড়াও তার ভাই ইউসুফ খাঁকে ৭৫০ টাকা দেওয়া হতো। বাকী ১,৫০০ টাকা নসরুল্লাহ বেগ খানের মাতা অর্থাৎ মির্যা গালিবের দাদি এবং খানের তিন বোন অর্থাৎ গালিবের ফুপিরা অংশ পেত। এছাড়া আর অন্য কোন অংশীদার সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। [৩১]

## মির্যা গালিবের পেনশন মামলা

গালিব ও তাঁর পরিবারের পেনশন যখন ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছিল, এবং বাইরের এক ব্যক্তিকে যার সঙ্গে নসরুল্লাহ খানের পরিবারের কোন সম্পর্ক ছিল না। অথচ তাকে একটা বড় অংশিদার বানিয়ে দেওয়া হলো এ সকল অন্যায় আচরণের জন্য গালিব প্রথমে নবাব আহমদ বখশ খানের কাছে বিচার প্রার্থী হন। নবাব তাঁকে এই কথা বলে আস্বস্ত করেন যে, তাঁর প্রতি ন্যায্য বিচার করা হবে। কিন্তু নবাবের কথানুযায়ী কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ায় গালিব অধৈর্য হয়ে পড়েন। গালিব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মামলা দায়ের করেন।

মির্যা গালিব এ মামলা দায়ের করার জন্য ১৮২৮ সালে কলকাতা যান এবং এ বৎসরই এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিযোগ সম্বলিত আবেদন পেশ করেন। তাতে তিনি নিম্ন লিখিত দাবি সমূহ উপস্থাপন করেন-

১। লর্ডলেক ১৮০৬ সালের মে মাসে নসরুল্লাহবেগ খানের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তা কমিয়ে ৫,০০০ টাকা দেয়া হচ্ছে। ১০,০০০ টাকার মূল আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক।

২। এই পেনশন নসরুল্লাহবেগ খানের পরিবারের জন্যই বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এক বাইরের লোক (খাজা হাজী) যার সাথে নসরুল্লাহবেগ খাঁ ও তার পরিবারের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই, তাকে এই পেনশনের শরীক করা আর তাঁর মৃত্যুর পরের তাঁর সন্তানকে পিতার অংশ দিয়ে আসা হচ্ছে। তা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

৩। মঞ্জুরকৃত প্রকৃত অর্থের পরিমান ১০,০০০ টাকা, কিন্তু বাস্তবে প্রদান করা হয় ৫,০০০ টাকা। এর মধ্যে ৫,০০০ টাকার হিসাব হোক এবং তা বকেয়া অর্থ হিসেবে তাঁর পরিবারকে দিয়ে দেওয়া হোক। এছাড়াও বার্ষিক ২,০০০ টাকার সেই পরিমাণ অর্থও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যা অন্যায়ভাবে জনৈক খাজা হাজীকে দেওয়া হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪। এখন থেকে ভবিষ্যতে পেনশন ফিরোজপুর রাজ্য থেকে না দিয়ে ব্রিটিশ খাজাঞ্চি থেকে আদায় করা হোক।

৫। গালিবের এ মামলা ছিলো নবাবের জেষ্ঠ্য পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ খাঁর বিরুদ্ধে। [৩২]

যিনি তাঁর পিতার জীবিতকালেই ফিরোজপুর সিক্কার শাসক ছিলেন। শামসুদ্দীন খাঁ গালিবের মামলার জবাবে নিজের পক্ষ থেকে সেই নির্দেশনামা পেশ করলেন, যাতে ১০,০০০ টাকার মূল অর্থের পরিমাণ কমিয়ে ৫,০০০ টাকা করা হয়েছিল। মির্যা গালিবের ১০,০০০ টাকা বকেয়া আদায়ের দাবি ছিলো ন্যায়সম্মত। যুক্তিতর্ক, তত্ত্ব ও তথ্যসহকারে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, দ্বিতীয় হুকুমনামা জাল ছিলো। বিভিন্ন প্রমানাদি ও তথ্য থেকেও সে কথা জানা যায়। গালিবের যুক্তি ছিলো যে, দ্বিতীয় হুকুমনামার কোনো প্রতিলিপি দিল্লী ও কলকাতার কোনো সরকারী রেকর্ডেই নেই। অথচ সবাই জানেন যে, দস্তাবেজের প্রতিলিপি সরকারী রেকর্ডে অনিবার্যরূপে থাকার কথা। এবং তাতে লর্ডলেকের কোন স্বাক্ষরও ছিলো না। অতএব এটাই প্রমাণ হলো যে, শামসুদ্দীন খানের দস্থাবেজ সঠিক না। গালিবের এতো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার কারণে ভারত সরকারের মুখ্যসচিব জর্জ সুইস্টনর পুরো বিশ্বাস করলেন যে, নবাবের পেশকৃত দস্থাবেজ সঠিক নয়। সেজন্য গালিবের দাবি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু লর্ডলেকের সচিব ম্যালকম গালিবের অভিযোগ খারিজ করে দেন, এবং নবাবের দস্থাবেজ সঠিক বলে ঘোষণা দেন। এর পর গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল ঘোষণা দিলেন যে, সরকার বর্তমান অবস্থাতে কোনো রদবদল করতে প্রস্তুত নন। গালিব হতাশ হয়ে দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ১৮২৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে দিল্লী ফিরে আসেন।

## শিক্ষা জীবন

মির্যা গালিবের বাল্য শিক্ষা সম্পর্কে তেমন বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে গালিব যেরূপ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাতে তাঁর বাল্যকালের শিক্ষা যে উপেক্ষিত হয়নি তা অনুমান করা যায়। মাওলানা আলতাফ হোসাইন  হালী সহ অন্যান্য জীবনী চরিতকারদের সম্মিলিত অভিমত হলো, গালিবের বুদ্ধিমতী মাতা ইজ্জাতুন্নেসা বেগম পুত্রের বাল্য শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আরবি ও ফার্সী ভাষায় পন্ডিত আগ্রার প্রসিদ্ধ বিদ্বান ও সুযোগ্য আলেম মৌলভী মুহাম্মদ মুয়াজ্জমের হাতে। কারণ মৌলভী মুহাম্মদ মুয়াজ্জম সে সময় আগ্রায় এক মাদ্রাসা খুলেছিলেন, গালিব সেখানেই সর্বপ্রথম শিক্ষালাভ করেন। সে সময়ে ফারসি ছিলো সরকারী তথা চিঠিপত্র লেনদেন ও সাহিত্য বিষয়ের সাধারণ মাধ্যম। সেজন্য সমস্ত পাঠ্যবিষয়ের ভাষা ফার্সী হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। মির্যা গালিবও ছাত্রবস্থাতে কেবল ফার্সী পড়েছিলেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দির শুরু পর্যন্ত বহাল ছিলো। গালিব এই মাদ্রাসায় ফার্সীর কিছু প্রাচীন লেখকের গদ্য রচনা অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম শ্রেণিতে আরবীর কেবল প্রাথমিক শিক্ষাই দেয়া হতো। সেজন্য গালিব

Dhaka University Institutional Repository

কেবল আরবীর প্রাথমিক শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। এই মাদ্রাসায় মির্যা গালিব ১২ বছর বয়স পর্যন্ত পড়া লেখা করেন। [৩৩]

বাল্যকালে শিক্ষা গ্রহণের সময় গালিবের জীবনে একজন পারস্য পণ্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ হয়। যার আসল নাম হলো হারমজদ। তিনি এক পারসিক পরিবারে মানুষ হন। ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এবং মোল্লা আব্দুস সামাদ নাম গ্রহণ করেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি সর্বজনমান্য পণ্ডিত ছিলেন। স্বভাবতই পারসিক ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। তিনি ছিলেন ইরানের একজন অগ্নি উপাসক ও পরবর্তীতে নও মুসলিম। তিনি মূলত: ১৮১০ সালে ভারতের সম্রাট শাহজাহানের স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মৃতি বিজরীত তাজমহল দেখার জন্য আগ্রায় এসেছিলেন। যুবক কবি মির্যা গালিবের উপর এই নব-মুসলিম ইরানী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

গালিব এই পণ্ডিতকে তাঁর বাড়িতে মাত্র দু'বছর (১৮১০-১৮১২) থাকার জন্য রাজি করতে পেরেছিলেন। এরই মধ্যে গালিব সেই উস্তাদের নিকট এমন জ্ঞান হাসিল করতে সক্ষম হন যে, সারাজীবনের জন্য তা পর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছিলো। [৩৪]

মোল্লা আবদুস সামাদ ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক ফার্সী সাহিত্যের এক স্বনামধন্য পন্ডিত ছিলেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, যেহেতু তার মাতৃভাষা ছিল ফার্সী। তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন। কারণ আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য তিনি কিছুদিন বাগদাদে অবস্থান করেন। এ পণ্ডিতের নির্দেশে গালিব ফার্সী সাহিত্যের রত্ন ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরিনত বয়সে শিয়া মতবাদের প্রতি গালিবের যে পক্ষপাত দেখা যায়, সেটি ছিল মোল্লা আবুদস সামাদের সাহচর্যের পরিণতি। নচেৎ গালিবের পিতা-মাতা উভয় কুলই সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৩৫]

গালিব তাঁর বাল্য শিক্ষক এই হারম্জাদ সম্পর্কে লিখেন, প্রকৃতির তাগিদেই বাল্যকাল থেকেই আমি ফার্সী ভাষার প্রতি আগ্রহী ছিলাম। আশা করতাম যদি কখনো ঐশ্বর্যের সন্ধান পেতাম। এটাই আমার ইচ্ছা ছিল। পারস্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হারমজদ, যিনি হঠাৎ এখানে আগমন করেছিলেন। আমি তারই কাছে থেকে ফারসী ভাষার জ্ঞান ও তার সুক্ষ্ম বিষয় অবগত হয়েছিলাম। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালির মতে, হারমজদ ও গালিব তারা দু'জনে ১৮১২-১৩ সালে আগ্রা থেকে দিল্লী আসেন। গালিব সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন আর হারমজদ নও মুসলিম মোল্লা আবুদস সামাদ তাঁর শিষ্য ও বন্ধুকে ( গালিব) বিদায় জানাতে এই পর্যন্ত এসেছিলেন। গালিব এমন যোগ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিষ্য বলে প্রতিপন্ন হন যে, তাঁর গুরু ভারত ছেড়ে নিজ দেশে ফিরে গেলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনি সবসময় সম্পর্ক বজায় রাখেন। গালিব ফার্সী ভাষাতে পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন যে, তিনি নিজেই তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা একদিন পত্রে গর্ব করে বলতেন, আমি ফার্সীর পণ্ডিত, ফার্সীর মাণদন্ড আমারই হাতে হয়েছে। [৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

মোল্লা আবদুস সামাদ যে গালিবকে অশেষ স্নেহ করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এ সম্পর্কে মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী বলেন, নবাব মস্তফা খাঁ মরহুম বলেন যে, মোল্লা আবুদস সামাদ যখন ভিনদেশ হতে মির্যা সাহেবের কাছে চিঠি পাঠাতেন তখন এভাবে গর্ব করে লিখতেন যেমন-

"اے عزیز! باچہ کسی کہ بایں ہمہ آزادیہا گاہ گاہ بخاطری گذری" [৩৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, গালিব সাহেব তাঁর উস্তাদ মোল্লা আবদুস সামাদকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি এমন এক অনুগত শিষ্য যে, অতীতের কোন ছোট খাটো বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বিরত থাকেননি। গালিব নিজেই যখন কিতাবের কোথাও তাঁর উস্তাদের নাম স্মরণ করতেন তখন আদব ও মহব্বতের সাথে তাঁর শিক্ষা এবং শিষ্টাচারের প্রতি খেয়াল রাখতেন।

গালিব শুধু একনিষ্ঠ ফার্সী ভাষায় নয় বরং পারসিক ধর্মীয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন। আরবি ভাষা সম্পর্কে তিনি সাধারণ জ্ঞান রাখতেন। তিনি মক্তবে পড়ালেখা করার সময় সেখানে শরহে মিয়াতে আমেল. এলমে ছরফ, ইলমে নাহু সম্পর্কে পড়া লেখা করেছেন। [৩৮]

কোন কোন লেখকের মতে মির্যা গালিব নজির আকবর আবাদীর ছাত্র ছিলেন। মির্যা গালিবের যখন বাল্যকাল অতিবাহিত হয় তখন ঐ সময়ে আগ্রাতে নজীর আকবর আবাদীর একটি মক্তব ছিল। গালিব সেখানেও বেশ কিছুদিন পড়া লেখা করেন। ১৮৩৫ গালে নবাব মস্তফা খাঁ শিফতার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গুলশানে বেখার' প্রকাশিত হয়। যাতে মোমেন, আরজু, গালিব এবং অন্যান্য সমসাময়িক অনেক কবি সাহিত্যিকের প্রশংসা করা হয়েছে। এবং সেখানে মির্যা গালিবকে নজির এর ছাত্র হিসাবে বর্ণগা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় গালিব নিজে এবং তাঁর পারিপার্শিক জগতই ছিল তাঁর আসল শিক্ষা দাতা। তাঁর শৈশব কাটে আগ্রার গুলাবখানা গামে পরিচিত একটি মহল্লায়। বলতে গেলে এটি ছিল ফার্সী চর্চার কেন্দ্র। এই অনুকূল পরিবেশ থেকে তিনি ফার্সী ভাষায় পারদর্শী হযে ওঠেন। এরপর তিনি দিল্লী চলে আসেন। সেখানেও পড়াশুগার ভাল পরিবেশ পান। যওক, মুমিন-এর মত কবি এবং মাওলাগা ফজলে হক্ক খায়রাবাদী, শাহ ইসমাইল, শাহ আব্দুল আজিজ, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী এর মতো বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন ঐ এলাকার বাসিন্দা। তাই তিনি এসকল পণ্ডিতদের সংস্পর্শে থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। [৩৯]

## নানাবিধ জ্ঞানের অধিকারী

গালিব নানাবিধ জ্ঞান আহরণ করেছেলেন। তিনি ফার্সী ভাষার জ্ঞান, ব্যাকরণ, ও ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। শিক্ষকগণের আশির্বাদে তিনি পদ্য ও গদ্য রচনায় সক্ষম হন। তিনি অসাধারণ মুখস্ত বিদ্যা ও তিক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। যে কিতাব তিনি একবার দেখে নিতেন ঐ কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্মরণ হয়ে যেত। তিনি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। [৪০]

গালিব তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষী বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আরবি ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু আরবীয় পণ্ডিত বলে নিজেকে কখনও দাবি করেননি। গালিব লিখেন আমি আরবীর পণ্ডিত নই, কিন্তু তাই বলে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নই। তাঁর অর্থ এই যে, এই ভাষার অভিধান সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞের দাবি করতে পারি না। তবে ফার্সী ভাষার ব্যকরণ ও রীতিনীতি সম্পর্কে আমি এতখানি অবগত যে, উদাহরণটা এই রূপ যেমন-ইস্পাতের সঙ্গে তার কঠিনত্বের অনুরূপ। এই ব্যাপারেও পারস্যবাসীদের সাথে এবং আমার সাথে পার্থক্য এটাই যে, তারা জন্ম সূত্রে ইরানী এবং আমি জন্মসুত্রে হিন্দুস্থানী এবং তারা আমার পূর্ববর্তী। [৪১]

গালিব তাঁর লিখনিতে ক্ল্যাসিকাল যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবিদের সঙ্গে নিজের নাম একাত্বতার কথা ঘোষণা করেছেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে গালিবের দক্ষতা উল্লেখ করার মত। তিনি মূলত: চিকিৎসক না হলেও এ বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তার প্রমাণ এই যে, একদা তিনি নবাব কল্‌ব আলীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং দুষপ্রাপ্য রাসায়নিক বস্তু সমূহের সহযোগে তাকে ঔষধ তৈরী করে দিয়েছিলে। গালিব নবাবকে বলেছিলেন, " আমি চিকিৎসক নই, কিন্তু এ বিষয়ে আমি অভিজ্ঞ বটে।" জ্যোতিষী বিদ্যাও গালিবের চিত্তবিনিদনের এক বিশেষ সামগ্রী ছিল। সে বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত মতামতও শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হতো। ১৮৫৮ সালে এক ধুমকেতু আবির্ভাবে গালিব মন্তব্য করেছিলেন যে, এ সকল বিষয়ে কারণ অনুসন্ধানের ব্যাপারে জ্যোতির্বিদ্যার সাথে আধ্যাত্মিকতার যোগাযোগ যথেষ্ট লক্ষ্য করার মত। ধূমকেতুর আবির্ভাব দেশের ধ্বংস ও বিরল হওয়াই সূচনা করেছে। গালিবের মানুষিকতার এই বহুমুখী প্রবণতা একথাই প্রমাণ করে যে, বাল্যকালে এবং কৈশোরে তিনি যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা কোনক্রমেই তৎকালীন মান অনুযায়ী একেবারেই কম ছিল না। [৪২]

## গালিবের সাহিত্য জীবন

মির্যা গালিব আগ্রায় অবস্থান কালে খুব অল্প বয়সেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তিনি উর্দু কবিতাকে তাঁর অবসর-বিগোদনের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। শুরুতে তিনি ফার্সীতেই কবিতা লিখতেন এবং তিনি নিজে তাঁর ফার্সী কবিতাতেই তাঁর কবিত্বের প্রতীকরূপে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রকাশের মাধ্যম 'মাতৃভাষা' হওয়া উচিত। তখন থেকে তিনি কেবল উর্দুতেই কবিতা লিখতে থাকেন। এবং ইতিহাস এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, গালিব উর্দু কাব্য লিখেই বিশ্ব বরেণ্য হয়েছেন। [৪৩]

মির্যা গালিব মোল্লা আবদুস সামাদ সাহেবের সহায়তার কারণে বাল্যকাল থেকেই তিনি ফারসীর শওকত বুখারী, আমির ও বেদিলের মতো কবিদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গালিব উর্দুতে তাঁদের অনুসরণ করতে শুরু করেন। কিন্তু উর্দু তখন শুধুমাত্র একটি নতুন ভাষা ছিলো গা, বরং তাতে এমন শব্দ ভান্ডার ও পদবিন্যাসেরও অভাব ছিলো ,যা ছিলো তাঁর আত্মপ্রকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিস্থিতি যখন তাকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছিলো তখন তিনি ফার্সী কবিদের কবিতা থেকে বিশেষত: বেদিলের কবিতা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন।

কবি বেদিল বিষয় ও শৈলী, উভয় দৃষ্টিতেই ফার্সীর সবচাইতে দুরুহতম কবি ছিলেন। গলিবের প্রাথমিক স্তরের কবিতাগুলো এই ভাবধারাতেই লেখা হয়েছিলো, যার দু'একটা শব্দ ছাড়া পুরোটাই ছিল ফার্সী। কোগো কোগো জায়গায় তো এমন হয়েছে যে, কোগো সামান্য বিষয় এমনভাবে অব্যক্ত হয়েছে যে তা থেকে কোগো অর্থই পাওয়া যায় গা। স্বাভাবিকভাবেই সমকালিন সমালোচকেরা তাঁর কঠোর সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, এসব রচনা অর্থহীন।

তবে গালিবের প্রথম স্তরের কবিতার শুধু সমালোচনাকারীই ছিলনা, কিছু প্রশংসাকারীও ছিলো। তাঁর এমন কাব্যধারার একজন বড় প্রশংসাকরী ছিলেন নবাব হুসামুদ্দীন। তিনি নিজেও একজন বড় মাপের কবি ছিলেন। একবার তিনি যখন লাখনো যান তখন গালিবের লেখা কিছু উর্দু গজল মহাকবি মীরকে দেখানোর জন্য সাথে করে নিয়ে যান। মহাকবি মীর গালিবের গজল দেখে হেঁসে বলেছিলেন- "যদি এই ছেলেকে পথ বাৎলানোর মতো উস্তাদ পাওয়া যায়, তাহলে সে কালে একজন বড় মাপের কবি হবে।" [৪৪]

গালিবের কোন উস্তাদ ছিল না, কিন্তু যখনই তিনি ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন তখনই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা সেই পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি প্রচুর লিখতেন, মীর নাহেবের কথা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সঠিক পথের সন্ধান পেলে অল্প বয়সেই তিনি সফল হতে পারতেন। গালিব ১০-১১ বছর বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। আর মীর সাহেব গালিব সম্পর্কে যখন মন্তব্য করেন তখন গালিবের বয়স মাত্র ১৩ বছর।

গালিবের উর্দু কাব্যকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে কবি জীবনের সূচনা হতে তাঁর ২৫ বছর বয়সকাল পর্যন্ত সময়কে গ্রহণ করা হয়। এই পর্যায়ে কবিতাসমূহ ফারসী-শব্দ ও বাগধারার ব্যবহার প্রবলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি এ সময়ে গালিব মির্যা আব্দুল কাদির বেদিলকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করেছেন। মহান কবি গালিব নিজেই বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

مجھے راہ سخن میں کوئی گمراہی نہیں غالب

عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بیدل کا۔[৪৫]

হে গালিব, কাব্য-পথে আমার পথভূলের কোন ভয় পাই

বেদিলের লেখনীই আমার কাব্য প্রান্তরের খিজিরের যষ্টি স্বরূপ

বেদিলের কাব্যধারার ন্যায় গালিবের এই সময়কার কাব্য সমূহে দেখা যায় যে, সহজ কথা ফারসী অলঙ্কারপূর্ণ আড়ম্বরযুক্ত শব্দার্থময় বাক্যে ভরপুর। সময় সময় গভীর চিন্তাধারার উল্লেখ থাকলেও, এই সকল প্রয়োগ আড়ম্বর দোষে দুষ্ট হয়ে এই সময়কার কাব্য সহজ ও স্বচ্ছল কাব্যরূপ গ্রহণ করতে পারে নাই। সংক্ষেপে এই যুগও তাঁর কবিত্ব হতে পাণ্ডিত্যই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

গালিবের দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্যসমূহ আহরণ সহজ ও স্বচ্ছল গতিবেগ লাভ করে কতকটা কাব্য আশ্রিত হযেছে। পাণ্ডিত্যের আমেজ তখনও তিনি ছাড়তে পারেন নাই, তার পরেও তাঁর এই পাণ্ডিত্যের মধ্যেও রসসিক্ত অনুভূতিসমূহ যখন প্রকাশিত হয়েছে তা সহজেই যেন কাব্য-রসিককে অভিভূত করেছে।

তৃতীয় পর্যায়েই গভীর অনুভূতিপূর্ণ ও রসমণ্ডিত গালিবের কাব্যসমূহ সহজ, সরল ও স্বচ্ছ গতিবেগ ধারণ করে পূর্ণমাত্রায় সফলতা লাভ করেছিল। এই সময়ের কাব্যকে লক্ষ্য করেই বলা যেতে পারে যে, গালিব কেবল উর্দু সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ কবি নহেন বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন স্বনামধন্য কবি বলে সর্বজনস্বীকৃত।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগাঁথার ন্যায় গালিব কাব্যের প্রধান ও প্রথম গুণ কবির নিজস্ব কবিমানস ও আপসহীন ব্যক্তিত্ব। এই নিজস্ব কবি মানস ও আপন ব্যক্তিত্বই তাঁর চিন্তাধারার প্রকাশভঙ্গি এবং শব্দ ও অলঙ্কারের প্রয়োগে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। শ্রেষ্ঠ কবিদের একটা প্রধান গুণ যে, তাঁরা তাঁদের নিজস্ব অনুভূতি সমূহ এরূপ সহজ, সরলভাবে অভিব্যক্ত করেন যে, তাদের নিকট হতে যা শোনা যায়-কি শব্দ, কি অর্থ- তাহাই নুতনতর ও রসসিক্ত বলে মনে হয়। গালিবের জন্য কেবল ছন্দের কারসাজী নয়, বরং তা ভাবের নাজে ছন্দের সমন্বয়ে রসঘন হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিগণিত হয়েছে।[৪৬]

গালিবের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- বাক্য শৈলী। এটি গালিবের চিন্তাধারা ও মনের আবেগকে শব্দ ও অলংকারের প্রয়োগে একটা বিশিষ্টতা দান করেছে। গালিবের অপূর্ব বর্ণনা শৈলীর মাধ্যমের নিজস্ব অনুভুতিগুলো সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। গালিবের কাব্য-খ্যাতির পেছনে তাঁর অভিনব বাক্যশৈলী মূল ভূমিকা পালন করেছে। গালিবের নিজ কবিতায় এর প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ [৪৭]

পৃথিবীতে খুব ভালো কবি আছেন আরো অনেক

(তবুও) মানুষ বলে গালিবের বলার ভঙ্গিই আলাদা

গালিবের কাব্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অসাধারণত্ব। এই অসাধারণত্ব তাঁর চালচলন, স্বভাব-প্রকৃতি, চিন্তাধারা ও প্রেমাকর্ষণ প্রভৃতি সবকিছুতেই পরিলক্ষিত হয়। সর্ব বিষয়েই একটা নতুনত্ব ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করাই যেন তাঁর একটি বিশেষ প্রকৃতি।

অনুভূতির সহজ ও স্বচ্ছ অভিব্যক্তি গালিব কাব্যের বিশেষ অরেকটি গুণ। মানব জীবনের সুখ-দু:খ, আশা-নিরাশা এবং সাফল্য-হতাশার মধ্যে দিয়ে যে সকল অনুভূতি তিনি লাভ করেছেন, তারই প্রকৃষ্ট রূপ তিনি অনুভূতিপূর্ণ, রসিক পাঠকদের নিকট প্রকাশ করেছেন। পাঠকগণ নিজেদের জীবন কাহিনীর একটি কাব্যিকরূপ গালিব কাব্যে দেখতে পেয়ে তাকে তাদের অন্তরের কবি বলে গণ্য ও গ্রহণ করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্বের বরমাল্য তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। [৪৮]

গালিব ছিলন প্রেমের কবি, ভালোবাসার কবি, তাই তাঁর কবিতায় প্রেম প্রধান বিষয় হয়ে ধরা দিয়েছে। নারীপ্রেম, সেই সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেম। তাই তো কবি বলেন-

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا

درد کے دوا پائی، درد بے دوا پایا[৪৯]

প্রেমেই জীবনের স্বাদ পেল আমার মন

ব্যাথার ঔষধ পেল, এমন ব্যাথা পেল যার ঔষধ নেই।

গালিব ছিলেন কর্মে বিশ্বাসী। তাঁর মতে পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য সম্পদরাজি। কিন্তু সেগুলো লুকায়িত অবস্থায় রয়েছে। মানুষকে পরিশ্রমের মাধ্যমে সেই গুপ্ত সম্পদকে আহরণ করতে হবে। সেদিকে আহবান জানিয়ে কবি বলেছেন-

آرائش محفل سے فارغ نہیں ہنوز

پیش نظر ہے آیند دائم نقاب۔[৫০]

সুন্দরের পরিচর্যা থেকে নেয়নি এখোনো অবসর

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে রয়েছে অন্তরালে চিরস্থায়ী দর্পণ

প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মীরের ন্যায় গালিবও দু:খ ও কষ্টের মধ্যেই দিন নিপাত করেছিলেন। সেজন্যই উভয়ের কাব্যই দু:খ ও ব্যথাপূর্ণ। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মীরের কাব্য যেমন হৃদয়কে মুহ্যমান ও হতাশ করে দেয়, গালিবের কাব্য সেইরূপ কেবল কান্নার স্বরূপ নয়। এটি রহস্যমাধূর্যে পূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে প্রকাশ লাভ করেছে। বস্তুত গালিবের চরিত্রের প্রধান মাধূর্য এটা ছিল যে হাজারো দু:খ-কষ্টের মধ্যেও তিনি কখহৌ বিচলিত হয়ে পড়তেন না। সকল অবস্থাকেই তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ও লীলাচ্ছলে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন।[৫১]

এ বিষয়টি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের ন্যায় এইভাবে বর্ণনা করেছেন-

رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

مشکل اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گیا۔ [৫২]

দু:খ জর্জরিত মানুষের থাকেনা কোন দু:খ

দু:খ-কষ্টে আমি এতটাই নিমজ্জিত

ছিলাম যে, তা এখন সয়ে গেছে।

গালিব ছিলেন একজন খাঁটি দার্শনিক কবি এবং তাঁর মধ্যে ধর্মের গোড়ামির লেশমাত্রও ছিলো না। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি একজন একেশ্বরবাদী, ধর্মের গোড়ামি বর্জনই আমার ধর্ম। যখন বিভিন্ন ধর্মের বালাই মিটিয়া যায়, তখনই খাঁটি ধর্ম, বিশ্বাস বা ভক্তির ঠিকানা হয়। এ ব্যাপারে গালিব নিজেই গেয়েছেন-

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ [৫৩]

আমি একেশ্বরবাদী, নাস্প্রদায়িক রীতি বর্জনই আমার ধর্ম,

একটি একটি করে সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটবে

ও জ্বলে ওঠবে একটি বিশ্বাস প্রদীপ।

মির্যা গালিব ছিলেন হাস্যরসিক কবি। তাঁর কবিতার বিশাল জায়গা জুড়ে আছে হাস্যরস বা কৌতুক। গভীর বেদনার মধ্যেও সহানুভূতির নাথে গ্রহণ করে হাস্যরসের মাধ্যমে সেই ব্যাথাকে লাঘব করতে চেষ্টা করেছেন। সকল অবস্থায় বিপর্যয়ের মধ্যেও কৌতুক আবিস্কারের এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই জন্যই মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী গালিবকে 'হাওয়ানে জারিফ' (রসিক প্রাণী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কৌতুক হাস্যরস গালিবের কাব্যকে বৈচিত্র্যময় করেছে। তিনি অন্যকে নিয়ে যেমন ব্যঙ্গ -বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি নিজেকে নিয়েও মৃদু ঠাট্টা করেছেন। এক কবিতায় তিনি নিজেকে পরিহাস করে বলেন-

یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں، جو نہ بادہ خوار ہوتا۔[৫৪]

এটি সুফী সংক্রান্ত ব্যাপার, এ ক্ষেত্রে তোমার কথা হলো এই

তোমায় আমরা ওলী ভাবতাম যদি তুমি মদ না পান করতে।

গালিব তাঁর কবিতায় ফার্সী শব্দবন্ধ, বাকরীতি, অব্যয়াদি অবলিলাক্রমে টেনে এনেছেন। ফলে তাঁর রচইা প্রায়শই ভিনদেশীয় সুঘ্রাণে মৃদু সুরভিত। উর্দুর সঙ্গে ফারসির প্রাণের মিল অনেক বেশি। তাই স্বীকার করতে দোষ নেই যে, উর্দুর নাথে ফারসির মিশ্রিত হয়ে গালিবের কবিতা এমন এক শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছে যা তাঁরই সৃষ্টি এবং তারই একক বৈশিষ্ট্য।[৫৫]

## গালিবের আকিদা ও মাজহাব

মির্যা গালিবের মাজহাব কী ছিলো সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গালিবের বংশধর ও পিতা-মাতা উভয়কুলই সুন্নী বা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুনারী ছিলেন। কিন্তু মির্যা গালিব তার বাল্য শিক্ষা ইরানের পারসিক পণ্ডিত ও কবি নও-মুসলিম মোল্লা আবদুস সামাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কারণে তিনি শিয়া মতবাদের অনুসারী হয়ে যান। কারণ গালিব মোল্লা আবদুস সামাদের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন।

এ ব্যাপারে শায়খ মো: একরাম বলেন, " আকিদার দিক থেকে মির্যা গালিব সাহেব শিয়া মাজহাবের লোক ছিলেন।" তাঁর সাহিত্যকর্মে হয়রত আলী (রা.) এর প্রশংসা জ্ঞাপন করে নিজেকে শিয়া মতানুনারী হিসেবে প্রশংসা করেছেন।[৫৬]

ড. মালিক রাম সাহেব বলেন, "যখনই মৌখিক স্বীকার উক্তির নাথে সম্পর্কিত করা হবে, তখনি অবগত হওয়া যাবে যে, মির্যা নাহেব তাঁর সমস্ত জীবনে নিজেকে শিয়া মাজহাবের

Dhaka University Institutional Repository

অনুনারী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন: গোলাম হোসাইন কাদের বেলগেরামীর কাছে পাঠানো চিঠিতে বলেন, "গালিব আলী রা. এর গোত্রের অনুসারী।[৫৭]

ইউসুফ মির্যার কাছে পাঠানো চিঠিতে গালিব বলেন, " জানো, আমি আলীর বন্দা, তার কছম আমি কখনোই মিথ্যা বলিনি।" [৫৮]

মোহাম্মদ হোসাইন আযাদ বলেন, " মির্যা সাহেবের সমস্ত পরিবার বর্গের সদস্যগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তিনি শিয়া ছিলেন।" [৫৯]

এতএব বুঝা গেল মির্যা গালিব তাঁর সাহিত্যকর্ম, ধ্যান-খেয়াল ও ব্যবহার সর্ব দিক থেকে শিয়া মাজহাবের অনুসারী ছিলেন।

## গালিবের চারিত্রিক গুণাবলী

মির্যা গালিব ছিলেন উচ্চ মর্যাদা উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি হলেন কালজয়ী মহান দার্শনিক যুগের এক উন্নত শির। কোন প্রকার সংকির্ণতা ও কৃপণতা গালিবের চরিত্রে কখনো দেয়া যায় নি। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। সর্ব প্রকার প্রতারণা, মিথ্যাচার, শঠতা, ঠকবাজি থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখতেন।

তিনি ছিলেন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত এবং আস্থাভাজন বন্ধু। তার বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ ও অমায়িক ব্যবহারের কারণে তাঁর ভাগ্যে অসংখ্য গুণ গ্রাহী বন্ধু জুটেছিল। অভিজাত তুর্কী জাতির রক্ত তাঁর ধমনিতে প্রবাহিত ছিল। অভিজাত্যের কারণে তিনি মানুষত্ববোধ, মহত্ত্ব, আত্ম-সম্মান বোধ ও ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। মুক্ত বুদ্ধির চর্চা উন্মুক্ত জ্ঞান নাধহী ছিল তাঁর অন্তরাত্মার বড় পরিচয়। [৬০]

মির্যা গালিব যে উচ্চ ও আত্মমর্যাদার অধিকারী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়, দিল্লী কলেজে ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগের সময়। ১৮৪০ নালে সরকারের উচ্চপদস্ত কর্মকর্তা জেমস থমসন নাহেব দিল্লী কলেজে ফার্সী বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগদানের জন্য মির্যা গালিবকে আহ্বান জাইালেন। এটি গালিবের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হলো।

গালিব জেমস থমসনের অনুরোধক্রমে তার বাঙলোতে দেখা করতে গেলেন। গালিব পালকি চড়ে গিয়েছিলেন। গালিব পালকি থেকে নেমে অপেক্ষা করতে থাকেন, কেননা সে সময়ের রীতি ছিলো যে, কোন বাহিরের মেহমান আসলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হত। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ গালিবকে অভ্যর্থনা জানাতে এলোনা। থমসন সাহেব একটু পরে এসে বললেন আপনি পালকি থেকে নেমে ভিতরে আসলেন না কেন? গালিব বললেন, আমাকে তো কেউ অভ্যর্থনা জানাতে আসেনি। গালিবের কথার উত্তরে থমসন সাহেব

বললেন, যখন আপনি অতিথি হিসেবে আসবেন তখন আপনাকে অভ্যর্থনা জানানো যেতে পারে, কিন্তু এখন তো আপনি সরকারী চাকুরীর জন্য এসেছেন। সেজন্য এ ক্ষেত্রে আপনি অভ্যর্থনা পাওয়ার অধিকার রাখেন না। একথা শুনার পর গালিব বললেন, আমি দিল্লি কলেজে চাকুরী করতে এসেছি সম্মান বৃদ্ধি করার জন্য কমাবার জন্য নয়। একথা বলে গালিব পালকি চড়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। এ যুগান্তরকারী ঘটনাই প্রমাণ করে গালিব কত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। [৬১]

গালিব সর্বদা সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতেন, এটি ছিল তার চরিত্রের এক মহৎ গুণ। তিনি বন্ধু এমনকি তাঁর শত্রুর সাথেও ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি ছিলেন উদার মনের মানুষ। মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, অগ্নিপূজক ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথেই তিনি উত্তম ব্যবহার করতেন।

তিনি খুব উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যদি কোন মানুষ একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর সাথে সাক্ষাত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। কারণ তিনি সাক্ষাৎকারীর কথা মন দিয়ে শুনতেন ও খোলা মনে কথা বলতেন। তিনি বন্ধুর সুখে সুখী হতেন এবং বন্ধুর ব্যাথায় ব্যাথিত হতেন। তাঁর বন্ধুত্ব শুধু নিজ সম্প্রদায় ধর্ম এবং প্রিয় দিল্লি বাসীর মধেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমগ্র ভারতবর্ষের মাঝে ছড়িয়ে ছিল। গালিবের চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি উচ্চ মনের মানুষ ছিলেন। [৬২]

## মির্যা গালিবের সাহিত্যকর্ম

সিপাহী বিদ্রোহের সময় গালিবের অনেক লেখা নষ্ট হয়ে যায়। কালের ধ্বংস এড়িয়ে এখন পর্যন্ত যে সব গ্রন্থ অক্ষতভাবে আছে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

**কবিতাসমগ্রঃ-**

১। দীওয়ানে গালিব (উর্দু)

২। কুল্লিয়াতে নাজমে ফার্সী

৩। গুলে রানা (ফার্সী)

৪। ইনতেখাবে দীওয়ানে ফারসী

**গদ্যসমগ্রঃ-**

১। কুল্লিয়াতে নসরে ফার্সী

২। উর্দুয়ে মুয়াল্লা (উর্দু পত্রাবলী)

Dhaka University Institutional Repository

৩। রুকআতে গালিব (ফার্সী পত্রাবলী)

৪। উদে হিন্দি (পত্রসংকলন)

৫। মেহরে নিমরোজ (ফারসী ইতিহাস)

৬। ক্বাতেয়ে বুরহান (ফারসী, ভাষাতত্ত্ব ও সমালোচহা)

৭। নামায়ে গালিব

৮। পাঞ্জ-এ আহাঙ্গ

৯। লাতাফায়ে তাওয়ারিখি

১০। তেঘে -তেজ

১১। দাস্তাম্বু [৬৩]

দীওয়ানে গালিব (উর্দু): এ গ্রন্থে শুধু গালিবের উর্দু কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে।

গুলে রানা (ফার্সী): এটি ফার্সী কাহিনী নিয়ে রচিত।

ইনতেখাবে দীওয়ানে ফারসী: এ গ্রন্থে বাছাইকৃত ফার্সী কাব্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

কুল্লিয়াতে নসরে ফার্সী: এ গ্রন্থে ফার্সীর গদ্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রুকআতে গালিব (ফার্সী পত্রাবলী): এ গ্রন্থে গালিবের বন্ধুদের নিকট পাঠানো ফার্সী চিঠি-পত্রের বর্ণনা রয়েছে।

উদে হিন্দী ও উর্দুয়ে মুয়াল্লা তাঁর বন্ধু বান্ধবদের নিকট লিখিত পত্রাদীর সংকলন। এই দুইটি গ্রন্থ **১৮৬৯** নালে সর্বপ্রথম পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়।

লতাফিয়ে গায়েবী:- গালিবের নানা বিষযের সমালোচনা বা মুবাহিসা গ্রন্থ। তিনি এই সময় সকল রসপূর্ণ সমালোচনামূলক রচনা তাঁর সাইফুল হক ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে।

তেঘে-তেজ ও নামায়ে গালিব এ দুটি গ্রন্থও রসপূর্ণ রচনা। গালিব এই দুইটি সমালোাচনা গ্রন্থে তাঁর লিখিত ক্বাতি-বুরহানের সমর্থনে লিখেছেন।

পঞ্জ -এ আহাঙ্গ:- এ গ্রন্থটি তাঁর ফার্সী রসপূর্ণ রচনার একটি বড় নিদর্শন।

কুল্লিয়াতে নজমে ফারসী:- তাঁর বিভিন্ন ফার্সী কবিতা যথা:- কাসীদা, গজল, কিত্বা, মসনবী, রুবায়ী প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয়েছে।

মিহরে নিমরোজ:- এটি একটি ইতিহাস গ্রন্থ। যা ফার্সী ভাষায় রচিত হযেছে। ইহাতে গালিব তৈমুর সম্রাটদের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাত্বী বুরহান:-এটি প্রসিদ্ধ ফার্সী অভিধান, বুরহান কাত্বি-ও একটি রসপূর্ণ সমালোচনা সাহিত্য। এতে আরো রসঘন করে পরবতী বৎসর দর্‌ফ সে শেকারিয়ানা নামক আরও একটি রস সাহিত্য রচনা করেন। এটিকে বিদ্রূপ করে কলকাতা হতে মির্যা আহমদ বেগ 'মু'আয়িদ-আল- বুরহান' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর প্রত্যুত্তরে 'তেঘে-তেজ' রচিত হয়। আর সেই রূপ কাত্বি বুরহানের প্রত্যুত্তরে 'নামায়ে গালিব' রচিত হয়েছিলো। [৬৪]

গালিব প্রচুর পড়াশুনা করতেন। তাঁর অধ্যয়নের মধ্যে কাত্বি-বুরহানও ছিল। এটি ফার্সি ভাষার প্রসিদ্ধ শব্দকোষ 'বুরহানে কাত্বি' যা সংকলন করেন মুহাম্মদ হোসাইন তিবরিজী। গালিব বইটি অবসর সময়ে পড়তেন। এতে অনেক ভুল ছিল। তিনি বইটির প্রত্যেক পাতার পাশে পাশে তার সমীক্ষনাত্মক টিপ্পনীগুলোকে নোট করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে এই অর্থ টিপ্পনীগুলো এতটাই বড় হলো যে, তা বই আকারে প্রকাশ করার মতো হলো। তাঁর কিছু বন্ধু বান্ধব পরামর্শ দিলেন যে, এটি প্রকাশিত হলে স্বল্প শিক্ষিত পাঠকরা তার দ্বারা উপকৃত হবে। আর ফার্সী ভাষার পণ্ডিতরূপে তাঁর প্রসিদ্ধি বাড়বে। অবশেষে ১৮৬২ নালে এই বই 'কাত্বি-এ বুরহান' নামে প্রকাশিত হয়। [৬৫]

দাস্তাম্বু: এটি একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। যাতে মির্যা গালিবের সারা জীবনের সংগঠিত কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।

## ইন্তেকাল

মির্যা গালিব উর্দু কাব্যে দীর্ঘ সাধনার পর ১৮৬৯ নালে ১৫ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। মির্যা গালিব শুধু একজন কবি নন, বরং একটি যুগ এবং একটি নতুন সভ্যতার প্রতীক ছিলেন। তার কবিতায় যেমনি আছে আল্লাহ প্রেমের আসক্তি তেমনি আছে অধ্যাত্ম চেতনার বিষয়, পার্থিব দুনিয়ার মানুষের প্রতি প্রেম ভালোবাসা ও কামনা-বাসনার কথা আছে সুরার কথা, আছে জীবন-মৃত্যু নিয়ে দার্শনিক কথাবার্তা। তবে সবমিলে তিনি বিশ্বব্যাপী গজলের কবি । বিশেষ করে প্রেমের গজলের কবি হিসেবে পাঠক মনে স্থায়ী আসন বিন্যাস্ত করে আছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

**তথ্যসূত্র**

১। মুহাম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস অনূদিত, *মির্জা গালিব*, কিশোর মেলা প্রকাশনী, ঢাকা-২০১১, পৃ. ৪৪

২। *ইসলামী বিশ্ব কোষ*, ১০ম খণ্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৪০১

৩। গোলাম রসূল মেহের, *গালিব*, ইলেকট্রিক প্রেস, লাহোর, ১৯৪৬, পৃ. ১

৪। মির্যা গালিব, *উর্দুয়ে মুয়াল্লা*, শায়খ মুবারক আলী কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর , ১৯২২, পৃ. ৫

৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৬। *গালিব*, পৃ. ২

৭। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, সাধনা প্রেস কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ.১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

৮। গালিব, *উদে হিন্দি*, রামনারায়ন লাল প্রকাশনী, এলাহবাদ, তারিখ বিহিন, পৃ. ১১

৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১০। মির্জা গালিব, পৃ. ৪৪

১১। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭২

১২। মির্যা গালিব, *দিওয়ানে গালিব*, লাহোর, তারিখ বিহিণ, পৃ. ১৮

১৩। *গালিব*, পৃ. ৭

১৪। *দিওয়ানে গালিব*- পৃঃ ৩১

১৫। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭০

১৬। মজনু গোরখপুরি, *গালিব শখস আওর শায়ের*, এডুকেশনাল বুক হাউজ, আলীগড়, ২০০১, পৃ. ১৯

১৭। মনির উদ্দীর ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ১৯১

১৮। *উদে হিন্দি*, পৃ. ৫

১৯। *মির্যা গালিব*, পৃ. ১৭

২০। আলতাফ হোসাইন হালী, *ইয়াদগারে গালিব*, নামি প্রেস, কানপুর, ১৮৯৭, পৃ. ২২

২১। *উদে হিন্দি*, পৃ. ৬

২২। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭০

২৩। *উদে হিন্দি*, পৃ. ৭

২৪। *গালিব*, পৃ. ১৭

২৫। *মির্যা গালিব*, পৃ. ১৮

২৬। *গালিব*, পৃ. ১৯

২৭। *উর্দুয়ে মুয়াল্লা*, পৃ. ১০৭

২৮। প্রাগুক্ত-পৃ. ২৮-২৯

২৯। ড. ইউসুফ হোনাইন খাঁ, *গালিব আওর আহাঙ্গে গালিব*, পৃ. ৬৪

*Dhaka University Institutional Repository*

৩০। প্রাগুক্ত-পৃ. ৬৮

৩১। *গালিব*, পৃ. ৬৩

৩২। *মির্যা গালিব জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩১

৩৩। প্রাগুক্ত-পৃ. ২১

৩৪। মির্যা গালিব, *খুতুতে গালিব*, ২য় খন্ড, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর, ১৯০৫,পৃ. ৩৭৭

৩৫। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭১

৩৬। *গালিব*, পৃ. ৭৭

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৩৮। প্রফেসর আলাউদ্দীন সিদ্দিকী, তানকিদে গালিব সো( ১০০) সাল, পৃ. ৮১

৩৯। মির্যা গালিব -পৃ. ২০

৪০। *গালিব*, পৃ. ২৯

৪১। *উর্দুয়ে মুআল্লা*, পৃ. ৬৪

৪২। গোলামরাসূল মিহির, পৃ. ৮৩

৪৩। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৭৮

৪৪। মির্যা গালিব, পৃ, ২৫

৪৫। *উদ্দু সাহিত্যের ইতিহাস* - পৃ. ১৭৮

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

৪৭। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ২৮

৪৮। ড. মো: ইস্রাফীল, *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, টি এন্ড টি পাবলিশার্স, ঢাকা-জুলাই, ২০১৪, পৃ. ৯১

৪৯। *দিওয়ানে গালিব কামিল*, পৃ. ২২২

৫০। প্রফেসর শওকত সবজওয়ারী, *ফালসাফায়ে কালামে গালিব*, কওমি কিতাবখানা, মার্চ ১৯৪৩, পৃ. ১৮৫

৫১। প্রফেসর ড. ইস্রাফিল-পৃ. ৯৪

৫২। প্রফেসর নুরুল হাসান নকবী, *গালিব শায়ের আওর মাকতুব নেগার*, এডুকেশন বুক হাইজ, তারিখ. বিহীণ,পৃ. ১২২

৫৩। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৯৪

৫৪। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১১

৫৫। *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, পৃ. ৯৫

৫৬। ইউসুফ সেলিম চিশতি, *শরহে দেওয়ানে গালিব*, ইশরাত পাবলিকেশন, পৃ. ৪১

৫৭। *উদে হিন্দি*, পৃ. ১২

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬০। মনির উদ্দীন ইউসুফ, দেওয়ানে গালিব, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা ও বাংলা একাডেমি,২০০৫, পৃ. ২৩

৬১। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ৪১

৬২। *ইয়াদগারে গালিব*, পৃ. ৭২

৬৩। উর্দু সাহিত্যে ইতিহাস, পৃ. ১৭৭

৬৪। উর্দু সাহিত্যে ইতিহাস, পৃ. ১৭৮

৬৫। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ, ৫২

Dhaka University Institutional Repository

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য

## ভূমিকা

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব উপমহাদেশের একজন বিস্ময়কর কাব্যপ্রতিভা। তিনি শুধুমাত্র একজন কবিই নন, ছিলেন যুগ প্রবর্তক। গালিব এগার-বার বছর বয়স থেকে কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কাব্যের শুরু হয়েছিল ফারসিতে। পরবর্তীতে উর্দুকেই তাঁর কবিতা চর্চার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। শুরুতে তাঁর কাব্যনাম ছিল আসাদ। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন যে, আসাদ নামে অন্য একজন কবিতা লিখছেন এবং অনেকে সে কবির কবিতাকে তাঁর কবিতা বলে ভুল করছে। এই ঝামেলা নিরসনের জন্য তিনি আসাদ নামের পরিবর্তে গালিব নাম গ্রহণ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে গালিবের কাব্যের বৈচিত্র্যরূপটি তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হবে।

## গালিব কবিতায় বিস্তৃত বিষয়াবলী

মির্জা গালিবের পূর্ব যুগে কবিতা চর্চা হতো একে বারেই সুনির্দিষ্ট ও গতানুগতিক নিয়ম কানুন অনুসরণ করে এবং কবিতার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় না। এ কারণেই মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী গালিবের আগের যুগের কবিতার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ তুলে ধরেছেন। কিন্তু মির্জা গালিব এসকল অভিযোগ ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে বিস্তৃত বিষয় বৈচিত্র্যে কাব্য চর্চা শুরু করেন। যে সকল কবিতার ব্যাপারে অভিযোগ করে বলা হয় যে, এসব কবিতার মধ্যে প্রেম প্রীতির কথা বার্তা ও বাক্যালাপ ছাড়া আর কিছুই নেই, সে সকল কবিতায় মির্জা গালিব মানুষের জীবনের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে কবিতাগুলীকে অনেকগুণে সমৃদ্ধ করেছেন।[১]

মির্যা গালিবের সম্পূর্ণ কবিতাই ছিলো জীবনমুখী ও জীবনদর্শনীয় তিনি মানুষের সারা জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কবিতা লিখতেন ও কাব্য চর্চা করতেন। গালিব যে সর্বদাই গণ মানুষের কবি ছিলেন তার প্রমাণ হলো মির্যা গালিবের নিম্নোক্ত সাতটি পংক্তি সম্বলিত গজল। নিম্নে গালিবের সাতটি পংক্তি ও তার বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

آہ کو چاہئے اک عمر اثر ہونے تک

کون جیتا ہے تری زل کے سہر ہونے تک[২] .

(বন্ধু আমার এখোনা, আফসোস মনে, জীবন ভর,

কার সে সৌভাগ্য জিতে নিবে তোমার কেশগুচ্ছ সব।)

دام ہر موج میں ہے حلقہ صد کام نہنگ

دیکھیں کیا گذرے قطرے یہ گہر ہونے تک[৩]

(বৃষ্টির প্রতিটি ফোটায় আছে বিরাজ মুক্তধন,

ঢেউয়ের ফাঁকে তা ভক্ষণ করে কুমির দল,

শিশুর জন্ম উদ্দেশ্যে যদিও শুভ হয়

প্রতিকুলতার তা সব ব্যর্থ হয়।)

عاشقی صبر مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن

خاک ہو جائنگے ہم تم کو خبر ہونے تک

عاشقی صبر طلب او تمنا بے تاب

دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک[৪]

(প্রেমে চাই তো ধৈর্যধারন

কিন্তু সেটা মানে না মন

কোন প্রবোধে বোঝাই তাকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রম হৃদয়ে রক্তক্ষরণ।)

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن

خاک ہو جائینگے ہم تم کو خبر ہونے تک[৫]

(মৃত্যুর সংবাদ শুনে তুমি আসবে সেতা জানি

তুমি সংবাদ পাবার আগেই মাটিতে মিশে যাব আমি।)

پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم

میں بھی ہوں ایک عنایات کی نظر ہونے تک[৬]

(প্রেমের প্রকৃত সুধা হলো নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া

প্রেমিক যুগল প্রেমের টানে মুহূর্তে হয় একাকার)

یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل

گرمی بزم ہے اک رقص شرر ہونے تک[৭]

(অলস বসে থাকা এক মুহূর্তের সময় নেই,

দুনিয়ার খেল-তামাশা ক্ষণস্থায়ী অগ্নিস্ফুলিংগের ন্যায়)

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج

شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک[৮]

জীবন জ্বালার হয় উপশম, আসাদ আসে মরণ যদি

প্রদীপ কে তো জ্বলতে-ই হয় সকাল আসার আগ অবধী

প্রথম কবিতার বা প্রথম পংক্তির বিষয় বস্তু হলো প্রেম অর্থাৎ গালিব ছিলেন প্রেমের কবি। প্রথম পংক্তিতে গালিব বলেছেন যে, আমরা যখন কোন প্রেমিকার বিচ্ছিন্নতা অনুভব করি তখন আমাদের মন ব্যাথা ও বেদনায় ভরে ওঠে, তখন মুখ থেকে 'আহ'! শব্দ বেরিয়ে আসে। আর সে শব্দটি মনের ভিতর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। তবে প্রেমিকা হয়তো বা বহুদিন পর আমার সাক্ষাতের জন্য আসবে কিন্তু ততক্ষনে আমি মাটির সাথে মিশে যাব। অতএব বোঝাই যাচ্ছে আলোচ্য প্রথম পংক্তিটির বিষয়বস্তু হলো মানব জীবনের প্রেম।

দ্বিতীয় শেরটি (পংক্তি) বিষয়বস্তু হলো দর্শন। গালিব বলেন প্রতিটি বর্ষাকালের বৃষ্টির প্রথম ফোটা ঝিনুকের মধ্যে মিলিত হয়ে মুক্তা তৈরি হয়। কিন্তু সমস্যা হলো সাগরের ঢেউয়ের মধ্যে রয়েছে শত শত কুমির, আর তাদের মুখ থাকে সর্বদা খোলা যারা সর্বদা উদগ্রিব থাকে শিকারি দিয়ে নিজেদের ঊদর ভরার জন্য। আর যদি বর্ষা মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির ফোটা ঝিনুকের মুখে না পড়ে সাগরের সেই কুমিরের মুখে গিয়ে পড়ে তাহলে সেই বর্ষা মৌসুমের প্রথম ফোটাটি হয়ে যাবে তাদের খোরাক। আর এটা হওয়াই স্বাভাবিক। যারফলে শেষ পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যায়। গালিব বলেন উপরোক্ত উপমাটি প্রদান  করার উদ্দেশ্য হলো ঐ যে, মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন সে নিষ্পাপরূপে দুনিয়াতে আসে আর যদি সাথে সাথে তার পরিবার, সমাজব্যবস্থা ভালো হয় তাহলে সে মানুষটি বেড়ে ওঠে মহাজ্ঞানী হিসেবে। আর যদি পরিবেশ পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিকূল হয় তাহলে মানব সৃষ্টির মহান উদ্দেশই বৃথাহয়ে যায়।

এই শেরটিতে মানব জীবনের কঠিন বাস্তবতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় কবিতাংশে গালিব বলেন, প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে মাহবুব যদি কোন শক্ত দড়ি দিয়ে বাধা থাকে বা কোন  শক্ত লোহার খাচায় আটকা থাকে তবুও সে দৌড়ে দৌড়ে কাছে চলে আসবে। তবে সে প্রেমে গালিব শর্ত দিয়েছেন, আর সে শর্ত হলো মাহবুবের জন্য অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে এবং অনেক ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।

তবে বাস্তবতা হলো এই যে, সকল আশা আকাংক্ষা, অপেক্ষা সব বৃথা, কারণ অবশেষে মাহবুবের জন্য কান্না করতে করতে কলিজার পানি শুকিয়ে যাবে এবং কলিজা থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শুরু করবে ।

চতুর্থ কবিতাংশে গালিব আরো বলেন-হে আমার প্রেমিকা তুমি যখন আমার শারিরিক দুরবস্থার কথা মানুষের কাছে শুনতে পাবে আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার মিলনে ধরা দিবে কিন্তু লোকেরা এতই দেরীতে তোমাকে সংবাদ পৌছাবে যে, ততক্ষনে আমার মৃত্যু হয়ে আমার দেহ মন ও হাড্ডি গুড্ডি মাটির সাথে মিশে যাবে।

পঞ্চম শেরেটির বিষয় বস্তু হলো সুফীবাদ বা সুফী দর্শন, গালিব এই পংতিতে সূফীবাদ কে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত প্রেমিক এর দৃষ্টিতে প্রেমপ্রীতি ও বন্ধুত্ত্ব মানবীয়

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্রকে এমন করে তোলে যে, সে তার নিজেকে ও নিজের ব্যক্তি সত্ত্বাকে একেবারেই বিলিন করে দেয়। সে নিজেকে নিজে ভুলে যায় এবং প্রিয়ার প্রেমসাগরে ও জাতি সত্ত্বায় নিজেকে বিলিন কওে দেয় ও একাকার হয়ে যায়। যেমনটা বিখ্যাত সুফী সাধক জনাব মনসুর হাল্লাজের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তিনি মহান আল্লাহ তায়লাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তুমি এবং আমি একদম মিলে গিয়েছি। তোমার ও আমার মাঝে আর কোন পার্থক্য থাকলোনা এবং মনসুর হাল্লাজ বলতে শুরু করলো (اناالحق) আমিই সত্যবাদী।

৬ষ্ঠ পংক্তিতে গালিব দুনিয়ার খেল-তামাশা ও নাজ নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন। গালিব বলেন পৃথিবী খুবই ক্ষণস্থায়ী। আর এটা এতোই ক্ষনস্থায়ী যে তার উদাহরণ হলো চোখের পলক- অর্থাৎ চোখের পলক যেমন প্রতি নিয়তই পরিবর্তন হয় ও উঠানামা করে যার স্থায়ীত্ব খুবই কম। গালিব আরো বলেন, পৃথিবীটা এতোই সংক্ষিপ্ত যে, তা প্রদীপের আলোর মতো, প্রদীপের আগুন বা আলো যেমন খুব দ্রুত জলে ওঠে এবং তা ফুঁফ দেওয়ার সাথে সাথে নিভে যায় এতে সময়ের কোন পরিমাপ থাকে না ঠিক পৃথিবীটাও এরকম, এর কোন স্থায়ীত্বের গ্যারান্টি নাই। প্রতিনিয়তই পৃথিবী পরিবর্তিত ইচ্ছে মুর্হুতের মধ্যে দুনিয়া উলট পালট হয়ে যাচ্ছে। অতএব গালিবের ৬ষ্ঠ নং শের দ্বারা প্রতিয়মান হলো দুনিয়াটা খুবই ক্ষণস্থায়ী এর কোন স্থায়ীত্ব নেই। দুনিয়ার যাবতীয় নাজ নিয়ামত আমোদ প্রমোদ আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাঙ্গা গড়া সবই পুতুল খেলার মতো। আর এ কথা গুলি গালিব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটি মাত্র শেরের মাধ্যমে সংবাদ প্রদান করে উর্দু কাব্য জগতকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন এবং উর্দু কবি সাহিত্যিকদেরকে ধন্য করে তুলেছেন। মির্জা গালিব মাকতা এর মধ্যে বর্ণনা করেন যে, মানুষের জীবনটা দুঃখ কষ্টে, গ্লানি, হতাশা, নিরাশায়, ভরপুর মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত এই সব দুঃখ কষ্ট থেকে, আশা-নিরাশার হাত থেকে কেউ মুক্তি পায় না।

উদাহরণ স্বরূপ গালিব বলেন সকালের আলো যেমন সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে জ্বলতে থাকে এবং তা সন্ধায় সূর্যাস্তের আগ মুহুর্ত পর্যন্ত দীপ্তমান থাকে, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনের অবস্থা। মানুষ তার জন্মের পর থেকেই দুঃখ কষ্ট ও জ্বালা -যন্ত্রনার জীবন সূচনা করে এবং এ যন্ত্রনা-ব্যাধি শেষ জীবন পর্যন্ত মেনে নিয়েই তার জীবন পরিচালনা করতে হয়। তাবে মানবকুল তার কর্মের মাধ্যমে মৃত্যুর পর পরকালে শান্তি ভোগ করতে পারেন, যদি তার দুনিয়ার কর্ম হয় প্রভূর কাছে পছন্দনীয় হয়। আর যদি মানবকুলের কোন কর্মই মহান প্রভূর দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে সে চিরদিনই দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও যন্ত্রণার আগুনে পুড়তে থাকবেন।

গালিবের এই সাতটি শের সম্বলিত গজলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় মির্যা গালিব ছিলেন জীবন দর্শন ও জীবনবোধের কবি। তিনি মানবজাতীর পুরা জীবন এর ইতিহাস, কালচার, সমাজব্যবস্থা, পরিবেশ, পরিবার, দেশ, জাতী অর্থাৎ জীবনের সর্বদিক নিয়ে

কবিতা রচনা করেছেন। আলোচ্য গজল খানির প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ শের এর বিষয়াবলী হলো প্রেম। অর্থাৎ গালিব মানবজীবনের প্রেম ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় শেরের মধ্যে মানবকুলের সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব মানুষের জীবনের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। পঞ্চম শেরের বিষয় বস্তু হলো সুফী দর্শন বা সূফীবাদ। ৬ষ্ঠ শেরের মধ্যে দুনিয়ার জীবন ও ক্ষণস্থায়ীর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'মাকতার' মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানব জাতীর সারাজীবনটাই চিন্তামুক্ত হওয়ার অসম্ভব ব্যাপার।

গালিবকে জীবন বোদ ও জীবন দর্শনের কবি বলা হয়। কারণ গালিব নিজের জীবন পরিবার, আত্মীয় স্বজন, সমাজ দেশ ও জাতীয় জীবনকে অনেক নিকট থেকে অনেক চিন্তাশীল ও বিচক্ষণতার মন ও চোখ দিয়ে অবলোকন করেছেন। গালিবের জীবনের বিভিন্ন ধরনের উত্থান ও পতন ঘটেছে। এ উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়েই গালিব জীবন অতিবাহিত করেছেন। কখনো কখনো গালিবের জীবন প্রাচুর্য্য ও ফলে ফুলে এবং সুগন্ধিতে ভরে উঠেছে। আবার কখনো কখনো বিপদ-আপদ, দুঃখ-যন্ত্রনা এমন ভাবে এসেছে যে, তা দেখে মনে হয় আকাশ ভেঙ্গে পরেছে। এ সকল বিষয়গুলী মির্যা গালিব তার কবিতায় অত্যন্ত প্রাণবন্ত করে বর্ণনা করেছেন। গালিব অনেক গর্বের সাথে বর্ণনা করেন এবং কবিতা রচনা করেন এভাবে যে, আমি আমার ছোট জীবনে হাজার হাজার মানুষ ও কবিদের সাথে উঠাবসা করেছি এবং তাদেরর জীবন সংগ্রাম অত্যন্ত নিকট থেকে সুগভীরভাবে অবলোকন করেছি।

আর এ সকল বাস্তব অভিজ্ঞতা মির্যা গালিবের কবিতাকে অনেক গুন উন্নত করেছে। আর এর মাধ্যমে গালিবের উর্দু কবিতা দুনিয়াব্যাপী প্রসারিত হয়েছিল।

যে সকল বিচক্ষন বিদগ্ধ প্রতিভাবান পণ্ডিতগণ গালিবের কবিতা ও কাব্যচর্চাকে সুবিশাল ও সুপ্রসারিত বলে মনে করেন তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ অতিরঞ্জিত ও অতি উৎসাহিত হয়ে সীমানা অতিক্রম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ মির্যা গালিবের নিম্নোক্ত মেসরাটি:-

گدا سمجھ کے وہ چپ تھا میری شامت آئے

اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسپاں کے لئے[৯]

(জীবনের সকল কষ্টকর ও কঠিন কর্ম

কৃষক ও মুজদুরীরা সম্পূর্ণ করে ।)

আলোচ্য পংক্তি দ্বার মির্যা গালিব একথাই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি জীবনে উন্নতি, সফলতা, অনেক বেশি পছন্দ করতেন। এবং গালিব সমাজের মেহনতী মানুষের বিশেষ করে কৃষকদের কথা ও তাদের সাহায্য করার কথা বেশি বেশি বলেছেন।

তাদের অনেক ভালোবাসতেন তাদের সাহায্য করতেন। তাদের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দিতেন। যেমন রাসূল (সাঃ) শ্রমিকের মর্যাদা ব্যাপারে বলেন। হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরী দিয়ে দিবে। (ইবনে মাযাহ) গালিবের কবিতার এসকল আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমানিত হয়েছে যে, মির্জা গালিব ছিলেন মানব প্রেমিক, মানুষের প্রতি গালিব ছিলেন অতি সহনশীল ও দয়াবান এ কথা কোন উর্দু কবিই অস্বীকার করতে পারবে না। মোট কথা মির্যা গালিব উর্দু কবিতার গজলকে প্রেমময় ও প্রেম বাগান হিসাবে তৈরি করেছেন এবং সে প্রেমময় কবিতা দিয়েই মানব জাতীর পুরা জীবনের প্রতিচ্ছবি সমাজের সকল দিক ও বিভাগে সম্প্রসারিত করেছেন, মানবজাতীর জীবনকে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার চাদরে আবৃত করেছেন নিজ অভিজ্ঞতায়।

## প্রেম ও সৌন্দর্য

মির্যা গালিব মূলত গজলের কবি। গালিবের রচনাবলীর সিংহভাগই হলো উর্দু গজল। গালিব পাঠক সমাজের কাছে উর্দু গজলের কবি হিসাবেই বেশি পরিচিত। গজল হলো অন্তরের গভীর বাক্যলাপ ও কথোপকথন। মনের গহীন ভূবনে সংগঠিত সকল ঘটনা প্রবাহই ইশ্‌ক বা প্রেমকে সবচেয়ে বেশি সুসজ্জিত করে। প্রেম এমন কিছু সংগঠিত কাহিনি যা প্রতিটি মানব অন্তরে কখনো না কখনো অতিবাহিত হবেই। আর গজলের কবিদের জন্য এই প্রেম সাগরে সাতার কাটাতো একটি মা'মুলি ব্যাপার ও একদম স্বভাবজাত ঘটনা। গজলের পাঠক সমাজও সবচেয়ে বেশি এই প্রেম জগতে হাবুডুব খান, কারণ প্রতি নিয়ত তার প্রেম কাহিনি সমৃদ্ধ গজল পাঠ করেন এবং তাদের হাতের নিকট দিয়েই বেশি প্রেমময়ী ঘটনা অতিক্রান্ত করে। [১০]

গজলের পরিভাষায় যে যত বেশি সুন্দর জানতে ও বুঝতে পারবে সে ততই সৌন্দর্য পুজারি হবে, আর সৌন্দর্য পুজারির অপর নাম হলো প্রেম ও ভালোবাসা। গলিব যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে সে, বংশের লোকেরা অর্থাৎ গালিবের পূর্ব পুরুষরা বুনিয়াদি ভাবেই সৌন্দর্য্য প্রেমিক ছিলেন। গালিব যে পরিবেশে ও সমাজে বসবাস করে বেড়ে ওঠেন সে সমাজ ছিলো খুবই পর্দানশীল। এমন অবস্থা ছিলো যে, কোন রমণীর সাক্ষাৎ পাওয়া ছিলো দুশকর। আর বেশি বাড়াবাড়ি করার কারণেই সমাজের যুবকগণ সৌন্দর্যের প্রতি বেশি আসক্ত হয়ে ওঠে। গালিব নিজেই ছিলেন সে সময়ে এক যুবক, এবং অতি প্রাচুর্য ও সুখময় জীবন অতিবাহিত করেন। গালিবের মাকাতিব এ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যপারে সাক্ষ্য দান করেন যে, গালিব বেশ কয়েক জন রমণীর সাথে গভীরভাবে জানাশোনা ও পরিচিত ছিলেন। এবং তাদের সাথে তার প্রেম আদান প্রদান হয়।

মির্যা গালিব শের বলা শুরু করলেই সৌন্দর্য ও প্রেম এ দুটি বিষয় তাঁর কবিতার বিশেষ বিষয়বস্তু হয়ে যায়। গালিবের কবিতা গাওয়ার প্রথম যুগটা ছিলো এমন যে, সমস্ত উর্দু কবিগণ ফার্সী কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উর্দু কবিতা ও গজল রচনা করেন। আর এ 'হুসন' ও ইশ্‌ক সমৃদ্ধ গজল গুলী অনেক নিয়মনীতি অনুসরণ করে রচনা করা হয়। এরকম প্রেম কাহিনীকে ধারাবহিক নিয়মনীতি অনুসরণীয় বা বর্ণনা মূলক প্রেমকাহিনী বলে। [১১]

কিন্তু আমাদের উর্দু সাহিত্যের মহান কবি মির্যা গালিব প্রেমের এরকম বাধ্যবাধকতা ও চিন্তাশীলতা উপেক্ষা করে অন্য ভাবে প্রেম কবিতা রচনা করেন। মির্যা গালিবের কবিতার রূপবৈচিত্র্য হলো খাঁটি ও বাস্তব বিষয় বস্তুতে পরিপূর্ণ। তিনি প্রেমকে একটি গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য প্রতিচ্ছবি স্বরূপ পাঠক সমাজের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরকম খাঁটি ও বাস্তব প্রেমময়ী কবিতা গালিবের পূর্বে যিনি লিখেন তিনি হলে মীর। কিন্তু তার কবিতাতেও প্রেমিকার সাথে বাক্যলাপের মধ্যে অনেক আদব ও সম্মান মেনে চলা হয়। এরকম একটি কবিতার উদাহরণ নিম্ন রূপঃ

دور بیٹھا غبار میر اس سے

عشق بن یہ ادب نہیں آتا[১২]

(দূরে বসে প্রেম নিবেদন শোভা পায়না মীরের কাছে,

এর নাম প্রেম-প্রীতির আদব নয়।)

মীর বলতে চাচ্ছেন যে, দূরে বসে বসে তো ভালোবাসা বা প্রেম বিনিময় করা এটা মীরের কাছে কোন আদব বলে মনে হয় না। বরং মীর বলতে চান আমি যাকে প্রেম ও ভাব নিবেদন করবো আমি সরাসরি প্রেমিকের নিকট সাক্ষাৎ করে প্রেম বিনিময় করবো। আর এটা হলো আদব ও ইহ্‌তেরাম। কিন্তু মির্জা গালিবের মুয়ামেলা বা ব্যবহার ও আদান প্রদান হলো এর পুরো বিপরিত। গালিব প্রেমময়ী কবিতা বর্ণনা করতে কোন আদব ইহ্‌তেরামের ধার ধারেন না। এ সম্পর্কে মির্জা গালিবের একটি শের হলোঃ

دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا

ہم ہی کر بیٹھے تھے غالبؔ پیش دستی ایک دن[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রেম নিবেদনে সরাসরি সাক্ষাৎ বা রীতি মানার দরকার নেই,

গালিব প্রেম করে কখনো দূরে বসে, কখনো বা সরাসরি।)

মির্জা গালিবের একটি প্রেম প্রসঙ্গে পর্যালোচনা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ মহান কবি গালিবের জীবন একটি প্রেম ঘটিত ব্যাপার ঘটে, যা তার জীবনে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলো। তিনি তখন যুবক। পঁচিশের অনূর্ধ্ব বয়স। তাছাড়াও তিনি স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং যথেষ্ট স্বচ্ছল জীবন যাপন করছিলেন। তিনি যে সমাজে বসবাস করতেন সে সমাজে দাসী ও উপপত্নী রাখাটাকে মোটেও খারাপ নজরে দেখা হতো না। বরং বিপরিত সে সময় তাকে সমাজের একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরূপে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো।

সেই সময়ে শিক্ষিত, বিদ্বান, রাজনেতা, ধর্মশাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিরা তাদের পারিবারের স্থায়ীভাবে দাসী রাখতেন এবং গায়িকা ও নর্তকীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতেন। কোন কোন পতনোম্মুখ সমাজে চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিলো। সে সময় সমাজ অধঃপতিত ব্যক্তিদের বহুক্ষেত্রে অনেক ছাড় দিয়ে ছিলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে দিল্লিতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। মোগল শাহী বংশের শেষের দিগ্‌কার বাদশাহদের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো তা ছিলো তাদের পূর্বসূরীদের গৌরব মর্যাদারই অংশ।

আওর্‌ঙ্গজেবের যুগ পর্যন্ত যিনিই মোগল রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতেন, তিনি সাধারণভাবে সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অসাধারণ প্রশাসক হতেন। তাঁর পর্যাপ্ত বুদ্ধিভিত্তিক ক্ষমতা থাকতো এবং মুখ্যরূপে সক্রিয় কর্মী হতেন। যে কোনো পরিস্থিতিতেই তাকে সামনা সামনি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হতো। ফলস্বরূপ, সাম্রাজ্য শুধুমাত্র ভৌগোলিক দৃষ্টিতে প্রসারিত হয়নি বরং শক্তি ও সমৃদ্ধির দিক দিয়েও তা সংগঠিত ছিলো। সরকারি কোষাঘারেও পর্যাপ্ত সম্পদ জমা হতো এবং সৈন্যরা ছিল সন্তুষ্ট। [১৪]

আওর্‌ঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে) সেই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এদিকে রাজধানীতে অবস্থিত দরবারী আমলারা বাদশাহর কাছ তেকে অধিক মুনাফা ও ক্ষমতা হাসিলের জন্য একে অন্যের বিরুদ্দে প্রায়ই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো । বিভিন্ন গোষ্ঠী এই ভাবে ঝগড়া লড়াইয়ে লিপ্ত থাকার ফলে চারদিকে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিলো প্রত্যেক মানুষেরই পর্যাপ্ত অবসার থাকার কারণে তারা ভেবে পেত না যে, এই অবসর সময়টা কার পিছনে কিভাবে ব্যয় করবে। রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ছিলো, কিন্তু তার ধর্ম ও নৈতিকতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।

Dhaka University Institutional Repository

এমন কিছু মানুষ ছিলেন যারা এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন, কিন্ত তাদের কথা কেউ শুনতো না। এই অবস্থায় শরাব, জুয়া আর নর্তকীদের নাচ গানের আসরে গানের সঙ্গে তাল দিয়ে ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়ে সময় অতিবাহিত হতো। ১৫

যে মহিলাটি সঙ্গে গালিবের প্রেম হয়েছিলো সে কোন সমাজের মানুষ ছিলো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেক দিন পরে লেখা তার এক পত্রে এ প্রসঙ্গটি তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাকে ডোমনি বলে উল্লেখ করেছেন, যার প্রচলিত অর্থ বাঈজী।

যদি আমাদের অনুমান ভ্রান্ত না হয় তাহলে মনে হয যে, সেই স্ত্রীলোকটি যৌবনেই মারা গিয়েছিলেন। কেন না গালিব তাকে নিয়ে একখানি মরসিয়া (শোকগাঁথা ) লিখেছিলেন, সেটি বস্তবত সেই উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিলো।

মরসিয়াটি নিম্নরূপঃ

درد سے مرے ہی تجھ کو بیقراری ہائے ہائے

کیا مولی ظالم تری خلقت شعاری ہائے ہائے

تیرے دلمیں مگر نہ تھا آشوب غم کا حوصلہ

تونے پھر کیوں نہ کی تھی میری غمگساری ہائے ہائے

کیوں مری غمخوارگی کا مجھکو آیا تھا خیال

دشمنی اپنی تھی میری دوستداری ہائے ہائے

عمر بھر کا تم نے پیمان وفا باندھ تو کیا

عمر کو بھی نہیں ہے پائیداری ہائے ہائے

زہر لگتی ہے مجھے آب وہوائے زندگی

یعنی تجھ سے اسے ناسازگاری ہائے ہائے

Dhaka University Institutional Repository

گلفشانی ہائے ناز جلوہ کو کیا ہو گیا

خاک پر ہوتی ہے تیری لالہ کاری ہائے ہائے

شرمک سوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں

ختم ہے الفت کی مجھ پر پردہ داری ہائے ہائے

خاک میں ناموس پیمان محبت مل گئی

اٹھ گئی دنیا سے واہ رسم یاری ہائے ہائے

ہاتھ سے تیغ آزماں کا کام سے جاتا رہا

دل پاک لگنے نہ پایا زخم کاری ہائے ہائے

کس داغ کاٹے کوئی شبہائے تار بر شکال

ہے نظر خود کردہ اختر شماری ہائے ہائے

گوش مہجور پیام و چشم محروم جمال

اک دل تسیہ یہ نا امید واری ہائے ہائے

عشق نے پکڑا نہ تھا غالب ابھی وحشت کا رنگ

رہ گیا تھا دل میں جو کچھ ذوق خواری ہائے ہائے.[১৬]

(তুমি বিনে হৃদয় আমার ব্যথায় কাদে হায় রে হায়!

কোন জালিমের তীর এসে গো তোমার বুকে বিধলো হায়!

তোমার হিয়ায় দুঃখ ব্যথা সওয়ার শক্তি ছিলো নাকো

তুমি কি গো আসবে আবার সাথে মিলতে হায়!

আমার সাথে মিলতে তোমার এসেছিলো কোন সে খেয়াল

*Dhaka University Institutional Repository*

দুশমনি তো বন্ধু মাঝে লুকিয়ে ছিলো হায়রে হায়!

আজীবনের তরে তুমি বেধে গেলে মায়ার ডোরে

তাই তো কভু সারা জীবন তোমায় আমি ভুলবো না হায়

আগুন হাওয়ার এ জিন্দেগী তীরের মতোই লাগছে বিষ

তোমার মধুর সেই সে প্রেমে পুষ্পবর্ষা হইবে জেনো

শুকনো ফুল ও পাতার মতো জীবন খানি খাক হয়ে যায়

জীবন আলোয় পর্দা নামে তাই তো আমি কাঁদি বসে

শেষ হয়ে যায় তোমার দেখা পরম বন্ধু হায়রে হায়!

পোড়া হৃদয় হতে আমার বেরিয়ে আসে প্রণয় বচন

দুনিয়া ছেড়ে চিরতরে চলে গেলে হায়রে হায়!

হাতের এ তেগ ফসকে গেলো কোন সুদূরে জানিনা তা

গভীর ক্ষতে ভরে গেল হৃদয় আমার হায়রে হায়!

কেমন করে কাটবে বলো বর্ষাকালের আধার রাত?

তোমায় বিনে গহীন রাতে নভের তার গুনবো হায়।

মধুর বাক্য শুনতে কানে দেখতে চোখে রূপের আলো

একটি হৃদয় কাঁদবে শুধু তোমায় বিনে হায়রে হায়

প্রেম কখনও যায় না ধরা অবুঝ গালিব জানো নাকো

গহীন হিয়ায় সব রয়ে যায় প্রকাশ করা যায় না তা হয়।)

ধারণা করা যায়, তিনি কোনো উচ্চবংশীয় রমণী ছিলেন। কেননা, এ মরসিয়া থেকে সে রকম ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে, প্রেম পড়ার পর ঘরে বাইরে তা নিয়ে চর্চা হওয়ার কারণে লোক লজ্জার হাত থেকে বাঁচার  জন্য তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। যদি তিনি কোন সাধারণ বাইজী হতেন তাহলে এরকম বিতণ্ডা ও লোক লজ্জাজনিত অপমানে আর তার আত্মহত্যার কোন প্রশ্নই উঠতো না।

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রারম্ভিক প্রেমের দুঃখজনক **পরিণতি** গালিবের জীবনে এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলো। তার জমানার সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তার জীবনের এরকম ভাবপ্রবণ একাধিক ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিলো, কিন্তু সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।

সমকালীন যুগের এমন সামাজিক অবস্থার প্রভাব থেকে গালিবের পক্ষেও বাঁচা সম্ভব হয় নি। তিনি শরাব পান করতে শুরু করে দেন। কখনও কখনও জুয়াও খেলতেন। এই ধরনের খেলা থেকে তার পর্যাপ্ত ও নিয়মিত আয় যে হতো না তা নয়। আগ্রায় যতদিন পর্যন্ত তার মা জীবিত ছিলেন তত দিন পর্যন্ত আমরা অনুমান করতে পারি যে, তার মা তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। নবাব আহমদ বখ্শ খাঁ ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণ ছাড়াও নৈতিকভাবে তাকে যথেষ্ট সহায়াতা করেন।

নবাব সাহেবের ক্ষমতা ত্যাগ করার পর তার অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়ে। গালিবের আর্থিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এমতাবস্থায়, মানুষ কোনো না কোনো একটা বাহানা খুজে নেয়। [১৭]

গজলের ভূবনে প্রেমের বিকাশ ও অভিব্যক্তি লক্ষ করলে দেখা যায়, আমরা সরাসরি এক প্রেমিক যুগলের পূর্ণ প্রেমের ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছি, এরা যুবক যুবতী। কিশোর প্রেম পর্ব রাগ, অভিসার ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এসেছেন। অথবা মনে করতে হয়, এ সব স্তর কখনো ছিলো না। অথচ নায়িকার বয়স ও মানসিক অবস্থা ভেদে কতো না ভিন্ন ভিন্ন নামে আমরা সংস্কৃত সাহিত্য দেখেছি। যথা মধ্যা ধীরা, অধীরা, বিদগ্ধা, ললিতা,, মুদিতা, উৎকণ্ঠিতা, অভিসারিকা, বিপ্রলব্ধ, প্রোষ্টি ভর্তৃকা ইত্যাদি।

গজলের নায়িকা সর্বদাই বিরহ যন্ত্রনায় অস্থির, তার বিরহকাল ও দীর্ঘায়িত এবং অনুক্ষণ তিনি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছেন। তার চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছে, এবং সে অশ্রু যেন রক্তের মতো তপ্ত। তার দেহ শীর্ন হয়ে যাচ্ছে তবু বিরহের অবসান হচ্ছে না। প্রেমিকা মনে করেন প্রেমিক নিয়তই তার প্রতি অত্যাচার করছে। প্রেমিকার বিশ্বাস তার প্রতি সর্বদাই বে-ওফাহ্, সর্বদাই কষ্টদায়ক। বেদনার পরিমণ্ডলেই প্রেমের শ্রেষ্ট প্রকাশ। এই চিন্তাকে মৌলিক ও চিরন্তন সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। বেদনা যদি না হয়, যন্ত্রনা যদি না এলো জীবনে, বিরহের আগুনে যদি ধূপের মতো নিঃশেষ হয়ে না গেলাম, তবে আর ইশ্ক কাকে বলে? [১৮]

নিম্নে মির্যা গালিবের দিওয়ান থেকে একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

عاشقی صبر طلب وتمنائے بے تاب

دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک [১৯]

(প্রেমে চাই তো ধৈর্যধারণ

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সেটা মানে না মন

কোন প্রবোধে বোঝাই তাকে

প্রেম হৃদয়ে রক্তক্ষরণ।)

প্রেমিকের নিষ্ঠুরতার বিচিত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায় গালিবের কবিতায়।

গালিব সর্বদা প্রেয়সীর মন জয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার প্রেমিকা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। প্রেমিকা সর্বদাই গালিবের সাথে অতি নিষ্ঠুর আচরন করেছেন। তাই প্রেমিক কবি গালিব এই চিরাচরিত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন।

নিম্নে এমনি একটি কবিতা গালিবের দিওয়ান থেকে নেয়া যেতে পারে।

دیدار عشق سے نہیں ڈرتا، مگر اسد!

جس پہ ناز تھا مجھے، وہ دل نہیں رہا[২০]

(ভালোবাসা নিষ্ঠুরতায় ভয় পায় না আসদ

যে হৃদয়ে গর্ব ছিলো নেই শুধু আজ সেই হৃদয়।)

کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ

ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا[২১]

(অনুতাপেই নিষ্ঠুরতা বর্জনে সে শপথ নিলো

আমার বুকে মরণ শেলটা ঠিক তার আগেই ছুড়েছিলো।)

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতা সমূহ প্রেমের বর্ণনায় এমন ভাবেই সজ্জিত ছিলো যে, তৎকালীন উর্দু কাব্য জগতে প্রচলিত প্রেমের যত বর্ণনা ছিলো তার কোনটিই তার কবিতা থেকে বাদ পড়েনি। সেকালে প্রেমের বর্ণনা এমন ছিল যে, তা বর্ণনা করতে করতে দেহের সমস্ত রক্ত বিলিন হয়ে যেতো, দেহটা ক্ষয় হয়ে যেতো। এতটা ক্ষয় যে, আঙ্গুল দিয়ে রক্তস্রোত বইতো। প্রেম যন্ত্রনায় হৃদয়ে রক্তের সমুদ্র বয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি এ সকল বর্ণনা গালিবের গজলে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে গালিবের দেওয়ান থেকে দুটি পংতি তুলে ধরা হলঃ

تو دوست کسی کا بھی ستمگر نہ ہوا تھا

Dhaka University Institutional Repository

اور دل پہ وہ ظلم کہ مجھے پر نہ ہوا تھا[২২]

(নিজের বন্ধু সমব্যাথী হলে না, তো কারো ব্যাথায়

যে নির্যাতন সয়নি আমার অন্যেরা আজ সইছে সে দায়।)

دائیم الحبس اس میں ہیں لاکھوں تمنائیں اسدؔ

جانتے ہیں سینہ پر خوٗن کو زندان خانہ ہم[২৩]

(বন্দী হয়ে আছে, আসদ

বাসনার অসংখ্য জ্বালা

বুকটা আমার যাবজ্জীবন

রক্তক্ষয়ী বন্দী শালা।)

প্রেম সম্পর্কে গালিবের উপলব্ধি হলো এমন যে, প্রেম হলো মনের ব্যাপার। প্রেম মনের গভীর থেকেই আসে। এটি স্বেচ্ছায় আদান প্রদান হয়ে থাকে। প্রেম এমনি এক হৃদয় নিংড়ানো আবেগের নাম যা মনের আজানতেই সব কিছু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কোন দর কষাকষি চলেনা, চলেনা কোন প্রকার অর্থ ও শক্তির প্রভাব। প্রেমে চলেনা কোন চাপাচাপি, চলেনা কোন জোড়াজুরি। এমনি এক অভিজ্ঞতা ধরা পরেছে মির্যা গালিবের। নিম্ন বর্ণিত একটি কবিতায়।

عشق پر روز نہیں ہے یہ وہ آتش غالب

کہ لگائے نہ لگئے اور بجھائے نہ بنے[২৪]

(হে গালিব প্রেমের ক্ষেত্রে চলে না জোড়াজুরি এটি এমন এক আগুন

যেটি জ্বালালেও জ্বলেনা এবং নিভালেও নিভেনা।)

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিক বা প্রেমিকার রূপ বর্ণনায় উর্দু গজলের স্রষ্টারা সাধারণত স্বল্পবাক প্রাচীন পদাবলী সাহিত্যে যেমন, নায়িকার রূপ সৌন্দর্য্য বর্ণনায় পায়ের নখ থেকে মাথার কেশ অবধি, কাজল কালো আখি। তিল ফুল জিনি নাসা, বিম্বসম অধর, পীতোন্নত পায়েলধর, ত্রিবলী বন্ধন, নভী রোমাবলী ইস্তক প্রতিটি অক্ষর উপমাসহ বিশদ বর্ণনা করার প্রথা প্রচলিত ছিলো। উর্দু গজলে সচারাচর এমনটি দেখা যায় না, বড় জোর প্রেয়সীর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশের কিছুটা প্রশস্তি, অথবা সুডোল মুখমন্ডলের সাথে পূর্ণিমার চাঁদের তুলনা করা পর্যন্ত উর্দু কবিদের চৌহদ্দী। কিন্তু মির্যা গালিব ছিলেন সুন্দরের কবি। প্রিয়ার মাঝেই তিনি সৌন্দর্যকে খুজে পান। প্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা খুব জোড়ালো ভাবে ফুটে উঠেছে গালিবের কবিতায়। গালিবের কবিতায় পটলচেড়া চোখ, যাদুভরা চাহনি, মোহনীয় চলন-বলন, ঘনকালো কেশ কোন কিছুর বর্ণনাই বাদ যায়নি। এমনি একটি কবিতা গালিবের দিওয়ান থেকে নিম্নরূপ:-

نیند اس کی ہے دماغ اس کی راتیں اس کی ہے

تیری زلفیں جس کی بازوں پر پریشان ہو گئیں۔[২৫]

(ঘুমটি তার স্বপ্ন তার, এই রাত তারই, তার কেশের

সৌন্দর্য যার উপর পড়বে সে অস্থির হয়ে উঠবে।)

গালিবের উর্দু কবিতার একদিকে যেমন আছে প্রিয়ার সাথে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আছে বিরহের অসহনীয় যন্ত্রনা। প্রেমের যে রূপ কবির কাছে বিশেষভাবে ধরা পরেছে সে হচ্ছে "বিরহ"।

প্রেমিক হিসাবে গালিব মূলত বিরহী । মিলনের আনন্দের চেয়ে বিরহের জ্বালা ও বিচ্ছেদের বেদনাই কবি প্রকাশ করেছেন বিশেষভাবে। বিরহ কালীন অশ্রুকে রক্তের তুল্য মান দেওয়া হয়েছে গালিবের কবিতায়। গালিব মনে করেন হৃদয়ের রক্তই প্রকৃত পক্ষে প্রেমিকের অশ্রু হয়ে ঝরে, দীর্ঘকাল এ রক্ত-অশ্রু বর্ষণে প্রেমিকের দেহ রক্তহীন হয়ে যায়, বর্ণ হয়ে যায় পান্ডুর। বিরহ বা দু:খের তাপে অশ্রু অগ্নির মতো তপ্ত হয়ে উঠতে পারে, সে ক্ষেত্রে প্রেমিক অগ্নি বর্ষণ করেন।

এরূপ কয়েকটি কবিতা গালিবের দিওয়ান থেকে তুলে ধরা যাকঃ-

یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا

اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا[২৬]

(ছিলনা মোর ভাগ্যে প্রিয়ার সাথে মিলন

Dhaka University Institutional Repository

করব প্রতিক্ষা তারই জন্যে সারা জীবন।)

وہ فراق وہ وصال کہاں، وہ شب و روز

وہ ماہ و سال کہاں[২৭]

(কোথায় আমার সেই বিরহ, মিলন সুখের সেই পরশ,

সিই নিশিদিন কোথায় আমার

কোথায় সে মাস সেই বরষ?)

تھی وہ ایک شخص کے تصور سے

اب وہ رعنائی خیال کہاں[২৮]

(বিশেষ কারো রূপের ধ্যানে,

পেয়েছিলাম সরস মনে

কোথায় গেলো সে মন আমার

মনটা ভরা সেই হরষ?)

অতএব, উপরিউল্লিখিত উদাহরণ ও কবিতার মাধ্যমে এটিই প্রমানিত হলো যে, মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার প্রেম বৈচিত্র প্রতিটি চরণের কানায় কানায় ভরপুর। তার কবিতায় প্রেমের যে বর্ণনা রয়েছে তাতে, ব্যাথা, বেদনা, দিল, কলিজা, বুলবুল, গুল, গুলিস্তান প্রভৃতি শব্দ বারবার আসবে প্রতিটি গজলের চরণে চরণে, তেমনি আসবে গর্দান নেওয়া শির উড়িয়ে দেওয়া কতল, খঞ্জর, দশনা, তলোয়ার, জহর ইত্যাদি, তেমনি আসবে আশেক মাশুক, প্রিয়ার সাথে বিরহ মিলন, তেমনি আসবে খুন ও চোখের পানির মতো বৈচিত্র্যময় বিবরণ অগ্নি-অশ্রু, অহর্নিশ  খুন ঝরা, খুন ঝরে ঝরে রক্ত শূন্য দেহ, চোখ দিয়ে রক্ত খুন ঝরা, আর দিল ও জিগর তো সর্বদাই এক রক্তের সমুদ্র হয়ে রয়েছে পটভূমিতে।

উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি কবিতা দেওয়া হলোঃ

*Dhaka University Institutional Repository*

ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب

خون جگر ودیعت، مژگاں یار تھا[২৯]

(প্রতিটি ফোটার হিসাব দিতে হবে সে আমি জানি

হৃদয়ের রক্তক্ষরণ ,বন্ধুর চোখের অশ্রু)

মির্যা আসাদুল্লা খান গালিব সামগ্রিকভাবে তার কবিতার মধ্যে নতুনত্ব এবং বিরলতাকে যে ভাবে বর্ণনা করে নতুন এক দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। উর্দু কবিতাকে সব পুরানো প্রথার জাল থেকে বাহির করে নিজের মতো করে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে আলাদা একটি ভূবন সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনি ভাবে গালিব তার কাব্য সম্ভারকে প্রেমের ভূবনেও এক নতুন ও আলাদা চিত্র অংকন করেছেন। গালিবের উর্দু কবিতায় প্রেমের বর্ণনা সকল উর্দু কবিগণের চেয়ে ভিন্নধর্মী যা জীবনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় ব্যাপ্তি হয়েছে।

প্রথম দিকে গালিবের উর্দু কবিতায় প্রেমের কাহিনীগুলো শুধু মাত্র বর্ণনাধর্মী ছিলো। যা নির্দিষ্ট একটি নিয়মের মধ্যে থাকতো এবং উর্দু কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের আবর্তেই উপস্থিত থাকতো। কিন্তু যুগধর্ম পরিবর্তনের সাথে সাথে তার জীবনের বিভিন্ন স্থানে প্রেমের বিষয়াবলিতেও পবির্তন এসেছে। বর্ণনাধর্মী চিত্র তুলে ধরা ছাড়াও কখনো নারী পুরুষের দৈহিক সম্পর্কের কথা বর্ণনা হয়েছে, আবার কখনো উর্দু কবিতায় সুফীবাদ ও মারেফাতের কথাও বর্ণনা করেছেন। গালিব সবসময় আলাদা নিয়মে প্রেমের বর্ণনা পেশ করতেন, যা ছিলো ব্যতিক্রম ও বিরল। দুনিয়ার সকল প্রকার প্রেমের সাথে পরিচিত ছিলেন মির্যা গালিব। তার চিন্তা চেতনা থাকতো একাধিক বিষয়ের উপর, রং বেরংয়ের চিত্র ও রঙ্গিন বর্ণনা ছিলো তার গজলের প্রতিটি চরণে চরণে ভরপুর। [৩০]

যে কবিতা গুলোতে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের আবেগ অনুভূতি এবং জীবনের সকল বাস্তব দৃশ্য ও ঘটনাবলীর বিভিন্ন চিত্র তিনি অংকন করেছেন তাতেই তার বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মির্যা গালিবের কবিতায় প্রেমের প্রকৃত রূপ ও বৈচিত্র ধড়া পড়েছে। গালিবের অধিকাংশ প্রেমের কাব্যে দৈহিক আনন্দ ও আরামপ্রিয়তার কথা এবং প্রেমের আসল বর্ণনা ও চিত্র সিনেমার ছবির মতো দৃশ্যায়িত হয়। একথা সত্য যে, প্রেম ও সৌন্দের্য্যের আবেগ- অনুভতি, বাস্তব ঘটনা, বর্ণনার সঠিক রূপ যার মাধ্যমে মানুষের নফসের রঙিন চাহিদার যেরকম বাস্তব চিত্র মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় খুজে পাওয়া যায় এরকম উদাহরণ অন্য কারো কবিতায় সাধারণত পাওয়া যায় না। প্রিয়তমার সৌন্দর্য প্রেম বিনিময়, শরম-লজ্জা, খোলামেলা, গোপনিয়তা, দু:খ বিরহ, মিলনের বর্ণনা, আবেগের চুম্বন, আনন্দ উপভোগ, প্রেমিকের সত্য আকাঙ্খা, প্রেমের পাগলামি, প্রিয়াকে পাওয়ার ইচ্ছা, না পাওয়ার আফসোসা ও কান্না সব কিছুই গালিবের উর্দু কবিতায় সুন্দর ভাবে

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত হয়েছে। মোটকথা মানুষের স্বভাবজাত প্রেমের যত প্রকার চাহিদা ও আবেগ থাকে তার সবগুলীকেই গালিব সুচিন্তিত ভাবে তার কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন।

প্রেমিককে প্রেম করতে যে কঠিন বাধা অক্রিম করতে হয় এবং যে সকল অবস্থা ও ঘটনার মাধ্যমে প্রেম করতে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখিন হতে হয় এর সব বর্ণনা গালিব উত্তমরূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ প্রেম জগতের যত আলোচনা, বর্ণনা আছে তাকে জীবন্ত করে নতুন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করার একমাত্র যোগ্যতা মির্যা গালিবেরই ছিলো। আর এটাই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যের পরিচয়। [৩১]

মির্যা গালিবের প্রেমমূলক কাব্য সম্পর্কে তার কিছু বিশেষ চিন্তা-চেতনা বর্ণনা করছি।

মির্যা গালিব মনে করেন মজনু যেমন প্রেমিক পুরুষ পৃথিবীতে ছিলেন, তার মতো পূর্ণ প্রেমিক পুরুষ পৃথিবীতে আর একজনও আসেনি। তার কারণ হলো তার মতো এরকম সাহসী প্রেমিক মানব পরিচয় দিতে অন্য কেউ সক্ষম হতে পারেনি। বরং দুনিয়ার মানুষ শুধু তার প্রেমচিত্র দেখে হিংসা করে ছোট মনের পরিচয় দিয়েছে। এবং মজনুও চাননি তার চেয়ে বড় কোন প্রেমিক তার সামনের পথ দখল করুক। এ সম্পর্কে গালিবের একটি উর্দু কবিতা নিম্ন রূপঃ-

جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار

سحرا مگر یہ تنگی چشم حسود تھا [৩২]

(মজনুর মতো এমন কোন প্রেমিক আসেনি এ ধারায়

সাগর স্বরূপ এমন প্রেমিককে হিংসা করে ছোট মনের

পরিচয় দিয়েছে দুনিয়ার সবাই।)

মির্যা গালিব দুনিয়ার জীবনকে একটি কঠিন অসুখের সাথে তুলনা করেছেন। এবং প্রেমকে সেই অসুখের প্রতিশোধক মনে করেন তিনি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেম এমন জিনিস যা নিজেই ঔষধ বিহীন এক অসুখের নাম। এ প্রসঙ্গে গালিবের দেওয়ান থেকে দুটি কবিতা তুলে ধরছি।

عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا

درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا - [৩৩]

(প্রেমই জীবনের স্বাদ পেল আমার মন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যথার ঔষধ পেল, এমন ব্যথা  পেল যার ঔষধ নেই।)

মির্যা গালিবের মনে করেন,  'আহ' শব্দ বলার মধ্যে কোন ভালোর প্রভাব এবং 'ক্রন্দনের' মধ্যে কোন কষ্টের নৈপূন্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ আমার প্রাণপাখি প্রিয়তমার প্রিয় বন্ধু হয়ে গেছে। আর সেই বন্ধু আসলে আমার শত্রু, কারণ তার উপর একদম ভরসা করা যায় না। [৩৪]

এ কথাগুলী গালিবের কবিতায় নিপুনভাবে উপস্থিত যা নিম্নরূপঃ

دوست دارد دشمن ہے اعتماد دل معلوم

آہ بے اثر دیکھی، نالہ نارسا پایا۔ [৩৫]

(মন যাকে দোস্ত বলে সেতো দুশমন, ভরসা তার উপর নেই

'আহ' বলে কোন প্রভাব নেই, ক্রন্দনেও কোন ব্যাথাও কষ্ট নেই)

## সুফী দর্শন

মির্যা গালিব সর্বদাই নিজেকে একজন সুফী সাধক কবি হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন এবং তিনি তাসাউফ বা সুফী দর্শনের বিষয়বলীকে খুবই প্রাঞ্জল, সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে জন সম্মুখে উপস্থাপন করতেন। আর মানুষও তার আধ্যাত্মিক কথাবার্তা যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে উপভোগ করতেন সে মোতাবেক নিজের কর্ম সংশোধন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পরতেন এটাই ছিলো গালিবের সুফী দর্শনের মূল কথা।

মির্যা গালিবের সুফী তত্ত্বের মধ্যে সব চেয়ে বেশির ভাগ বিষয়বস্তু ছিলো মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ নিয়ে নিখুত তথ্য অনুসন্ধান, বিচার-বিশ্লেষণ করা। মির্যা গালিবের সুফী দর্শন মূলত ফাসলাফায়ে ওয়াহদাতুল ওজুদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার সার সংক্ষেপ হলো পৃথিবীর সমগ্র কায়েনাত বা সৃষ্টিকুলের মধ্যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার একক জাতিসত্ত্বা এমন  যে তা খুবই বিশ্বাস যোগ্য ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালাই হলেন প্রকৃত একক জাতী সত্ত্বা আর বাকী সব কিছু হলো ছায়ার মতো, যাদের কোন প্রকৃত সত্ত্বা বা আকার নেই। সমগ্র বিশ্বের সকল সুফীদের আকিদা বা বিশ্বাস হলো মহান আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা পোষণ করেন যে আমি আমার প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছবি বা ছায়া দেখবো ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর নূর বা আলোর ছোট্ট একটি টুকরা  থেকে সমগ্র সৃষ্টিকুলকে তার ছায়া বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ সৃষ্টি করেন। এবং সুফী সাধকগন মনে করেন সকল সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের নূর থেকে বানানো হয়েছে। আর তাই পরিশেষে সকল কিছু

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরই দিকে আকৃষ্ট হয়। মির্যা গালিব স্রষ্টা এবং সৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা বলে মনে করেন না। তাঁর মতে সত্ত্বা বলতে কেবল স্রষ্টাকেই বুঝায় যেহেতু তিনি অমর অক্ষয়। তিনি ছাড়া বাকী সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। মির্যা গালিব একক সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। [৩৬]

যা নিম্ন বর্ণিত গালিবের উর্দু কবিতায়ে বিদ্যমান।

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ [৩৭]

( হৃদয়ের প্রতিটি কণা বলে আমি সমুদ্র

আমিতো তারই অংশ, কে আমি তবে জিজ্ঞাসা কেন?)

স্রষ্টার সম্পর্কে গালিবের দৃষ্টিভঙ্গি হল, তিনি একক সত্ত্বা তাঁর কোন অংশীদার নেই। স্রষ্টার কোন ক্ষয় নেই। তিনি ছাড়া পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ স্রষ্টার মাঝে বিলিন হওয়ার মধ্যেই সৃষ্টির আনন্দ। এর মধ্যে সৃষ্টির অমরত্ব। গালিব একেশ্বরবাদী উর্দু কবি ছিলেন। তাঁর মতো সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সেই বিশ্বাসের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়েছে। মির্যা গালিব নিম্নে উর্দু কবিতায় বর্ণনা করেন ঃ-

ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں [৩৮]

( আমি একেশ্বরবাদী, সাম্প্রদায়িক রীতি বর্জনই আমার ধর্ম

এক সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটলে জ্বলে উঠবে বিশ্বব্যাপি ঈমানের প্রদীপ )

মির্যা গালিব বলেন আল্লাহর জন্য সকল সৃষ্টিজীব তাদের জীবন উৎসর্গ দিয়ে তাঁরই কাছে পুনরায় ফিরে যায়। এবং আল্লাহকে তাদের একমাত্র সহায়ক বলে মনে করেন। আল্লাহ পাক ছাড়া দুনিয়ার সবকিছু তাদের নিকট তুচ্ছ ও নগন্য বলে মনে হয়। [৩৯]

আর একথা গুলোই মহান কবি মির্যা গালিব তার নিম্নোক্ত কবিতাংশে অত্যন্ত সুনিপুন ভঙ্গিতে আবিষ্কৃত করেছেন।

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا میں تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا [৪০]

. (পৃথিবীতে যখন কোন কিছু ছিলনা সে মুহুর্তে মহান আল্লাহ ছিলেন

*Dhaka University Institutional Repository*

যখন আমরা কেউ ছিলাম না তখন খোদা বিদ্যমান ছিলেন।
আল্লাহ যদি আমাকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে আমি কী হতাম।)

আলোচ্য কবিতাংশ এটাই প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা একক সত্ত্বা। তিনি একক, তিনি হাকীকী, তিনি ছাড়া আর বাকী সবাই তারই বানানো প্রতিবিম্ব ও ছায়া মাত্র। তিনি আমাদের সৃষ্টি না করলে আমরা কিছুই হতে পারতাম না। এমন কি আমরা কোন খড়কুটাও হতে পারতাম না। তিনিই (আল্লাহ) আমাদের অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে দুনিয়াতে সৃজন করেছেন।
মহান কবি মির্যা গালিব অন্য আর একটি শে'র এর মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে সৃষ্টির নিগুঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। আর তা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সমগ্র সৃষ্টিকূল এর কোন আস্তিত্বই হতো না এবং আমরা কেউ পয়দাই হতাম না, যদি মহান আল্লাহ তায়লার দুনিয়ার আয়নাতে নিজের জ্যোতি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ না করতেন।

মির্যা গালিব বলেনঃ-

دہر جز جلوۂ یکتائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود میں؟[৪১]

(মহান আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার কোন দ্যুতির অংশ
সৃষ্টি করার আকাংক্ষার লেশ মাত্র নেই।
আমরা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকতাম
যদি তিনি আমাদেরকে আয়নায় না চাইতেন?)

সূফীদের আকীদা বা বিশ্বাস হলো মহান প্রভূর নূর বা আলোর এক অংশ বিশেষ পরিবেশে আলোর সাথে মিশিয়ে তাঁর (আল্লাহর) এক নিপুন অবয়ব বা আকৃতি ধারণ করে মানুষের মাঝে সুগভীর ভাবে মিশে যায়। কবি নিপুনতার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তার নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে-

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

اور قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے[৪২]

(প্রেম রসের প্রতিটি ফোটা তার প্রেমিকার মাঝে এমন ভাবে মিলিত হয়

যেমন ভাবে বৃষ্টির প্রতিটি ফোটা সমুদ্রের মাঝে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আর প্রেমরসের কাতরা এমন যে তা যখন একসাথে মিলিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় যেমন সেটি একটি মহাসাগর।)

এ কবিতায় ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা যায়, প্রেমিকের প্রেম ভালোবাসা এমন হয় যে প্রেমিক প্রতিটি শ্বাস ও নিঃশ্বাসে শুধুই তার প্রিয়তমার নাম জপতে থাকে এবং জপতে জপতে এমন হয় যে, তখন প্রেমিক তার প্রেমিকা ছাড়া আর কিছুই বুঝেনা এবং বুঝতে রাজি হয় না। প্রেমিক তার পুরো জীবনটা কেবলমাত্র তার প্রিয়তমা বা প্রেমিকের জন্য উৎসর্গ করে দেন এবং একদম প্রিয়ার জন্য ফানা হয়ে যান এবং প্রিয়ার জন্য সর্বদা চোখের অশ্রু টপকাতে থাকেন, এমনভাবে যে সকল অশ্রু একত্র হলে এক মহাসাগরে রূপ নিবে।

প্রখ্যাত সুফী সাধক ও আল্লাহ প্রেমে আসক্ত মনসুর বিন হাল্লাজ এমন আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন যিনি সর্বদা আল্লাহ প্রেমে মগ্ন হতে হতে একসময় তিনি তার স্বীয় সত্ত্বাকে চিনতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ মনসুর বিন হাল্লাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি (মনসুর হাল্লাজ) মহান আল্লাহ তায়লার নূরের একটি অংশবিশেষ। কারণ মহান আল্লাহ তায়লা নূর বা আলো থেকেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি নিজে নিজেকে চিনতে পারার কারণে তিনি নিজের সম্মান বুঝতে পারেন। তাঁর নিকট তাঁর সত্ত্বার কোন কিছু লুকায়িত ছিলো না। আর এই গোপন ও লুকায়িত রহস্যই তার মুখে সর্ব শেষে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে (আনাল হক-আনাল হক) (আমিই সত্য বা আমিই আল্লাহ, আমিই আল্লাহ) যার পরিণতি হিসাবে মনসুর হাল্লাজকে ফাসির কাষ্ঠেও ঝুলতে হয়েছিল। মনসুর বিন হাল্লাজের এরূপ সুফীয়ানা জিন্দেগী ও আল্লাহ প্রেমকে মির্যা গালিব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তিনি মনসূর বিন হাল্লাাজকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন । মির্যা গালিব বলেন, আমরা হলাম আল্লাহ প্রেমের পাগল মহাসাগর মনসুর বিন হাল্লাজের একটি বিন্দু বা ফোটা মাত্র। আমরা কখনো মনসুর বিন হাল্লাজের মতো সুফী সাধক হতে পারবো না। তিনি হলেন আল্লাহ প্রেমের এক মহাসাগর আর আমরা হলাম সে সাগরের পানির একটি ফোটার ন্যায়। [৪৩]

তাসাউফ বা সুফীদর্শন সম্পর্কে মির্যা গালিবের কয়েকটি কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے

حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں کام[৪৪]

(প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনা করার স্থান,

সাধক ও সাধিত বস্তু সবই একই জিনিস

আমরাতো চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমুঢ়

এর পর মুশাহেদা করার হিসাব নিকাশ কোথায়।)

*Dhaka University Institutional Repository*

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ [৪৫]

হৃদয়ের প্রতিটি কণা বলে আমি সমুদ্র

আমিতো তারই অংশ, কে আমি তবে জিজ্ঞাসা কেন?

সুফী সাধকগণ বলেন, আমরা এ পর্যায়ে এখানে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করতে চাই যে, ফালসাফায়ে ওয়াহদাতুল ওজুদ বা মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণার জন্মস্থান কোথায়। সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিশর এবং ফিলিস্তানের মুসলমান পণ্ডিতগণের চিন্তাচেতনা একই রকম।

পণ্ডিতগণ পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং এর হাকিকতকে একটি গৃহের সাথে উপমা দিয়ে বিষদভাবে বুঝানোর জোড় চেষ্টা করেছেন, যা **"তামসিল নেগার"** নামে প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ বলেন, মনে কর আমি হাত পা বাধা একটি লোহার খাচার মধ্যে আবদ্ধ, এমতাবস্থায় কোন গহীন অন্ধকার গর্তের মধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করা হলো, আমার পৃষ্ঠ গহীন গুহার গর্তের মধ্যে এমন ভাবে আটকানো যে, আমার ডান বাম, সামনে-পিছনে কোনদিকেই কিছু দেখতে পারছি না এবং এ অবস্থাতেই আমার পিছনের দিকে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হলো। আমি এপাশ ওপাশ করতে ছিলাম, তখন আমার সামনে কোন ছায়া পরিলক্ষিত হলো। পৃথিবীর অস্তিত্ব বিধান ঠিক এমন ছায়ার মতই এটা এক প্রকার শুধু চোখের ধোঁয়া স্বরূপ। [৪৬]

আর মুসলিম সুফী সাধকগণ ইহার মধ্যেই আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদ ও অস্তিত্বের একটি ঝলক দেখতে পান। অর্থাৎ পৃথিবীর এই অস্তিত্বই প্রমাণ করে আল্লাহ তায়ালাই একক ভাবে এর রূপ দাতা। আর পান্ডিতগণ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা মেনে নিলেন যে এই ছায়াটাই হলো আল্লাহ পাকের "ওয়াহদাতুল ওজুদ" বা একত্ববাদ এর প্রমাণ। মহান সাধক জুন্নুন মিসরী এই তথ্য ও প্রমাণের উপর সর্ব প্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন।

মহান আধ্যাতিক সুফী ও সাধক জুন্নুন মিসরীর আকিদা বা বিশ্বাস হলো যখন একজন মানুষের হৃদয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রেম ও ভালোবাসা খুব প্রবল ও গভির ভাবে সর্বশেষ **পর্যায়ে** চলে যায়, বান্দার তখন আর ব্যক্তিগত কোন চিন্তা চেতনা বা ভাবনা থাকে না। মানুষ তখন মহান খোদাপাকের জাতি সত্ত্বার সাথে মিলে একাকার হয়ে যায়। সুফী দর্শনের পরিভাষায় এটাকেই ফানাফিল্লাহ বলা হয়।

*Dhaka University Institutional Repository*

মহান আল্লাহ পাকের একজন ওলী পীরে কামেল ও মহান সাধকদের মধ্যে অন্যতম হযরত বায়জিদ বোস্তামীও এমন নীতিরই সুফী ছিলেন। একদা বায়জিদ বোস্তামী খোদা পাকের দরবারে দোওয়া করলেন হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে যেতে চাই তুমি আমাকে এমন একটি রাস্তা দেখিয়ে দাও যে রাস্তা দিয়ে আমি তোমার নিকট পৌছতে পারি। তার দোয়ার উত্তর এসে পৌছালো হে বায়জিদ প্রথমে তুমি নিজে নিজেকে তুচ্ছ মনে কর। তারএর পর তুমি আমার নাম নিতে থাক।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে পেতে হলে সর্ব প্রথম নিজের সকল চাওয়া পাওয়া দুনিয়াদারির চিন্তা চেতনা সব কিছুকে ভুলে যেতে হবে। শুধু এক আল্লাহ পাকের নাম জপতে হবে। দুনিয়ার সমস্ত কর্মতৎপরতা থেকে অবসর হয়ে কেবল আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতে নিমগ্ন হতে হাবে। মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য একদম ফানা ফিল্লাহ হতে হবে তাহলেই মহান আল্লাহকে পাওয়া যাবে। এটিই হলো সুফী দর্শনের মূলমন্ত্র। [৪৭]

মির্যা গালিবও এমনি এক মহান সূফী সাধক কবি ছিলেন। মির্যা গালিব বলেন দুনিয়াটা শুধুই একটি "আফসানা" বা ছোট গল্পের মত। যা নিরথর্ক যা শুধু অবাস্তবতায় পরিপূর্ণ। মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তু বা সম্মানই এ দুনিয়াতে পায়না এখানে শুধু আফসোস আর আফসোস। পরিপূর্ন শান্তিময় ও চাওয়া পাওয়ার মত জীবন পেতে হলে আমাদেরকে ফানা ফিল্লাহ হতে হবে। মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের দর্শনটির বিশ্বাস মহান কবি মির্যা গালিবের প্রতিটি শিরা উপশিরায় পরিপূর্ণ ছিলো। তিনি দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কারবারকে দূরে নিক্ষিপ্ত করে মহান প্রভূর সন্নিধ্যে পৌছার চেষ্টা করার কারণেই প্রতিদান স্বরূপ গ্রহণ করতে থাকেন হতাশা, দুশ্চিন্তা, লাঞ্ছনা, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি। মির্যা গালিব মানব জীবনের এ হতাশা, দুঃখ-দুর্দশার কথা গুলী খুবই কষ্টের সাথে তার নিম্নোক্ত কবিতাংশে তুলে ধরেছেনঃ-

مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر

کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کیلئے۔ [৪৮]

আমার জীবনের সকল চেষ্টা তদবির সবই বন্দী পাখির মতো

যে পাখি সুগন্ধী গাছের শিকড় তার পিঞ্জিরার মধ্যে গচ্ছিত রাখে শুধু

পাখির ঘর ও জানালা তৈরি করার জন্য।

মির্যা গালিব বলেন যে পাখিটি খাচার মধ্যে বন্দী আছে সে যদি বাসা বানানোর জন্য খড়কুটা গচ্ছিত করতে থাকে তার মতো আহম্মক কী আর কেহ হয়। মির্যা গালিব এর কবিতাটি হতাশায় ভরপূর। তিনি তার জীবন সংগ্রামের জন্য সর্বদাই আল্লাহ তায়ালার

Dhaka University Institutional Repository

দরবারে অভিযোগ ও নালিশ করেছেন। যা তার নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে সুনিপুনভাবে বিদ্যমান।

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا[৪৯]

ছবি ফরিয়াদ করছে কার সৃষ্টির শোভা দেখে

সব ছবির শরীরেই তো কাগজের পোশাক

একই উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে আরো কিছু উর্দু কবিতা গালিবের দেওয়ান তেকে নিম্নরূপঃ

کروں میں ہے رخش عمر کہاں دیکھے تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں[৫০]

(আমি জীবন সংগ্রামের ঘোড়া দ্রুত চলতে দেখেছি

হাতে লাগাম ধরে রাখতে পারলেও পায়ে রেকাব রাখতে পারে নি।)

تھا زندگی میں مرگ کا کٹکا لگا ہوا

اڑنے پیشتر بھی مرا رنگ زرد تھا[৫১]

( নীড়ের খুবই কাছ ছিলো ধরা পড়ার ফাঁদটি পাতা

উড়াল দিতে না দিতেই বান্দী হলাম হায় বিধাতা)

پنہاں تھا دام سخت قریب آشیاں نے کے

اڑنے پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے[৫২]

*Dhaka University Institutional Repository*

(জীবনটাই হলো আকস্মিক মৃত্যু ভয়ে ভরা

জীবন আকাশে উড়ার আগেই জীবন আমার বন্দী হলো।)

প্রথম কবিতাংশে- মির্যা গালিব এক জন বিচার প্রার্থীর অভিযোগ ও হতাশার কথা বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো প্রাচীনকালে ইরানে ফরিয়াদ জানাবার এক অভিনব রীতি ছিল। এই রীতি মেনেই অভিযোগকারীকে তার ফরিয়াদ উপস্থাপন করতে হতো। রীতিটি চিল এই যে, ফরিয়াদি বড়ো কাগজে নিজের অভিযোগ লিখে পোস্টারের মতো গায়ে সাঁটিয়ে বিচারালয়ে আসতেন। তারপর তার অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার কাজ শুরু হতো।

দ্বিতীয় কবিতাংশে- রুস্তম নামে একজন সৌখিন ঘোড় সওয়ার ছিলো। তার ঘোড়াটি ও খুব সুন্দর ছিল, যাকে উর্দুতে 'রুখ্শ' বলা হতো। তার ঘোড়াটি ছিল লাল সাদা রঙ্গের ঘোড়াটিকে সে অনেক সখ করে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং অতি আদর যত্নে লালন করেছিলেন, কিন্তু ঘোড়াটি এতোই তেঁজি ছিল যে, রুস্তম তাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। ঠিক মানুষের জীবনটাও এমনি নিয়ন্ত্রনহীন। এ রকম জীবনের কারণেই শেষ জীবনে তাকে আফছুছ করতে হয়। মির্যা গালিব এ কথাটি আলোচ্য কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় কবিতাংশে- পাখির মনের দু:খ ও অভিযোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষিকুল তারা প্রতি দিনের নিয়মানুসারে খাবারের খোজে খুব সকালেই নীড় হতে বের হয় এবং পেটপুরে খাবার খেয়ে নীড়ে ফিরে আসে। কিন্তু নির্দয় শিকারিরা পাখির নীড়ের কাছে ফাঁদ পেতে রাখে, যার কারণে পাখিরা খাবার খোজার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সাথে সাথেই শিকারির খাঁচায় বন্দি হয়ে যায়। পাখিরা তাই অভিযোগ করেছে প্রকৃতি এমন নিষ্ঠুর কেন ? মির্যা গালিব তার কবিতায় এ কথাটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ কবিতায় মির্যা গালিব মানুষ, পশু পাখি ও অন্যন্য সৃষ্টি জীবের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। গালিব বলেন পাখিরা যেমন মহুর্তের মধ্যে শিকারির খাঁচায় ও জালে বন্দি হয়ে যায় ঠিক মানুষের জীবনও তাই, মৃত্যুর পাখি নামক আজরাইল যে কোন সময় মানুষকে তার খাচায় বন্দি করতে পারেন। অতএব বুঝা গেল উড়ন্ত পাখির ন্যায় মানুষের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। বিধাতার নিয়ম এমন কেন ? এসব অভিযোগ মির্যা গালিব সর্বদাই খোদার দরবারে তুলে ধরতেন।

মির্যা গালিব তাসাউফের প্রতি এতোই নিমগ্ন ছিলেন যে, কোথাও কোথাও তিনি তার কবিতার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি দুনিয়ার প্রতি বিরক্তির কারণে এমন কোন জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চান যেখানে বনী আদমের কোন চিহ্ন ও নিদর্শন খুজে পাওয়া যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

رہے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو[৫৩]

(আমি এমন জায়গায় গিয়ে বসবাস করতে চাই যেখানে কোন মানুষ থাকবে না।

যেখানে একইভাষি কোন মানুষও থাকবে না ও জীব জন্তুও থাকবে না।)

بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے

کوئی ہمسائہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو[৫৪]

(দরজা জানালা ছাড়া এমন এক ঘর বানাতে চাই

যেখানে কোন প্রতিবেশীও থাকবে না, কোন পাহারাদার ও থাকবে না।)

پڑے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار

اور اگر مر جائے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو[৫৫]

(অসুখ হয়ে পড়ে থাকলেও কোন সেবিকা থাকবে না।

যদি মরে যাই তাহলে ও কোন বিলাপ করার কেউ থাকবে না।)

মহান কবি মির্যা গালিব তার বন্ধুদের হাতেও অনেক দু:খ কষ্ট ও জ্বালাতনের শিকার হয়েছেন, সে জন্য গালিব অনেক অভিযোগও করেছেন। মানুষ মির্যা গালিবকে এতোই যন্ত্রনা দিয়েছে যে, মানুষের কোন চেহারা দেখলেই তিনি ভয় পান। মির্যা গালিব বলেন আমি আয়নাতে নিজের চেহারা দেখতেও ভয় পাই। কারণ আয়নাতে আমি আমার চেহারা দেখা মাত্রই আমার কাছে মানুষের কথা মনে পরে যায়। যে মানুষেরা আমাকে শুধু কষ্ট দেয়।

پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسد

Dhaka University Institutional Repository

ڈرتا ہوں آئنے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔[৫৬]

(জলাতাঙ্ক রোগী যেমন পানি দেখে ভয় পায়

গালিব তেমনি দুস্কৃত মানুষ দেখে ভয় পায়।)

বন্ধুরা কষ্ট দিয়েছে সারা পৃথিবী গালিবকে যন্ত্রনা দিয়েছে দু:খ-গ্লানি, বিপদ-আপদ গালিবের প্রতি রগে রগে পৌছে গিয়েছিলো। মোটকথা মির্যা গালিবের সর্ম্পূণ জীবনটাই দু:খ আর দুর্দশায় মধ্যে কেটে গেছে । কিন্তু এ দুঃখ ও দুর্দশা গালিবকে পরাস্ত করতে পারে নাই এবং মির্যা গালিব কষ্টের কারণে কখনো পিছপাও হননি। তিনি সব দু:খ ও যন্ত্রনাকে হাঁসিমুখে বরণ করে নিয়েছেন। দুনিয়ার এতো দু:খ ও যাতনাই এই মহান কবিকে তাসউফের স্বর্ণ শিখরে পৌছিয়ে দিয়েছে। উর্দু কবিদের উপর যত প্রকার দু:খ ও দুর্দশা এসেছে তার একটি কারণ হলো তাসউফের প্রতি আসক্তি। কিন্তু এই তাসাউফই মির্যা গালিবকে বিখ্যাত করেছে। কারণ গালিব কোন হতাশা ও দু:খ দুর্দশাকে পাওাই দেননি। তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন সকল ক্ষেত্রে দু:খ কষ্টকে হাসি মুখে সহ্য করতেন। এ সম্পর্কে মির্যা গালিবের একটি চমৎকার কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس

برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم[৫৭]

(মুক্ত চিন্তার মানুষ দুনিয়ার সামান্য কষ্টকে কষ্টই মনে করে না

বিজলির আলোতেই আমরা বিলাপের ঘরকে আলোকিত করি।)

তাসাউফ এর ব্যাপারে গালিবের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, দুনিয়ার কর্মকাণ্ড নিয়ে তথ্য উপাত্ত উৎঘাটন করা, চিন্তা ফিকির করা তার অভ্যাস, আল্লাহ তায়ালা একত্ববাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কিন্তু তাও অনেক চিন্তা ভাবনা করে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলাম আল্লাহ তায়ালা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই নাই, যেহেতু কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই তাহলে চারপাশে আজ এতো অস্থিরতা কিসের।

গালিবের মনের সব কথা গুলো নিখুত ভাবে ফুটে উঠেছে তার নিম্নোক্ত **কবিতাগুলীতেঃ-**

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود

پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

(পৃথিবীতে যখন তুমি ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান নেই

তাহলে এর পরেও এতো অস্থিরতা কিসের হে খোদা!)

یہ پری چہرہ ولوگ کیسے ہیں

غمزہ وعشوہ وادا کیا ہے؟[৫৯]

(এতো সুন্দর আকৃতির মানুষ সবই ধোকা

ইশারা ইঙ্গিত করা মাত্র এতো সুন্দর কোঁকড়া চুলই বা কেন)

شکن زلف عنبریں کیوں ہے

نگہ چشم سرمہ سا کیا ہے

سبزہ وگل کہاں سے آئے ہیں

ابر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے؟[৬০]

(কেনই বা চোখে এতো সুন্দর করে সুরমা লাগানো।

সবুজ শ্যামল বাগ-বাগিচাই বা কোথা থেকে এলো

অন্ধকার বা কি আর হাওয়াই বা কি জিনিস।)

কবিতাংশের ব্যাখা হলো গালিবের সুফী দর্শন হলো সারা পৃথিবীতে শুধু এক আল্লাহ তায়লাই বিরাজমান। আল্লাহ ছাড়া বাকী সবই নিরর্থক ও নিষ্ফল। দুনিয়ার সব কিছুর মূলে রয়েছেন একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালা। আর ইহাই হলো সুফী দর্শনের মূল মিশন।

## দর্শন

মির্জা গালিব হলেন একজন স্বার্থক দার্শনিক কবি। গালিব আল্লামা ইকবাল ও জার্মানি কবি গ্যাটের মতো দার্শনিক কবি না হলেও তিনি মানুষের জীবন বৈচিত্র্য, মানুষের শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে অনেক ভাবতেন। শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কঠিন হস্তে কলম ধরেছেন। মির্জা গালিব তার উর্দু গযলসমূহকে দার্শনিক

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ব দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন। গালিবের পূর্বেকার সকল কবির কাব্য চর্চায় তাসাউফ সংক্রান্ত গযলের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও তাদের গজলের মধ্যে দার্শনিক কোন রূপ বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয় নি। কিন্তু গালিব তার চিন্তাশক্তিকে গযলের ধাঁচে রূপ দিয়ে খুবই চমৎকারভাবে সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। মির্জা গালিবের দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই উর্দু গযলের জন্য একটি নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এ কারণে মির্জা গালিবকে উর্দু কাব্য জগতের সর্বপ্রথম দার্শনিক কবি বলা হয়। বেদিল, আল্লামা ইকবাল দার্শনিক কবি হলেও তাঁরা তাদের কবিতাসমূহকে প্রচলিত নিয়মনীতি অনুসরণ করে দার্শনিক রূপ দিয়েছিলেন। কিন্তু মির্জা গালিব এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমী স্বতন্ত্র দার্শনিক ব্যক্তি সত্ত্বার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দর্শনের নিগুঢ়, সুক্ষ্ম ও খুটিনাটি বিষয়গুলিকে তাঁর কবিতার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে ফটিযে তুলেছেন। আর এর মূল কারণ হলো মহান আল্লাহ তায়ালা মির্জা গালিবকে দর্শন সংযুক্ত মন ও মস্তিস্ক উপহার দিয়েছিলেন।

মির্জা গালিব কেবল মাত্র জীবনমুখী কবিই ছিলেন না বরং তিনি জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের উপর একজন সমালোচনাকারী কবিও বটে। আর এ রকম সমালোচক কবি মনস্ক হওয়ার কারণেই মির্জা গালিবের গযল ও কবিতাসমূহ এতো দার্শনিক রূপ ও বৈচিত্র্য লাভে ধন্য হয়েছে। [৬১]

ফালসাফা বা দর্শন হলো- প্রকৃতির সকল বিষয়াদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও জ্ঞান অনুসন্ধান করা। দর্শন শাস্ত্রে তাকেই বলা যেতে পারে যাতে প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ও সহজ সরল এবং স্বভাবজাত বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মানব জীবনের প্রতিটি সত্য ঘটনাপ্রবাহ, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও জীবনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পর্কে যে শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে ফালাসাফাহ বা দর্শন বলে। [৬২]

গালিব দার্শনিক কবি ছিলেন, তবে তিনি দান্তে, গ্যাটে ও ইকবালের মতো প্রচলিত নিয়মের অনুসারি ছিলেন না। বিধিবদ্ধ কোন চিন্তাধারা তাঁকে দখল করে রাখতে পারেনি। তা সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁর কবিতা দর্শনের সর্বোচ্চ পর্যায় পৌছায় এবং মানুষকে গভীর চিন্তায় আমন্ত্রণ জানায়। রহস্যময় মানবজীবন সম্পর্কে গালিবের গভীর পর্যবেক্ষণ। মানুষকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে সৃষ্টিগতভাবে আদমের সন্তান হিসাবে সকলেই আদমী কিন্তু যাদের মধ্যে ইনসানিয়াত বা মানবীয় গুণাবলী আছে তারা ইনসান (মানুষ)। সকলেই আদমী বটে। কিন্তু সকলেই ইনসান নয়। ইনসান হওয়া সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, তার প্রয়োজন ব্যাপক চেষ্টা। [৬৩]

কবির ভাষায়-

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا

آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

সকল কাজ সহজে করা কষ্টসাধ্য যেমন

আদমীর জন্য সহজে ইনসান হওয়াও তেমন।

জনাব 'মজনু গোর খুপুরি' বলেন-

" جناب مجنوں گورگھپوری نے فرماتے ہیں : غالب اردو کا پہلا مفکر شاعر ہے ۔ کہ غالب کی شاعری میں دل اور دماغ دونوں آسودگی سامان موجود ہے۔[৬৫]

(মির্যা গালিব হলেন উর্দু কাব্যের প্রথম স্বার্থক চিন্তাশীল কবি। এবং মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার মধ্যে মন ও মস্তিস্ক দুইটি জিনিসেরই সুদূর প্রসারী চিন্তা-চেতনা বা দর্শন বিদ্যমান।)

প্রফেসর আল-আহম্মদ সরুর বলেন-

۔پروفیسر آل احمد سرور فرماتے ہیں کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔غالب نے اسے ذہن دیا۔[৬৬]

কবিতা দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার কবিতার মধ্যে এমন দর্শন থাকে যাতে কেবল মাত্র মনের প্রশান্তি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার কবিতা হলো এমন যার মধ্যে মনের চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের সাথে সাথে মনকে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রথম প্রকার কাব্য জগতকে ভালো কাব্য বা (Good Poetry) এবং দ্বিতীয় কাব্য জগতকে মহান কাব্য বা (Great Poetry) বলে নাম দেওয়া যেতে পারে।

একথাটি খুব ভালোভাবে সবারই বোধগম্য হওয়া উচিত যে, মির্জা গালিবের কাব্যের মধ্যে চিরাচরিত কোন ফিকির বা গদ্‌বাধা কোন প্রথাগত দর্শনের স্থান পাওয়া যায় না। সকল বিষয়ের ভাল-মন্দ দিক বিশ্লেষণ করে তার নিগুঢ় তথ্য অনুসন্ধান করাই মির্যা গালিবের স্বভাব ও অভ্যাস। আর এ কারণেই তাঁর কাব্যে সীমাহীন প্রশ্ন বা অভিযোগ চোখে পড়ে।

মির্যা গালিব বলেন-

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے

آخر اس درد کا دوا کیا ہے-[৬৭]

(অবুঝ মন জানেনা হে গালিব তোমার কি অসুখ হয়েছে।

আর এ অসুখের ঔষধ-ই বা শেষ পর্যন্ত কি আছে?)

Dhaka University Institutional Repository

زندگی اپنی جب اس شکل سے گذری غالب

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے[৬৮]

(এমন ভাবেই হায়রে গালিব, কেটে গেছে আমার জীবন

এই বুকেও খোদা আছেন ভাবার সময় পেলইনা মন)

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی

زندگی میں مرا بھلا نہ ہوا[৬৯]

( নমরূদ এতো পাপিষ্ট হওয়ার পরও

খোদা তাকে ঐশ্বর্য্য দিয়েছিলেন,

আর আমি খোদা তায়ালার দাসত্ব করেও

ভালো অবস্থায় দিন যাপন করতে পারলাম না।)

আলাচ্য কবিতায় মির্যা গালিব যে সকল হতাশার বাণী তুলে ধরেছেন তা কোন চিরাচরিত বা প্রথাগত কোন দার্শনিক চিন্তাধারা নয়। বরং এ ধরণের দার্শনিক বিন্যাসগুলি মির্যা গালিবের আল্লাহ প্রদত্ত একক ও স্বতন্ত্র দর্শন। কবিতায় মির্জা গালিব তার জীবনের হতাশা ও দূর্ভোগের যে চিত্রগুলি বর্ণনা করে মহান আল্লাহ পাকের কাছে অভিযোগ উপস্থাপন করেছেন এর সবই তাঁর এক ব্যতিক্রমী নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও দার্শনিক রূপ ও বৈচিত্র্য।

মির্যা গালিব এ নানাবিদ দার্শনিক কথাগুলো খুবই সুন্দরভাবে তাঁর কবিতার মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

গালিব বলেন-

سنبھلنے دے ذرا اے نا امیدی کیا قیامت ہے

کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے

Dhaka University Institutional Repository

غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس

برق کے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ۔[৭০]

(একটু খানি সামলাতে দাও, হে হতাশা, এ কী প্রলয়,

বন্ধু-ধ্যানের আঁচল প্রান্ত তা-ও কি মুঠোয় থাকার-ই নয়।

মুক্ত চিন্তার মানুষ দুনিয়ার সামান্য কষ্টকে কষ্টই মনে করে না

বিজলির আলোতেই আমরা বিলাপের ঘরকে আলোকিত করি।)

মির্জা গালিব প্রথম পংতিটিতে জীবনের দুঃখ দূর্দশা ও হতাশাকে সম্বোধন করে বলেন আমি আর কত যাতনা ও গ্লানি সইব। আমার যাতনা একটু কমিয়ে দাও। একথা দ্বারা মির্যা গালিব মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই মূলত অভিযোগ করেছেন। গালিব বলেন হে খোদা আমি জানি আমার এ দুঃখ বেদনা কিয়ামত পর্যন্ত সইতে হবে এবং জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে আমার কোন সাথী বা সাহায্যকারীও থাকবে না তাতে আমার কোন ভয় নেই। ক্ষণিকের জন্য আমার কষ্টের একটু বিরতি চাই।

গালিব দ্বিতীয় পংক্তিতে বলেন গালিব সর্বদাই স্বাধীন জীবন নিয়ে দুনিয়া অতিক্রম করেছে। আর যারা স্বাধীনচেতা থাকতে ভালোবাসেন তাদের কাছে সামান্য দুঃখ কষ্ট কোন ব্যাপার নয়। যারা বিজলির কিঞ্চিৎ আলো থেকেই বিলাপের অন্ধকার বাড়ীকে আলোকিত করতে পাওে আমি তাদের মতো অর্থাৎ হাজারো শোক গাথার মধ্যে যারা জীবন প্রদীপকে প্রজ্জলিত রাখতে পারে । এ রকম দার্শনিক কথাগুলো বর্ণনা করাই মির্যা গালিবের কবিতার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রসিদ্ধ উর্দু কবি মীরের ন্যায় গালিবও দুঃখ কষ্টের মধ্যেই দিনাতিপাত করেছিলেন। সেজন্যেই উভয়ের কাব্যই দুঃখ ও ব্যাথাপূর্ণ। তবে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মীরের কাব্য যেমন হৃদয়কে মুহ্যমান ও হতাশ করে দেয়, গালিবের কাব্য সেইরূপ নয়। এটি রসমাধুর্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে প্রকাশ লাভ করেছে। মির্যা গালিব উর্দু ভাষা সাহিত্যের অনেক বড় মাপের একজন দার্শনিক কবি। তার অধিকাংশ উর্দু কবিতাসমূহ প্রকৃত দর্শনকে খুব সহজে প্রকাশ করে দেয়। বস্তুতঃ গালিবের চরিত্রের প্রধান মাধুর্য এটাই ছিল যে হাজারো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি কখনো বিচলিত হয়ে পড়তেন না। সকল অবস্থাকেই তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে ও লীলাচ্ছলে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতেন।

এই বিষয়টি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের ন্যায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج

Dhaka University Institutional Repository

مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔[৭১]

(দুঃখ জর্জরিত মানুষের থাকে না কোন দুঃখ-কষ্ট

আমি এতটাই নিমজ্জিত ছিলাম যে, তা এখন সয়ে গেছে।)

মির্যা গালিব উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের অনেক বড় মাপের একজন দার্শনিক কবি। তাঁর অধিকাংশ উর্দু কবিতা প্রকৃত দর্শনকে খুব সহজে প্রকাশ করে দেয়। মির্যা গালিব বলেন, জীবন হলো "রোদের ছায়ার মতো"। গালিব তাঁর মস্তিস্কের সকল দরজা সর্বক্ষণ খোলা রাখতেন। এবং জীবনটাকে তিনি সব সময় খালি চোখে দেখতেন আর কখনই জীবনের কোন ব্যাপার নিয়ে ভাবতেন সেগুলিকে তিনি সাথে সাথে কবিতায় রূপ দান করতেন।

গালিবের চিন্তাশীল ধ্যান-ধারণা, আবেগ অনুভূতিপূর্ণ কথাবার্তা, বিশ্ব ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকূল এর উপর বিশ্লেষণধর্মী কবিতাসমূহের উপর মতামত প্রদান করতে গিয়ে প্রফেসর খাজা আহমাদ ফারুকী বলেন-

غالب سے پہلے اردو شاعری کے پاس جذبات تھی ، احساسات تھے ، زبان و بیان کے کرشمے تھے ۔ لیکن وہ حسین اورشوخ ذہانت نہیں تھی ۔ جو پیکر الفاظ میں روح پھونک دیتی ہے ۔ یہ مرزا غالب کا عطیہ ہے ۔ اور اس اردو جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ انہوں نے ہمیں نئے نئے خیالات دیے ۔ ان کے اندر کرنے کا ایک نیک اسلوب دیا اور سوچنے کے لئے حکیمانہ انداز اور جانچنے کے لئے تنقیدی شعور۔[৭২]

("মির্যা গালিবের পূর্বে উর্দু কাব্যের মধ্যে আবেগ ছিল, অনুভূতি ছিল, ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গির বৈচিত্রতা ছিল। কিন্তু শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যেরকম সৌন্দর্য এবং পাণ্ডিত্য থাকা দরকার তা ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু মির্যা গালিবের বেলায় তা ছিল ব্যতিক্রম, তাঁর কাব্যে ভাষাগত সৌন্দর্য্য, সৌখিনতা ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, কাব্য জগতে এ দানটি শুধু মির্জা গালিবেরই। আর এ দানের কারণেই উর্দু কাব্য তার জন্য গর্বিত করতো, যা অন্য কবিদের বেলায় খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। গালিব উর্দু কাব্যকে একটি নতুন রূপ দান করেছিলেন। চিন্তা করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক চেতনা দিয়েছিলেন এবং যাচাই-বাছাই করার জন্য কবিতার মধ্যে দান করে ছিলেন সমালোচনাধর্মী রূপ বৈচিত্র্য"।)

মির্যা গালিব তাঁর উর্দু কাব্যে "ইশ্ক" ও 'মহব্বত্' বা প্রেম ও ভালোবাসা সম্পর্কে যে দার্শনিক মনোভাব, চিন্তা-চেতনা এবং মতামত প্রদান করেছেন তা অন্যান্য দার্শনিকদের মতের বিপরীত। গালিবের দৃষ্টিতে 'ইশক' বা প্রেম হলো- মানব চরিত্রের সেই সর্বোচ্চ আন্তরিকতা, ভদ্রতা ও সম্মানজনক আবেগ অনুভূতি প্রদর্শনের নাম, যা কোন প্রিয়তম ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আর এমন প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টিকূলের প্রতিটি সৃষ্টিজীবের শিরায়, উপশিরায় মানব জীবের 'রুহ' এর মতো বিরাজমান আছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

মির্যা গালিব বলেন, মানব জীবন দু'ধরনের হয়ে থাকে। এর একটি হলো 'ইনসানি' বা মনুষ্যত্ব জীবন যা মানবীয় গুণ বিশিষ্ট। আর অন্যটি হলো 'হায়ওয়ানি' বা 'পশুত্বপূর্ণ জীবন যাতে কোন মানবীয় গুণাবলি বিদ্যমান থাকে না। 'ইন্সানি জিন্দেগী' বা মনুষত্যপূর্ণ জীবনটা আদব ও সৃষ্টাচার মেনে চলার কারণে তা 'হাইওয়ানি জিন্দেগী' বা পশুত্বপূর্ণ জীবনের চেয়ে অনেক ভালো, ভদ্র এবং ব্যতিক্রম। আর এই মানবীয় জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের মাধ্যমেই সৃষ্টিকূলের প্রতি সর্বোচ্চ ভদ্রতা ও সম্মানজনক ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি ও আবেগ-অনুভূতি প্রদর্শিত হয়। গালিব আরো বলেন 'এশ্ক' বা প্রেম হলো মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশের সর্বোচ্চ ছড়া। যা কেবলমাত্র সৌজন্যতাবোধ প্রদর্শনের জন্যই নয়, বরং সৃষ্টিকূলের প্রতি সে অনুভূতি-আবেগ ভালোবাসা প্রদর্শন একদম আসল ও বাস্তব। তাতে শুধুমাত্র লোক দেখানোর কোন সুযোগ নেই।

গালিবের দিওয়ান থেকে একটি কবিতা নিম্নরূপ-

بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہائے گل

کہتے ہیں جس کو عشق خلل دماغ ہے۔[৭৩]

(ফুল দো কেবল হেঁসেই বেড়ায় সারাক্ষণ

অস্থির হয় কর্মকান্ড দেখে বুলবুলি পাখিটার,

প্রেম-সে তো নয় আর অন্য কিছু

পাগলামী আর মাথার বিকার।)

উপরিউল্লিখিত কবিতার সাথেই যদি নিম্নবর্ণিত কবিতাটি পড়া যায়, তাহলে সবাই এ কথাই বলবে যে, মির্যা গালিব একই আবেগ-অনুভূতিতে দু'টি ভিন্ন ধারায় করেছেন। এমনি একটি কবিতা গালিবের দিওয়ান থেকে নিম্নরূপ-

رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے

انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔[৭৪]

(প্রেমের কারণেই নির্জন ঘর ভালোবাসায় পূর্ণতা লাভ করে,

আসর প্রদীপহীন হয়, যদি না শষ্যাগারে বজ্রপাত হয়।)

*Dhaka University Institutional Repository*

উপরিউল্লিখিত দু'টি কবিতার মাধ্যমে মির্জা গালিব প্রেম সম্পর্কে দু'ধরনের চিন্তা ও দর্শন উপস্থাপন করেছেন। প্রথম পংক্তিতে প্রেমকে পাগলামি বা বিকার মস্তিস্ক বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রেমের ব্যাপারে এখানে গালিব কোন প্রশংসামূলক কিছু বলেন নি। তিনি মনে করেন প্রেম হলো শুধুমাত্র পাগলামি ও বাড়াবাড়ি, তাই তিনি প্রেমকে ফুল ও বুলবুলি পাখির সাথে তুলনা করেছেন। বুলবুলি পাখি যেমন পাগলের মতো বার বার ফুলের উপর বসে এবং ফুল থেকে স্বাদ গ্রহণ করে, মধু আহরণ করে, বার বার ফুলকে বিরক্ত করে, সে কারণেই ফুল মনে মনে বুলবুলিকে বিকার মাথা ও পাগল বলে মনে করে। ঠিক মানব জীবনে প্রেমও সে রকম বুলবুলি পাখির মতো বাড়াবাড়ি ও পাগলামির অনুরূপ।

দ্বিতীয় পংক্তিতে গালিব প্রেমের প্রশংসনীয় গুণের বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রেমকে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা দানের রূপকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। গালিব মনে করেন প্রেম এমনি একটি বিষয় যার মাধ্যমে শূন্য ঘরও পরিপূর্ণতা লাভে ধন্য হয়। অর্থাৎ প্রেমের আকর্ষণেই সকল সৃষ্টিকূল এক সাথে সমবেত হয়। মানব প্রেম ও সৃষ্টি প্রেমে সবই একটি আসরে মিলিত হয়। এখানে গালিব প্রেমকে বিজলির আলোর সাথে তুলনা করেছেন। তিনি মনে করেন প্রেম হলো বিজলির মতো, যা মানব হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে দেয়। মাহফিলে বা আসরে যেমন আলো বা প্রদীপ ছাড়া কোন কিছু দেখা যায় না, ঠিক মানব হৃদয়ে প্রেমের আলো ছাড়া কোন আলো দেখতে পায় না। মানব হৃদয়ের একটি অনুভূতিতে ভিন্ন ধরনের চিন্তা-চেতনা বর্ণনা করার মাধ্যমে মির্যা গালিব প্রেমের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সবই হলো গালিব উর্দু কবিতার স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ, যা অন্যান্য দার্শনিকদের মতের বিপরীত।

মির্যা গালিব তাঁর উর্দু কবিতায় মানবকুল ও কুল-কায়েনাতের উপর দার্শনিক মতবাদ তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মানব জাতীর বিভিন্ন দিকের উপর তিনি দার্শনিক চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করেছেন, কারণ গালিব ছিলেন মানবতার কবি ও জীবনমুখী মানব দরদী দার্শনিক কবি। গালিব মানব জীবনের উপর দার্শনিক আলোচনা পর্যালোচনা করতে গিয়ে দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন- একটি হলো, হতাশা, দুঃখ-কষ্ট, নিরাশা, ইহাকে ইংরেজীতে বলা হয়- Pessimism.

অর্থাৎ গালিব বুঝাতে চাচ্ছেন মানব জীবন হলো দুঃখ, দুর্দশা, হতাশাও নৈরাশ্যে ভরা। দুনিয়ার এ জীবন হলো অন্ধকারচ্ছন্ন। এ জীবনে পদে পদে দুঃখ আর কষ্ট, হতাশা আর হতাশা। গালিবের মতে, দুনিয়ার জীবন হলো এক প্রকার জেলখানা। জেলখানাতে আসামীকে যেমন রিমান্ডে নিয়ে বিভিন্নভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে মানব হৃদয়ের 'রুহ', এ রুহটি মানব শরীরের খাচায় বন্দি রয়েছে। আর শাস্তিস্বরূপ জীবনের সকল তিক্ততা ও দুঃখ-যাতনা সবই তাকে সহ্য করতে হয়। তবে হিন্দি দর্শনশাস্ত্রের মতে দর্শনের আসল উদ্দেশ্য হলো মানব জীবনের এ সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় থেকে মানবজাতীকে মুক্ত করা। হিন্দি দার্শনিকগণ এই মানব জীবনকে তারা بندھ শব্দের সাথে

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্পৃক্ত থাকার কথা বলেছেন। তাদের মতে যত দিন মানুষের 'রুহ' শরীরের সাথে সম্পর্ক রাখবে ততদিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশা শেষ হবে না। এটা দুর হওয়া তখনি সম্ভব যখন এ রুহটি মানব শরীরের খাচা থেকে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ মৃত্যু ঘটবে। মানুষ মৃত্যুর পর কেবল দুনিয়ার জীবনের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে পারে অন্যথায় নয়। আর অন্য শব্দটি হলো رجائیت বা, খুশি, মনের প্রশান্তি, দার্শনিকগণ ইহাকে নূর বা আলোর সাথে তুলনা করেছেন, এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো- Optimism মানে আনন্দ, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি। এগুলিই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কাব্যের দার্শনিক রূপ ও বৈচিত্র।

এ প্রসঙ্গে নিম্নে গালিবের দিওয়ান থেকে দুটি কবিতা তুলে ধরা হলো-

ناامیدماگردیش ایام نہ درد

روزے کہ سیاہ شد سحر وشام نہ درد ہے۔[৭৫]

(নৈরাশ্যে যার সময় থেমে

তার এগোবার পন্থা বা-কী,

দিনই যখন নিবিড় কালো,

সকাল কী তার সন্ধ্যা বা-কী?)

گوش مہجور پیام وچشم محروم جمال

ایک دل کس پر یہ ناامیدواری ہائے ہائے[৭৬]

( না তার খবর কানে আসে

রূপও তো ভাসে না চোখে

একটাই মন-বিক্ষত সে

হতাশা আর দুঃখ শোকে।)

মির্যা গালিবের দার্শনিক চিন্তাধারা জনমুখী ও মানব হৃদয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে। পৃথিবীর অনেক পুরাতন একটি দর্শন হলো 'হিন্দু দর্শন'। হিন্দু দর্শনের মূল কথা হলো দুনিয়াটা তিক্ততায় পরিপূর্ণ, আর এ তিক্ততা ও দুঃখ-দূর্দশা দুর করে মানব জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা নিশ্চিত করা। কিন্তু মানুষ দুনিয়াতে যতই যাতনা; সংগ্রাম ও চেষ্টা করুক

না কেন, জীবনকে কাজ-কর্মে সচল রাখুক না কেন কখনোই মানব হৃদয় পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পারবে না। অর্থাৎ হিন্দু দর্শন যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা দুনিয়াতে অর্জন করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু গালিব হিন্দু দর্শনের এ মতবাদের বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন। গালিব মনে করেন হিন্দি ফালসাফাতে যে কুনুতিয়াতের শর্ত দেওয়া হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই। কারণ মানুষ চেষ্টা করলে একদিন নিশ্চিত সফলতা পাবে, দুঃখের সাথে সুখ বিরাজমান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- ان مع العسر يسرا ( নিশ্চয়ী দুঃখের সাথে সুখ আছে।)

মির্জা গালিবের মতের সাথে প্রফেসর মিকাস মুলারের মতের মিল পাওয়া যায়। মিকাস মূলার বলেন-

"ہندوستان کے تمام فلاسفہ پر یہ الزام ہے کہ وہ قنوطی ہیں بعض صورتوں میں یہ الزام صحیح ہوتا ہے لیکن مطلق طور پر نہیں۔ خیال یہ ہے کہ ہندوستانی فلسفی ہمیشہ زندگی کے آلام کا ذکر نہیں کرتے اور نہ وہ زندگی کی بابت اس قسم کی شکایت ہی کرتے ہیں کہ وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اولا ان میں فلسفیانہ رجحان یہ دیکھ کر پیدا ہوا کہ دنیا میں الم بھی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک مکمل نظام عالم میں الم واندوہ کا کوئی مقام نہیں یہ ایک ناہموار چیز ہے۔ جس کا بہر حال امتیاز ہونا چاہئے۔"[৭৭]

(হিন্দুস্তানের সকল দর্শনের উপর "কুনুতিয়াতের" এক বাধ্যবাধকতা রয়েছে কিছু ক্ষেত্রে এটি সঠিক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে এরকম শর্তারোপ করা সঠিক নয়। আমার মতে হিন্দুস্তানি দর্শন সর্বদা জীবনের কষ্টের কথা উল্লেখ করে না। এবং জীবন সম্পর্কে এ রকম অভিযোগও করে না যে, এরকম কষ্ট সহ্য করা যায় না। হিন্দু দর্শন শুধু এটাই বলে যে, দুনিয়াতে সুখের পাশাপাশি দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এটি একটি অযৌক্তিক কথা, এ রকম কথা সর্বদাই পরিত্যাগ করা উচিত।)

মিকাস মুলারের মতে হিন্দু দর্শনকে এ জন্য "কুনুতি" বলা যাবেনা যে, ইহাতে শুধু সারা জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথাই বলা হয়নি, বরং হিন্দু দার্শনিকদের মতে দুনিয়াতে সুখের সাথে কষ্টও আছে। তবে পরিপূর্ণ জীবনের চাহিদা হলো এসব হতাশা, দুঃখকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। মুলার বলেন দুনিয়াতে এমন কোন সুখী মানুষ নাই, যে বলতে পারবে , যে সে দুনিয়ায় বিপত-মসিবত থেকে মুক্ত। জীবনটা তার ফুলে ফলে ভরপুর।"

মির্যা গালিব জীবনমুখী কবি ও দার্শনিক কবি ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি "সহিফায়ে ফিত্‌রাত" এবং "কিতাবে কায়েনাত" গ্রন্থসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং এর পরই তার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গালিব যে গভীর দৃষ্টিসম্পূর্ণ দার্শনিক কবি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডক্টর বিজনুরী এর বক্তব্যের মাধ্যমে, তিনি মির্যা গালিবকে একজন উঁচু মানের দার্শনিক কবি হিসাবে মতামত ব্যক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন এবং বিভিন্নভাবে উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, গালিব একজন প্রকৃত ও উচ্চমানের দার্শনিক কবি। নিম্নে ড. বিজনুরীর বক্তব্য তুলে ধরা হলো-

" کہ غالب کا مطالعہ فطرت گہرا، تفصیلی اور ہمہ گیر تھا۔ اس لئے مسٹر اکرام کا خصوصیت کے ساتھ ان ابیات کو سامنے رکھتے ہوئے جن میں حیات کے اندوہ آمیز پہلوں کا بیان ہے۔ یہ فرمایا کہ ان سے غالب شخصیت یا افتاد طبع کا اظہار ہوتا ہے درست نہیں۔"[৭৮]

(মির্যা গালিব মানব জীবনের বিভিন্ন স্বভাব ও বৈচিত্রপূর্ণ জীবন সম্পর্কে যে দার্শনিক মতামত ব্যক্ত করেছেন তা ছিল সুগভীর, বিস্তারিত বর্ণনাশৈলীতে পরিপূর্ণ। এ জন্য মিস্টার আকরাম জীবনের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে গালিবের ব্যাপারে যে মতামত দিয়েছেন তা ঠিক নয়। আকরাম সাহেব বলেছেন গালিব জীবন সম্পর্কে মনের দিক থেকে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন।)

গালিব তার কবিতায় জীবনের অতি বাস্তব সুখ ও দুঃখের কথাগুলী বার বার বর্ণনা করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে জীবনের সে হতাশা সম্পর্কে গালিবের ব্যক্তিগত মতামত ও দর্শন কি ছিলো সেটিই এখানে দেখার বিষয়। গালিবের ব্যক্তিগত দর্শন হলো হিন্দুস্তানি দর্শন "কুনুতিয়াতের" সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কখনো দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, হতাশা, নিরাশার কাছে পরাজিত হননি। অথবা কখনো দুর্বল প্রকৃতির মানুষের মতো পৃথিবীর বিচ্ছিন্নতা ও জীবনের অপ্রাপ্তির জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। মিষ্টার আকরাম সাহেবও এ ব্যাপারে একমত যে, গালিবের কবিতায় "কুনুতিয়াত" নেই যেমনটা ব্যাপকভাবে হিন্দুস্তানি দর্শনে রয়েছে। মি. আকরাম বলেন-

" غالب کے اشعار میں حزن و افسردگی کی جھلک ہے لیکن غالبؔ کی افسردگی تمام فنوطیوں کی طرح دنیا کی مذمت کے باعث نہیں۔"[৭৯]

(গালিবের কবিতায় হতাশা ও নিরাশার ছাপ আছে, কিন্তু গালিবের সে হতাশার আম কুনুতিয়াতের মতো দুনিয়া সম্পর্কে অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।)

উপরিউক্ত দু'জন দার্শনিকের বক্তব্যের মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হলো যে, গালিব প্রকৃতপক্ষে একজন স্বার্থক দার্শনিক কবি। কারণ গালিবই একমাত্র কবি, যিনি অনেক যাচাই বাছাই করে ও দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার আলোকে তাঁর দর্শনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

দুনিয়া এবং দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে মির্যা গালিব বলেন যে, দুনিয়া এমন একটি স্থান যেখানে আনন্দ, খুশি ও চিত্ত বিনোদনের সুব্যবস্থা আছে সেখানে দুঃখ-কষ্টও আছে। গালিব মনে করেন জীবনে দুঃখ ও সুখ এ দু'টির সংমিশ্রণই হলো মানব জীবনের মূল

*Dhaka University Institutional Repository*

সম্পদ বা পুঁজি। গালিবের মতে আসলে জীবনটা হলো প্রবাহমান নদীর শ্রোতের মতো। যে স্রোত এক মুহূর্তের জন্য কোথাও থেমে থাকার নয় তেমনি মানবজীবনটাও। এ জীবনের কখনো সর্বদা এক রকম থাকে না বা একস্থানে স্থির থাকেনা। জীবনটা হলো ঘড়ির কাটার মত অস্থির যন্ত্র। অর্থাৎ মির্যা গালিব বুঝাতে চাচ্ছেন জীবনের দুঃখ ও সুখ কোনটাই স্থায়ী নয়। এ সুখ ও দুঃখ যেকোন মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসলে তাতে ভেঙ্গে পরা ঠিক নয় । কারণ দুঃখের পর আবার মুহূর্তের মধ্যে আনন্দ ও সুখের বার্তার আগমন ঘটতে পারে। [৮০]

জীবন সম্পর্কে মির্যা গালিবের দার্শনিক মতামত হলো এই যে, দুঃখ, শোক, বিলাপ বা বিষন্নতা জীবনের জন্য খুবই জরুরী। কারণ বিষন্নতার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোন মানুষই জীবনে তার মহান উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে না। আর এই দুঃখ নামক দূতটি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত যত বেশি বেশি আসবে মানুষ তত বেশি উন্নতি ও সফলতা লাভ করতে পারবে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন মানুষই এ দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবে না। এ সম্পর্কে গালিবের দিওয়ান থেকে একটি উর্দু কবিতা নিম্নরূপ-

قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔[৮১]

(জীবনের শিকল আর দুঃখের বন্দিশালা

আসলে দু'টিই সমান,

মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন মানুষ

এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে না।)

গালিব আলোচ্য কবিতায় যে 'غم' বা দুঃখের কথা বলেছেন, সেটা এমন কোন দুঃখ বা ব্যাথা নয়, যার মাধ্যমে দুনিয়া সম্পর্কে ঘৃণা বা অনিহা প্রকাশ পাবে। বরং গালিব দুনিয়ার এ 'غم' কে ইশক্ বা প্রেমের সাথে তুলনা করেছেন। এ 'غم' বা দুঃখ নামক প্রেম মানব জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তাকে মনজিলে মকসুদে পৌছিয়ে দিবে। যার কারণে জীবনে পূর্ণ প্রশান্তির আগমন ঘটবে এবং পরকালে চির শান্তির স্থান জান্নাত লাভে ধন্য হবে। গালিবের মতে তাহলে এমন 'غم' বা দুঃখ তো আসলে কোন প্রকৃত দুঃখ না, বরং এ দুঃখ মানব জীবনের জন্য সুখের বার্তাবাহক বা শান্তির দূত। মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় মানব জীবন সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তা-চেতনা ও মতবাদসমূহ এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

মির্যা গালিবের দৃষ্টিতে দুঃখ নিয়ে বিলাপ করে শোকগাঁথা এবং সুখ ও আনন্দের সুরে গান গাওয়া দু'টির মূল্যই সমান সমান। এ দু'টি জিনিসই গালিবের কাছে নিজ ঘরের সৌন্দর্য্য বা শোভা। গালিবের দিওয়ান থেকে এ সম্পর্কিত একটি উর্দু কবিতা নিম্নরূপ-

نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانئے

بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔[৮২]

(দুঃখ মুখী গানের কিছু

মূল্য দিতে শেখো, হে মন,

সত্তা নামের এই বীণাটা

শব্দ হারা হয় যে কখন!)

আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে মির্যা গালিব 'غم' কে গনিমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মানুষকে এই দুঃখ-দূর্দশাকে অতিক্রম করে উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে উপদেশ প্রদান করেছেন। গালিব মনে করেন মানুষের হৃদয়ের সেই বীণাটা বা প্রাণ পাখিটা যেকোন মুহূর্তে উড়াল দিতে পারে। অর্থাৎ এক মুহূর্তের বিশ্বাস নেই, মানুষ যে কোন সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে পারে। তাই তিনি আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে সাবধানের বাণী ও সুর বাজিয়েছেন।

মির্যা গালিব আরো বলেন একটি ঝড় বা তুফানের আগমনে যেমন দুনিয়া উলট-পালট হয়ে যায়, ঘর বাড়ী, দালান-কোঠা সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এ তুফানে যেমনি দুঃখ আসে তেমনি আবার আনন্দও আসে। অর্থাৎ ঘর ভেঙ্গে যাওয়ার পর সাময়িক কষ্ট হয়। কিন্তু সে ঘর যখন নতুন করে পুনর্নির্মাণ করা হয় তখন মানুষের মনে দুঃখের চেয়ে সুখই বেশি শোভা পায়, নতুন ঘরের ব্যবহারের কারণে সব দুঃখ মুছে যায়। এ ক্ষেত্রে গালিবের দর্শন হলো, মানুষের জীবনে দুঃখ আসলে সে দুঃখকে জয় করার পর তার মনে যে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠে তাতে তার সকল দুঃখ মুছে যায়, সে সকল ব্যাথা-বেদনা ভুলে যায়। মির্যা গালিব এভাবেই মানব জীবন সম্পর্কে তার দার্শনিক মতবাদগুলো তাঁর কবিতায় বর্ণনা করেছেন। এমনি ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে গালিবের নিম্নবর্তী কবিতায়-

ایک ہنگامہ پہ موقوف ہے گھر کی رونق

نوحۂ غم ہی سہی، نغمۂ شادی نہ سہی[৮৩]

(একটি তুফানেই বৃদ্ধি করে ঘরের শোভা,

জীবনটা সুখকর হয় শোকগাঁথায়,

হয় না তা সুর দিয়ে গান গাওয়ায়।)

আলোচ্য কবিতা দ্বারা গালিব এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে, একটি তুফানের কারণেই যেমন ভাঙ্গা ঘরটি নতুনরূপে সজ্জিত হয়, ঘরে নতুন নতুন কারুকার্য ও আসবাবপত্র শোভা পায়; তেমনি মানুষের জীবনেও বিলাপের কারণে সুখ-শান্তি শোভা পায়।

মির্যা গালিব নিজের জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। তিনি অনেক কিছুই পাননি সে কথাগুলী দার্শনিক রূপ ও সুরে নিম্নের কবিতায় তুলে ধরেছেন-

رات و دن گردش میں ہیں سات آسماں

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔[৮৪]

(সাত স্তবক আকাশ চব্বিশ ঘন্টা ঘূর্ণ্যমান থাকে,

তাতে কত কিছুই না ঘটে যায়! চিন্তার কোন কারণ নেই।)

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے مرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔[৮৫]

(মানুষের হাজারো বাসনা এমন আছে

যা প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যেই পেয়ে যায়,

আমার অনেক ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে,

তবুও আরো অনেক বাকী।)

মির্যা গালিবের এ কবিতা দুটি নিঃসন্দেহে তার দুর্ভাবনাযুক্ত জীবনেরই আয়নাস্বরূপ। গালিবের জীবনটা খুবই কষ্টের ছিলো। তিনি কখনোই আনন্দ চিত্তে ও প্রশান্তি মনে জীবন

Dhaka University Institutional Repository

অতিবাহিত করেননি। কিন্তু এ সকল দুর্ভাবনা ও হতাশাপূর্ণ জীবন কবি হিসেবে তার জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো তা তিনি এখানে উল্লেখ করেননি। আর এটাই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার দর্শন। জীবনের হতাশা কবি মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারছে কিনা তার উত্তর আমাদেরকেই খুঁজে বের করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে।

সর্বোপরি সকল আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিভিন্ন মনীষী ও দার্শনিকদের মতামত ও প্রমাণাদির মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, মহান কবি মির্যা গালিব একজন পূর্ণাঙ্গ, স্বার্থক ও স্বতন্ত্র দার্শনিক কবি ছিলেন। মির্যা গালিব নিজেকে দার্শনিক কবি হিসাবে প্রমাণ করার জন্য অসংখ্য দর্শনযুক্ত কবিতা তার দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। উপরিউক্ত আলোচনায় তার কিছুটা ঝলক দেখানোর প্রয়াস চালানো হয়েছে।

## রসিকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা

গালিব চরিত্রের বিশেষ একটি গুণ ছিল রসিকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা। আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় তাঁর রসিক মনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। হাজারো দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা-যন্ত্রণার মধ্যেও রসিকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর থেকে অন্তর্হিত হয়নি। গভীর বেদনার মধ্যেও তিনি রসিকতা করেছেন। দুর্দিনের ঘনঘটায় এই কৌতুকপ্রিয়তাই তাঁর অন্তর-দিগন্তে রংধনুর বর্ণবৈচিত্র্য ছড়িয়ে দিত। শুধু তাই নয় অন্যের দুঃখ ব্যথাকেও বেশ সহানুভূতির সাথে গ্রহণ করে হাস্যরসের মাধ্যমে সেই ব্যাথাকে লাঘব করতে চেষ্ঠা করেছেন। সকল অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও কৌতুক আবিস্কারের এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। এই জন্য মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী গালিবকে 'হায়ওয়ানে যরীফ' (রসিক জীব) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অন্যকে নিয়ে যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি নিজেকে নিয়েও  মৃদু ঠাট্টা করেছেন। তবে এগুলির মধ্যে কোনো স্থুলতা নেই, বরং আছে এমন এক বুদ্ধিমিশ্রিত কৌতুক যার রস গ্রহণের ক্ষমতা সকলের না-ও হতে পারে।[৪]

এক কবিতায় তিনি নিজেকে উপহাস করে বলেন-

یہ مسائل تصوف ہے یہ ترا بیان غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا[৮৬]

( এটি সুফি সংক্রান্ত বিষয়, এক্ষেত্রে তোমার কথা হল এই

তোমায় আমরা ওলী ভাবতাম যদি তুমি মদ না পান করতে।)

Dhaka University Institutional Repository

গালিব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রসিকতা করেছেন। প্রেমিকা, রাকীব, বন্ধু, হুর, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ কোন কিছুই তাঁর রসিকতা থেকে, তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ থেকে বাদ যায় নি। আপন ভেবে কবি যাকে বন্ধু বানিয়েছেন মনের কষ্টকে খুলে বলবেন বলে, হয়ত সে তা শুনে সমব্যাথী হবে, তাঁর দুঃখকে বুঝবে ; কিন্তু কবির সে বন্ধু তা না হয়ে শুধুই উপদেশ দিয়ে বেড়ায়। বন্ধুর এমন আচরণে কবি খুবই মর্মাহত হন। তার এই আচরণকে বিদ্রূপ করে কবি এক কবিতায় বলেন-

یہ کہاں کی دوستی کہ بنے ہیں ناصح

کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا۔[৮৭]

(এটি কেমন বন্ধুত্ব, বন্ধু হয়েছে উপদেশদাতা

যদি সে সমব্যাথী হতো, দুঃখকে বুঝতো।)

অন্য কবিতায় হুর ও বেহেশতকে রসিকতা করে কবি বলেন-

جس میں لاکھوں برس کی حورین ہوں

ایسی جنت کا کیا کرے کوئی[৮৮]

(যেখানে লক্ষ বছরের হুর রয়েছে

এমন বেহেশত দিয়ে কী হবে।)

গালিবের কাব্যের বিশাল জায়গা জুড়ে আছে রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। গালিব কবিতায় অতিমাত্রায় হাঁস্যরস ও ব্যঙ্গাত্বপূর্ণ কথাবার্তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে গর্ববোধ করতেন। শুধু গালিবই নয় যে সকল কবিগণ হাস্যরস ও কৌতুকপ্রিয় হন, তারা দুনিয়ার সকল কিছুকে অতি সহজ মনে করেন। তারা মনে করেন কথার যাদুতে এ দুনিয়াকে একটি ছোট্র বোতলে ভরে রাখা যায়। অর্থাৎ রসিকলাল ও কৌতুকপ্রেমী কবিগণ নিজেদের রসালো কথার দ্বারা শত কঠিন হৃদয়েও আশার আলো জ্বালাতে পারেন। অনেক দূর্লভ বস্তুও অর্জনে করতে সক্ষম হন। গালিবের বেলায়ও এমনি ছিলো। তিনি রসিকতার মাধ্যমে অনেক শ্রেণির মানুষকে বশ মানিয়েছেন। অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, দুর্লভ বস্তুকে নিজ হাতের মুঠোয় আনতে পেরেছেন। কারণ গালিব সকল ক্ষেত্রেই রসিক ছিলেন, তাঁর কথায় রস ভরপুর থাকতো।

Dhaka University Institutional Repository

গালিবের হাস্যরসপূর্ণ বক্তব্য অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি ও কৌতুকময় গল্প বলার কারনে গালিবের সকল বন্ধু গালিকে অনেক পছন্দ করতেন, তারা গালিবকে মন থেকে অনেক বেশি ভালো বাসতেন ও আদর করতেন। তাঁর বন্ধু মহল একে অন্যের কাছে গালিবের প্রশংসা করে বেড়াতেন, গালিবের কৌতুক মাখা গল্প বলে শুনাতেন, কেউ বা গালিবের বানানো ছোট ছোট লতিফা বা গল্প বলে নিজেদের মধ্যে অনেক হাঁসাহাঁসি করতেন ও অনেক মজা করতেন। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীর নিম্ন বর্ণিত কবিতা খানি এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করে-

تھیں دل مین اس کی باتیں تھیں

لے چلیں اب وطن کو کیا سوغات[৮৯]

(অন্তরে গালিব সম্পর্কে অনেক কথা ছিলো জমা,

এ উপহার গালিবের বাড়ী পর্যন্ত পৌছাতে হবে।)

গালিবের জীবন দু:খ ও অশান্তিতে ভরা ছিলো। এ দু:খ ও অশান্তি দূর করার জন্য তিনি তার কবিতায় রসিকতাপূর্ণ ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন। গালিব তার কবিতায় কৌতুকগুলী এমনভাবে তুলে ধরেছেন, মনে হয় যেন অন্ধকার রাতে জোনাকিরা আলো ছড়াচ্ছে।

গালিব নিজের জীবনের ব্যর্থতা, অন্তসার দেহ সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন এবং তা চিত্র শিল্পির মতো অংকন করেছেন তাঁর কবিতায়। এমনি দুটি উর্দু কবিতা নিম্ন রূপ-

بھر کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا

اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیش خم نکلے[৯০]

(চলে যাবে একদিন তোমার রূপ সৌন্দর্য্য

সুঠাম দেহ, সুন্দর জীবন হে অত্যাচারী।

ললাটের বাঁকা কেশগুচ্ছ

থাকবে ঠিক বাঁকা ও মোচড়ানো।)

গালিব আভিজাত্যপূর্ণ জীবন, বে-পরওয়া চাল-চলনকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। যেমন তার এক কবিতায় গালিব বলন-

پوچھ مت رسوائی انداز استغنا حسن

Dhaka University Institutional Repository

دست مرہون حنا، رخسار رہن غازہ تھا[৯১]

(বাহ্যিক সৌন্দর্য, বে-পরওয়া জীবনের
অপমানের কথা জিজ্ঞাসা করোনা,
হাতে মেহেদীর নকশা ছিলো যত
মুখ মন্ডলে প্রসাধনের সাজ ছিলো তত।)

প্রথম কবিতায় গালিব অহংকারপূর্ণ জীবনের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন এতো সুন্দর চেহারা, দেহের সুন্দর অবয়ব ও সুঠমতা, মান-মর্যাদা পাহারা দিয়ে ধরে রাখা যাবে না। ললাটের বাজপরা সুন্দর কেশগুচ্ছ রাঙ্গিয়ে সজ্জিত করে স্থায়ী ভাবে দেখতে পাবে না। তাহলে কেন এত গর্ব আর অহংকার ? কেন এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে ক্ষমতার দম্ভ ও লড়াই?

গালিব দ্বিতীয় কবিতায় মানুষের লোক দেখানে আভিজাত্য, বড়াই, রঙিন জীবনের খাম খেয়ালি রং ঢং ও বে-পরওয়া জীবনের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ প্রকাশ করেছেন। কারণ দুনিয়াতে বে-পরওয়া জীবন যাপন করা ও চলাফেরায় অশালিনতা থাকলে তাদের কেউ ভালো চোখে দেখে না, সম্মান করে না। তারা সর্বদাই সবখানে অপমান অপদস্তের স্বীকার হয়। তাহলে কেন এ রঙিন ও বিলাসি জীবনের বড়াই? গালিব এভাবেই তার কবিতায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন।

কৌতুক সমৃদ্ধ গালিবের উর্দু কবিতার কিছু নুমনা নিম্নরূপ-

حریف مطلب مشکل نہیں فسوں نیاز

دعا قبول ہو یارب کہ عمر خضر دراز.[৯২]

(প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা কঠিন কোন ব্যাপার নয়
শুধুমাত্র কৌশলে নিবেদন করা হয়,
হে! প্রভূ আমার নিবেদন মঞ্জুর হোক
যেন পাই খিযির (আঃ) এর মত দীর্ঘ জীবন।)

উক্ত শে'রের মাধ্যমে মির্যা গালিব তার নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা বার বার স্মরণ করে নিজের উপর কৌতুক করেছেন। তিনি বলছেন জীবনে কোন আশাইতো পূর্ণ হলো না। কোন আবেদনও প্রভূর কাছে মঞ্জুর হলো না, তাই শেষ বেলা এ দোয়াই করি হে খোদা তুমি আমার জীবনটা হযরত খিযির (আঃ) এর মতো সুদীর্ঘ করে দাও। আমি যেন আরো দোয়া করার অনেক সময় পাই। আমার দোয়া যেন তোমার দরবারে একবার হলেও

Dhaka University Institutional Repository

পৌছাতে পারি। জরাফত সম্পর্কে বা কৌতুক সম্পর্কে গালিবের আরো একটি উর্দু কবিতাঃ-

ان ہریزادوں سے لینگے خلد میں ہم انتقام

قدرت حق نے یہی حوریں اگر داں ہو گئیں۔[৯৩]

(এতো বেশি কষ্টের বদলা নেব আমি জান্নাতে

খোদা পাক দিবেন অনেক হুর সেখানে।)

গালিব আবারো নিজের বেশি মাত্রার কষ্টের কথাগুলী তুলে ধরেছেন এই কবিতায়। আর তার সাথে সাথে কৌতুক করে বর্ণনা করেছেন নিজের মনের আশার বিষয়গুলীর প্রাপ্তির কথা পরকালের জান্নাতে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান এই কষ্টের বিনিময় হিসাবে আমি খোদা তায়ালার কাছ থেকে জান্নাত ও তার নিয়ামত স্বরুপ হুরও পেতে চাই এবং পাবোই ইনশায়াল্লাহ।

মির্যা গালিব অন্য আরেক জায়গায় বলেছেনঃ-

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں

رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن[৯৪]

(হে গালিব! তুমি ধার-দেনা করজ করে মদ পান করছো

কিন্তু তোমাকে এক বার বুঝা উচিৎ ছিলো

এ রঙ্গিন জীবনই একদিন দরিদ্রের কারণ হবে।)

এখানে গালিব নিজের কর্মের উপর এতোই বিরক্ত ছিলেন যে, তা ব্যঙ্গাত্বকভাবে আপন সুরে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উর্দু কবিতায়। কবির জীবনে দরিদ্রতার মূল কারণ ছিলো দেনা করা। কারণ দেনা-ধার করে মদ পান করতেন, আনন্দ-ফূর্তি করতেন। গানের আসর বসিয়ে নিজে মদ পান করতেন অন্যকেও পান করাতেন। এদিকে দোকানে কত বাকী পড়েছে তার কোন খবর নেই। তাই নিজেই নিজের উপর সীমাহীন বিরক্ত হয়ে এমন ব্যঙ্গাত্বকমূলক কথাগুলী প্রকাশ করেছেন।

মির্যা গালিব প্রেমিকাকে ব্যঙ্গ করেও কবিতা লিখেছেন। তাঁর হাত থকে প্রেমিকাও ছাড়া পায়নি। বিরহী প্রেমিক হয়ে নিজের প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে অনেক কৌতুক রচনা করেছেন। নিম্নে গালিবের দিওয়ান থেকে একটি কবিতা দেখা যাক-

آئینہ دکھ اپنا سا منھ لے کے رہ گئے

صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا[৯৫]

(আয়নাতে নিজের সুন্দর চেহারা দেখ,

প্রেমিককে মন না দিয়ে কতইনা প্রতারনা করেছো।)

মির্যা গালিব এখানে প্রেমিকার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। প্রেমিকা গালিবের সাথে কথা দিয়ে কথা রাখেনি, প্রিয়া তাঁর সাথে বেঈমানি করেছে, প্রতারণা করেছে। তাই প্রেমিক ও রসিক কবি প্রিয়ার সাথে ব্যঙ্গ করেছেন যা তার কবিতায় দৃশ্যমান।

মির্যা গালিব অন্য আরো এক জায়গায় বলেছেন-

سیکھے ہیں مہ دخول کیلئے ہم مصوری

تقریب کچھ تو ہر ملاقت چاہئے۔[৯৬]

(আমিতো চাঁদের মতো মুখ অঙ্কনের প্রশিক্ষণ নিয়েছি,

কিন্তু আসতে হবে সাক্ষাত নিয়ে আমার খুব কাছে।)

মির্যা গালিব আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে প্রিয়ার সাথে কৌতুক করেছেন। তিনি প্রিয়ার দেখা পেতে চান, তিনি প্রিয়ার মুখচ্ছবি আপন হৃদয়ে চিত্র শিল্পির মতো অংকন করে গেঁথে রাখতে চান। তাই তিনি প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি তোমার চাঁদের ন্যায় মুখটি চিত্রশিল্পের মতো নিখুঁতভাবে আমার হৃদয়ে ও সরেজমিনে অংকন করে তোমাকে দেখাতে পারব। কিন্তু সে জন্য তো আমার সাথে তোমাকে অনতিবিলম্বে সাক্ষাত করতে হবে। গালিব এভাবেই তাঁর কৌতুক মনটি তাঁর উর্দু কবিতায় প্রকাশ করেছেন। এগুলীই হলো গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য।

মির্যা গালিব ফেরেশতাদের প্রতিও বিদ্রোহী মনোভাব পোষন করেছেন। কিরামান কাতেবিন এর প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন মানবজাতীর নেকী ও বদী লেখার ব্যাপারে। ফেরেশতাদের দ্বারা মানুষের পাপ-পূন্য লেখার ব্যাপারে গালিবের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি ফেরেশতাদেরকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড় দেননি। যা নিম্ন বর্ণিত কবিতার মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয়েছে-

پکڑ جاتے فرشتوں کے لکھے پر ناحق

آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔[৯৭]

Dhaka University Institutional Repository

(ফেরেশতাদের লেখার কারণে অন্যায়ভাবে
মানব হৃদয়কে বিচারের সামনে বসায়,
মানুষেরও অধিকার আছে, প্রতিবাদ করার,
ফেরেশতাদের বিপক্ষে লেখার ও বিচার চাওয়া।)

ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکرین
مگر بادۂ دوشینہ کی بو آئے[৯৮]

(প্রকাশ থাকে যে, মুনকার ও নাকীর ভয়ে পলায়ন করবে না,
কিন্তু গত রাতের মদ্য পান করার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।)

মির্যা গালিব এখানে ফেরেশতাদের প্রতি ঔদ্বত্যপূর্ণ ভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি আলোচ্য কবিতাংশের মাধ্যমে এ কথাই বলতে চান যে, গত রাতে আমি অনেক মদ পান করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, মুনকার ও নাকীর মদের দুর্গন্ধে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে, এবং আমার পাপ লিখতে পারবে না। কিন্তু আসল ব্যাপার টা এমন নয়। কারণ মুনকার নাকীর কখনোই ভয় পায় না এবং সে কখনোই তার কর্তব্য পালন করা বাদ রেখে পালাবেন না। গালিব এভাবেই মনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলী প্রকাশ করেছেন তার উর্দু কবিতার পংক্তিগুলোতে।

গালিবের রোষানল থেকে রক্ষা পায়নি কোন কিছুই। তিনি স্রষ্টার প্রতিও অভিযোগ তুলে ধরেছেন। তাঁর এ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে নিম্ন বর্ণিত কবিতায়-

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی
بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا۔[৯৯]

(তিনি (আল্লাহ) পাপিষ্ঠ নমরুদেরও খোদা ছিলেন
ইবাদত করেও আমারে (গালিব) জীবন সুখকর হলো না।)

গালিব এ কবিতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর মতে নমরুদ যদি এতো পাপ করার পরও জীবনে বাদশাহীর আসন পায়, জীবনে সুখ সমৃদ্ধি পায়, সম্মান ও প্রতিপত্তি পায়, তাহলে আমি এতো ইবাদত করার পরও কেন জীবনে সুখ-

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি পেতে ব্যর্থ হলাম। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি নির্দয় ও অবিচার করেছেন। এই হলো গালিবের বিদ্রুপাত্মত মনের পরিচয়।

গালিব অন্যত্র বলেছেন-

زندگی اپنی جب اس شکل سے گذری غالب

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے[১০০]

(এমনভাবেই কেটে গেলো হায়রে গালিব

আমার এ দু:খের জীবন

এ দুনিয়াতে আল্লাহ আছেন

ভাবার সময় পেলই না মন।)

এখানে গালিব বলতে চান দুনিয়াতে যদি মহান আল্লাহ বিদ্যমান থেকেই থাকেন তাহলে কেন আমার জীবনে এতো হতাশা, দুঃখ ও দুর্দশা, সুখ কেন আমার জীবনে ধরা দিলনা। আমি কী এটাই ভাববো যে, দুনিয়াতে খোদায়ী বিধান অনুপস্থিত ? মহান কবি এভাবে কৌতুকের সুরে তার অভিযোগ গুলীর খোদা পাকের কাছে জানিয়েছেন নালিশের ভাষায়।

নিজেকে নিয়ে হাঁসি ও কৌতুকের দৃশ্যপট তৈরি করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ সব রসিক ও কৌতুক প্রিয়, কবিরাই নিজেকে নিয়ে হাঁস্য রস ও কৌতুকের কার্টুন তৈরি করতে পারেননি, কিন্তু গালিব ছিলেন এ ব্যাপারে স্বার্থক রসিক ও ব্যঙ্গাত্মক কবি। তিনি নিজেই নিজেকে নিয়ে সুন্দর কার্টুন তৈরি করতে পারতেন। এমনি একটি হাঁস্যরসপূর্ণ কার্টুন তৈরির দৃশ্যপট নিম্নে তুলে ধরছি।

গালিব অভাবের কারণে সর্বদা টাকা পয়সা ধার করতেন, আর সে দেনা শোধ করতেই গালিবের যত সমস্যা হতো। আর এরকম দেনা করার কারণেই গালিব এতো বেশি গরিবানা হালাত অতিবাহিত করতেন। তাই তিনি নিজেকে অন্য মানুষ মনে মনে ধরে নিয়ে অনেক ভাবতেন, চিন্তা করতেন এবং নিজেই প্রশ্ন করতেন-

"কেন হে নবাব সাহেব। এতো অন্যায় কাজ ও বেহিসাবি কাজ কেন হচ্ছে? কিছুতো বলবেন? জওয়াব তো দিবেন না কী? উত্তরে বলতে লাগলেন কি রকম বেহায়ায়ী, বেশরম, বালাখানা থেকে শরাব দোকান থেকে গোলাপ ফুল, বাজার থেকে নতুন নতুন পোষাক, ফলের দোকান থেকে আম, জাম, কলা আরো কত দামি দামি ফল, সব কিছু দেনা করে খাওয়া? এটা কি কখনো চিন্তা করা হয়েছে এতো দেনা কোথায় থেকে দিবে? এভাবেই তিনি কবিতার ম্যাধমে অনেক তিক্ত বিষয়কে বিদ্রুপের ও রসিকতার সাথে বর্ণনা করতেন। এটাই হলো গালিবের রসিকতা ও ব্যঙ্গাত্বপূর্ণ কবিতার বাক্যলাপ। [১০১]

Dhaka University Institutional Repository

গালিব অনেক রসিক ছিলেন তিনি প্রায়ই কৌতুক করতেন, নিজে রসিকতা করে অনেক হাঁসতেন এবং অন্যকেও হাঁসাতেন। গালিব সর্ব অবস্থায় আপনজন ও স্নেহভাজনদের সাথে বিভিন্ন ব্যাপারে বৈচিত্র্যময় বিষয় নিয়ে হাঁসাহাঁসি করতেন। যার প্রমান মিলে নিম্ন বর্ণিত গালিবের একটি উর্দু কবিতায়-

چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد

آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے۔[১০২]

(আসাদ ভালোবাসে সুন্দর মুখ

আপনার মুখটিও তো একবার দেখতে চাই।)

এখানে গালিব বুঝাতে চান যে, আমি তো সুন্দরের পুজারী, আমি সুন্দর মানুষ, সুন্দর দুনিয়া অর্থাৎ সব সুন্দরকে ভালোবাসি। তিনি এ কথাটি তার প্রিয়জনকে লক্ষ করে রসিকতার ছলে বলেছেন। তিনি বলেন যে, তুমি তো অনেক সুন্দর মনের মানুষ আবার দেখতেও তুমি বড়ই সুন্দরী তাই তো আমি তোমার মুখটি একবার দেখতে চাই। গালিব এভাবেই প্রিয়জনদের উদ্দেশ্যে কৌতুকময় কবিতা নির্মাণ করেছেন।

গালিব আসলেই একটু বেশি রসিকপ্রিয়। তার রসিকতার মাত্রাটা সবার চেয়ে বেশি। এমনি রসিকতার প্রকাশ পেয়েছে গালিবের নিম্নবর্ণিত কবিতায়-

غالب ان مہ طلعتوں کے واسطے

چاہنے والا بھی اچھا چاہیے[১০৩]

(গালিব শুধু তাদের জন্য যাদের মুখ চাঁদের ন্যায়

মানুষ যখন কিছু চায়, তখন সবচেয়ে ভালোটাই চায়।)

এখানে গালিব খুব উঁচুমানের হাঁস্যরস বা রসিকতা প্রকাশ করেছেন। গালিব রসিকতা করে বলেছেন, পৃথিবীতে যাদের চেহারা চাঁদের ন্যায় অতি সুন্দর, যারা অনেক সুন্দরী, আমি শুধু তাদেরকেই দেখতে চাই, তাদেরকে পেতে চাই। মানুষ সর্বদা সবচেয়ে ভালো ও উন্নতমানের জিনিসেরই প্রার্থী হয়ে থাকে। আমি ও তার ব্যতিক্রম নই।

আমরা বাংলা কবিতায় দেখতে পাই রসে ভরা অসংখ্য পংক্তি ও কাব্যমালা, সে সব কাব্যে রয়েছে মধুর সুর, মন মাতানো হাজারো গান, সঙ্গিত, গজল ও সাহিত্য সম্ভার। বাংলা সাহিত্যের এ বিশাল জগৎটাকে যারা উর্বর করেছেন যাদের কারণে বাংলা গদ্য ও পদ্য

*Dhaka University Institutional Repository*

লোকের মুখে সমাদৃত হয়েছে তারা সবাই রসসাগরের মহান নাবিক ছিলেন। তারা তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে রসের হাঁড়ি ভেঙ্গে সমুদ্রের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের এমনি দুজনে দিকপাল ছিলেন কবি নজরুরল ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাদের আগমনেই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে রসের জোয়ার বয়ে যায়। তারা বয়ে দিয়েছেন রসের ফল্গুধারা। বৎসর ব্যাপী রিসার্চ গ্রন্থ 'পুজি একাকী' এটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম একটি ফিকশন, যাতে কবি নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনের সকল সংগ্রহিত রসের ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। মহান কবি মির্জা গালিবও তেমনি একজন রসের ভিলেন ছিলেন। গালিবের উর্দু কবিতা ও গজল হলো রসে ভরপুর, তাতে রয়েছে সীমাহীন কৌতুক, রয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। উইট বা কৌতুকবোধ উর্দু কবিতার জন্য একান্তই অপরিহার্য। কৌতুক ছাড়া উর্দু কাব্য বেমজা ও অন্তসার শূন্য। আরবী ব্যাকরণের ক্ষেত্রে একটি প্রবাদ বাক্য আছে النحو فى الكلام كالملح فى الطعام অর্থাৎ লবন ছাড়া খাবার যেমন বেমজা, ঠিক আরবি ব্যাকরণ ছাড়া ভাষাও তেমন বেমজা। এমনি ভাবে উর্দু কবিতাও তাই, কৌতুক বিহীন উর্দু কবিতা একদম বিস্বাদ। এক্ষেত্রে গালিবের রসিকতা কাব্যকুঞ্জে আনে নতুন জোয়ার ও শুভবার্তা। [১০৪]

যারা বড় রসিক তারা জানেন নিজেকে নিয়ে কিভাবে রসিকতা করতে হয়। বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ নিউইর্য়কে বসে লিখেছিলেন নিজের ফেলে আসা জীবনের অব্যক্ত কাহিনী যেখানে তিনি নিজেই এক মজাদার চরিত্র। গালিব তেমনি এক মজাদার চরিত্রের মানুষ। তার উর্দু শে'রগুলী অনেক জ্ঞানী গুনী এবং সম্ভ্রান্তরা ডায়রিতে সযত্নে লিখে রাখতেন, মুখস্ত করে রাখেন। ঠিক জায়গা মাফিক যখন সেগুলো পরিবেশিত হয় তখন বোঝা যায় যে মণিমাণিক্যগুলো কত সর্ন্তপনে সংগ্রহ করে গুছিয়ে রেখেছেন যেন সঠিক সময়ে তার প্রয়োগ হয়।

এমনি কৌতুকপূর্ন কিছু কবিতা নিম্নরূপঃ-

غالب چھوٹی شراب پر ابھی کبھی کبھی

پیتا ہوں روز ابر و شب مہتاب میں۔ [১০৫]

(গালিব ফেলে দিয়েছে শারাব তবু কখনও

পান করি মেঘলা দিনে অথবা চাঁদনী রাতে)

গালিব জান্নাত সম্পর্কে কৌতুক করে অন্যত্র বলেছেন-

ہم کو معلوم ہیں جنت کی حقیقت

دل کو خوش رکھنے کے غالب یہ خیال اتا ہے۔ [১০৬]

Dhaka University Institutional Repository

(জান্নাতের কথা আমার জানা আছে, তবু
মনকে খুশি রাখার জন্য গালিব এমন খেয়াল।)

গালিবের একান্ত ঘনিষ্ট সহচর বিশ্বস্ত শেষ জীবনের সঙ্গী ও অনুগত বন্ধু ও শিষ্য মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী গালিবের রসিকতা সম্পর্কে কিছু লতিফা বা ছোট খোশ গল্প বর্ণনা করেছেন। যারা উর্দু জানেন তারা খুব ভাল ভাবেই জানেন লতিকা বা খোশ গল্প কত মজার গল্প। এরকম কয়েকটি লতিফা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

**'লতিফা' একঃ**

গালিবের খুব প্রিয় খেলা ছিল শতরঞ্জ বা চৌসর। সেই খেলা রীতিমত বাজি রেখে খেলতেন। রমজান মাসে রোজা চলাকালীন একদিন নিজের ঘরে বসে কোন এক পরিচিত লোকের সাথে চৌসর খেলছেন। গ্রীষ্মকালে উল্লিখিত ঘরটির অবস্থান বেশ অদ্ভূত। প্রবেশ দ্বারের ঠিক ওপরে ছোট্ট একখানি প্রকোষ্ঠ। গালিবের এক বন্ধুস্থানীয় মানুষ মাওলানা আজুরদা একদিন দুপুরবেলা সেখানে হাজির হলেন। গালিবকে রোজা চলাকালীন জুয়ার মত নিষিদ্ধ খেলা খেলতে দেখে অত্যন্ত আহত হয়ে বললেন- 'মির্যা হাদিসে পড়েছি রমযান মাসে শয়তান কয়েদ থাকে, তবে কি সে কথা ঠিক নয়?' গালিব তাকে আশ্বস্ত করে বললেন আপনি নিশ্চিত থাকুন জনাব হাদিস একেবারে সত্য ও নির্ভূল। আসলে শয়তান যেখানে কয়েদ থাকে সেটি এই ঘরই। [১০৭]

**লতিফা দুইঃ**

এটি সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরবর্তী সময়ের ঘটনা। সিপাহী মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সে বিদ্রোহে সিপাহীগন বিদ্রোহে ব্যর্থ হবার পর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যখন আবার দিল্লী দখল করল সে সময়কার কথা। কর্নেল বার্ন যিনি সাধারণত কর্নেল ব্রাউন নামে পরিচিত ছিলেন একবার সেনা পাঠিয়ে গালিবকে নিজের ছাউনিতে তলব করলেন। উদ্দেশ্য বিদ্রোহের সাথে গালিবের কোন সংশ্রব ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা। তিনি গালিবের মাথার লম্বাটি মুসলমানি কলাহ্ পপাখ টুপি দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ

| | | |
|---|---|---|
| কর্নেল ব্রাউন | : | ওয়েল, তুম মুসলমান? |
| গালিব | : | জি, ম্যায় আধা মুসলমান হুঁ। |
| কর্নেল ব্রাউন | : | ওয়োহ কেয়া? আধা কা মতলব কেয়া? |
| গালিব | : | আধা ইসলিয়ে কে শরাব পীতা হুঁ, আওর শুয়ার নেহি খাতা। |

*Dhaka University Institutional Repository*

আধা মুসলমান এইজন্য যে মদ খাই, শুয়োর খাই না। ইসলাম মতে দুটোই খাওয়া মানা। [১০৮]

**'লতিফা' তিনঃ-**

একবার রমযান মাসে মির্যা গালিব কেল্লায় বা দূর্গে প্রবেশ করলেন। বাদশাহ মির্যা গালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন-হে গালিব তুমি এ পর্যন্ত কতটি রোজা রেখেছ? গালিব বললেন পীর মুরশিদের কসম একটিও রাখিনি। [১০৯]

**'লতিফা' চারঃ**

মির্যা গালিব একদিন নওয়াব মোস্তফা খাঁন এর বাড়ী বেড়াতে গেলেন। নওয়াব সাহেবের বাড়ী সামনে একটি শামিয়ানা টাঙ্গানো ছিল এবং এর কারণে সেখানে খুব অন্ধকার ছিল। যখন নওয়াবের বাড়ীর দরজায় গিয়ে পৌছালেন সেখানে নওয়াব সাহেব গালিবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন, মির্যা গালিব নওয়াবকে দেখে এই পংক্তিটি পাঠ করলেন-

"کہ آب چشمۂ حیوان دروں تاریکست"

অর্থাৎ ঝর্নার পানি প্রাণীর মধ্যে গিয়ে অন্ধকারে রূপ নেয়। যখন তিনি দেওয়ান খানাতে গিয়ে পৌছালেন তখন তিনি দেখতে পেলেন নওয়াব সাহেবের বিল্ডিংটি পূর্বমুখী হওয়ার কারণে তার পুরো বিল্ডিং এর ভিতরে সূর্যের আলো দিয়ে ভরপুর। মির্যা গালিব তখন নিম্ন বর্নিত পংক্তিটি পাঠ করলেন-

"ایں خانہ تمام آفتاب است" [১১০]

( এই বাড়ীটি সম্পূর্ণই সূর্যের ন্যায়।)

**'লতিফা' পাঁচ-**

একটি স্থানে বসে মির্যা গালিব মীর তাকী মীরের ব্যাপারে প্রশংসা করছিলেন, সেখানে শায়েখ ইব্রাহিম জওক ছিলেন, তিনি মির্জা রকী সওদাকে মীর তাকীর চেয়ে বেশি ভালো বললেন। তখন মির্যা গালিব হাঁসি দিয়ে বললেন-

"میں تو تم کو میری سمجھتا تھا۔ مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں" [১১১]

(আমি তো ভাবতাম আপনি আমার পক্ষেই ভালো বলবেন, কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম আপনি মির্জা রকী সওদার হিতাকাঙ্খী। )

গালিবের কৌতুক ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কাব্য সম্পর্কে শায়েখ মুহাম্মদ আকরাম লিখেনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

جس خصوصیت نے اس زمانہ کی اشعار کوامتیازی رنگ دے دیا ہے وہ مرزا کی ظرافت و شوخی ہے۔ ان کی ظرافت بہت پاکیزہ تھی۔ تبسم زیر لب سے آگے نہیں بڑھتی تھی۔ لیکن اس میں رد رعایت کسی کی نہ تھی۔ گاہے گاہے اپنے اوپر بھی ہنس لیتے تھے [১১২]

(যে বৈশিষ্ট্য সে যুগের কাব্য জগতকে ভিন্ন রূপ সজ্জা উপহার দিয়েছিল তা হলো মিযা গালিবের কৌতুক সমৃদ্ধ উর্দু কবিতা। তাঁর কৌতুক খুব পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ছিলো। তাঁর কৌতুক শুনে সর্বদাই লোকজন মুচকি হাঁসতেন। মানুষেও হাঁসতো, কখনো কখনো গালিব নিজেও নিজের উপর হাঁসাহাঁসি করতেন।)

এ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে এটিই স্পষ্ট হলো যে, কৌতুক ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ এবং সমালোচনা এসব কিছুর শোভাও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে ব্যক্তির তুখোর মেধা ও বিচক্ষণতার উপর। আর গালিব ছিলেন সীমাহীন মেধাবী, বিচক্ষণ এবং বিদ্রুপ কবি মনস্ক। এজন্য খোদায়ী ভাবেই তার সকল উর্দু কবিতায় এসকল শোভাগুলী একত্রে উপস্থিত রয়েছে। [১১৩]

মির্জা গালিবের ব্যঙ্গাত্মমূলক কিছু উর্দু কবিতার উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ [১১৪]

(এই সরলতার তানে কে আর জীবন দিবে খোদা

যুদ্ধের ময়দানে ঠিকই টিকে আছি, যদিও হাতে নেই তলোয়ার)

আলোচ্য শে'রের এর দ্বারা গালিবের কবি মনের ব্যঙ্গাত্বক মনোভাবের চিত্র ফুঠে উঠেছে। গালিব খোদার দরবারে ব্যঙ্গ করে এটাই বলতে চান যে, আমিতো সাদা মনের মানুষ হিসাবে সকল প্রকার যাতনা সয়ে সয়ে ধুকে ধুকে মরছি। জীবন যুদ্ধ সাগরে সাঁতার দিয়েছি। অস্ত্র ও ঢাল তলোয়ার ছাড়াই আপন মনের শক্তি সঞ্চার করে যুদ্ধ করে ময়দানে বহাল তবিয়তে এখনও ঠিক রয়েছি। কিন্তু এই অস্ত্র ছাড়া সংগ্রাম আর কতদিন চলবে এটাই আমার মনের প্রশ্ন।

মির্যা গালিব উর্দু কাব্যের একমাত্র এবং প্রথম কবি যিনি মহান আল্লাহকে বিভিন্নভাবে বিদ্রুপ করে সম্বোধন করেছেন। মির্যা গালিবের বিদ্রুপ সংক্রান্ত উর্দু কবিতার কিছু উদাহরন নিম্নে প্রদত্ত হলো-

تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے

لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جاں اور۔ [১১৫]

(তুমি শহরে আছ, তাতে আমার দুঃখ কি? চলে যাব যখন

Dhaka University Institutional Repository

বাজার থেকে আনব আরেকটি সুপ্রাণ হৃদয়।)

গালিব এ কবিতার মাধ্যমে প্রিয়তমার প্রতি বিদ্রুপাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রিয়ার কর্মকাণ্ডে ও ব্যবহারে এতোই দুঃখ পেয়েছেন যে, তাকে না পেলে অন্য আরেক সুহৃদয় প্রিয়তমাকে খুজে নিবেন। সে কথাই বিদ্রুপাত্মকভাবে তাঁর কবিতায় সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। কবি বলতে চান তুমি শহরে থাক তাই তোমার অহংকারটা একটু বেশি, তাতে আমি ভয় পাইনা, যদি তুমি আমার সাথে শহর ছেড়ে না যাও তাহলে আমি প্রেমের বাজারে গিয়ে অন্য আরেকটি সুপ্রাণ হৃদয়ের মানুষ কিনে নিবো।

গালিব মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিদ্রুপাত্মক মনোভাব পোষণ করেছেন। যা নিম্নবর্ণিত কবিতায় দৃশ্যমান হয়।

گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر

دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھکر۔[১১৬]

(আমার উপর বজ্রপাতের প্রতাপ পড়েছে

পড়েনি যে প্রতাপ তুর পাহাড়ে,

আমাকে মদের পাত্র দিয়েছে দুঃখ ও অপমান দেখে)

এখানে মহান কবি গালিব নিজের সীমাহীন অভাব ও দরিদ্রতার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিদ্রুপ করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন হে খোদা, তুমি আমাকে এতোই দরিদ্রতার মুখোমুখী করেছো যেন আমার উপর বজ্রপাতের গজব পরেছে। যা তুর পাহাড়ের উপর নিপাতিত প্রতাপ ও গজবের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক। তাই দারিদ্রতার এই অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই আমি মদের পিয়ালা হাতে নিয়েছি। যাতে আমার এই অপমানের সীমা একটু কমে যায়। এতো দরিদ্রতার মুখোমুখী ও দুঃখ কষ্টের স্বীকার না হলে আমি মদ পান করতাম না। গালিব আরেক জায়গায় বলেছেন-

واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو

کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی[১১৭]

(উপদেশ হিসাবে মদ পান করা এবং কাউকে পান করানো মানা।

তাহলে তোমার শরাবান তহুরার খবর কী?)

আলোচ্য কবিতায় খোদার প্রতি গালিবের বিদ্রুপাত্মক মনোভাব ফুটে উঠেছে। গালিব বলেন উপদেশ দাতাগণ নসিহত করেন যে, ইসলামে মদ পান করা বা কাউকে পান

Dhaka University Institutional Repository

করানো নিষেধ আছে। অর্থাৎ যত যাতনাই আসুক না কেন, কোনভাবেই মদপান করা যাবেনা। গালিব বলেন তাহলে আমার প্রশ্ন হে প্রভু তোমার শরাবান তাহুরার খবর কী? আমি কি শরাবান তাহুরা পাব? গালিব এভাবে খোদার প্রতি বিদ্রুপ পোষণ করেছেন।

মির্যা গালিব আরো বলেনঃ-

پانی سے سگ گزیدہ ڈرے جس طرح اسدؔ

ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔[১১৮]

(জলাতাঙ্ক রোগী যেমন পানি দেখে ভয় পায়

গালিব তেমনি দুস্কৃত মানুষ দেখে ভয় পায়।)

আলোচ্য কবিতাংশের মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি গালিবের বিদ্রুপের ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। গালিব বলেন, জলাতাঙ্ক রোগী পানি দেখে আক্রান্ত হওয়ার ভয় পায়, সে মনে করে যে, পানিতে পড়ে গেলে হলে নিশ্চিত তার বিপদ ঘটবে, গালিবও তেমনি মানুষের হিংসাত্মক আচরণ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারকে খুব ভয় পায়। কবি তাই মানুষের ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে মানুষের প্রতি বিদ্রুপ করে বলেছেন আমি মানুষকে সাংঘাতিক ভাবে ভয় করি।

গালিবের বিভিন্ন কবিতায় তাঁর প্রেমিক মনের ব্যঙ্গাত্ব ভাষা প্রকাশ পেয়েছে। এক কবিতায় তিনি বলেন-

وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت

کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔[১১৯]

(উনি এলেন আমার ঘরে, আল্লাহর কুদরতে

কখনো আমি তাকাই তার মুখের দিকে

আরেক বার আপন ঘরের দিকে।)

মহান কবি গালিব আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে তাঁর পছন্দের মানুষটির প্রতি ঔদ্বত্য ও রাগান্বিত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। গালিব বলেন প্রিয়তমার চেহারাটা এতো সুন্দর যে, মনে হয় আকাশের চাঁদ। একদিন হঠাৎ আমার বাড়ীতে তার সুভাগমন ঘটলো। আমি তাকে এতোই রূপসজ্জায় পেয়েছিলাম যে, আমি একবার তার চেহারার দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং আরেক বার আমার ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মনে হলো তার আগমনে আমার ঘরটিই যেন তাকে পেয়ে মহা খুশিতে নেচে উঠেছিল।

গালিব আরেক জায়গায় বলেছেনঃ-

Dhaka University Institutional Repository

دور بیٹھا غبار میر اس سے

عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔[১২০]

(দূর হতে চুম্বন করার পদ্ধতি বর্ণনা ঠিক না

আমি তাকে চুম্বন করার পদ্ধতি জিজ্ঞেস করেছিলাম)

কবি এখানে বলতে চান, আমি তাকে চুম্বন দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন সে দূর থেকে মুখের দুই ঠোট গোলাপ ফুলের মতো গোল করে ইশারা করলো এভাবে চুম্বন করতে হয়। কিন্তু দূর থেকে এভাবে ইশারা করার ঠিক নয়, এটি আদবের খেলাফ। তার উচিৎ ছিল কাছে এসে বলা যে, এভাবে চুম্বন করতে হয়। গালিব এভাবেই নিজের মনের ক্ষোভগুলী তুলে ধরেছেন তাঁর উর্দু কবিতায়।

## আত্মম্ভরিতা

মীর্যা গালিব রুচি ও আত্মসম্মানবোধের এক জাগ্রত প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তা ছিল তাঁর অন্তরাত্মার সবচেয়ে বড় পরিচয়। অপরের পদাঙ্ক অনুসরণকে তিনি তুচ্ছতা ও দুর্বলতার প্রতীক বলে মনে করতেন। অতিমাত্রায় স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁকে আত্মম্ভরী করে তুলেছিল। গালিব ছিলেন তুর্কী বংশদ্ভূত। তাঁর বংশ-গৌরব ছিল আভিজাত্য-মণ্ডিত। এটিও গালিবকে আত্মঅহংকারী করে তুলেছিল। এক কবিতায় তিনি বলেন-

غالب از خاک پاک تورانیم

لاجرم در نسب فرھمندیم[১২১]

( হে গালিব, তুরানের পবিত্র মাটি হতে তুমি উদ্ভুত

তাই তোমার উচ্চ বংশ-জাত।)

প্রেমের ক্ষেত্রেও গালিব তাঁর আত্মমর্যাদাবোধকে পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। প্রিয়াকে পাবার জন্য যেখানে অন্যদের দেখা যায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দিতে গালিব সেখানে ব্যতিক্রম। প্রিয়ার সাথে মিলনের আশায় তিনি নিজেকে বিলিয়ে দেননি। এখানেও আমরা গালিবের আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাই। যেমন গালিব বলেছেন-

دائم پڑا ہوا ترے در پر نہیں میں

خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہو میں۔[১২২]

Dhaka University Institutional Repository

(সর্বদা পড়ে থাকা তোমার দোয়ারে সে আমি নই

ধুলিময় এমন জীবনে পাথর আমি নই।)

গালিব ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁর জীবন পাঠে তা বুঝতে পাঠককে বেগ পেতে হয় না। নমুনাস্বরূপ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দিল্লি কলেজের ফারসির অধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় বন্ধুদের অনুরোধে এই পদের তিনি প্রার্থী হলেন। শিক্ষাসচিব টমসন সাহেব ছিলেন গালিবের গুণমুগ্ধ বন্ধু। চাকরি পাওয়ার জন্য তিনি পালকিতে চড়ে টমসনের বাংলোতে যান। কিন্তু টমসন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে এলেন না। এতে গালিব খুব অপমানবোধ করেন। ফলে গালিব টমসন সাহেবের সঙ্গে দেখা না করেই বাসায় ফিরে আসেন। তিনি আর পালকি থেকে নামেননি। অধ্যাপকের পদও গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর সংসারে তখন দারুণ আর্থিক অনটন চলছিল।

মির্যা গালিব একজন আত্মম্ভরি উর্দু কবি ছিলেন। তিনি ব্যাপক অহংকারী মানুষ হিসাবে কবি মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। গালিব নিজেকে অতি মাত্রায় বড় মনে করতেন। তিনি কাউকেই পাত্তা দিতেন না। শুধু গালিবই নয় দুনিয়ার সকল বড় মাপের লোকেরাই নিজের সম্মানকে সবচেয়ে বড় দেখেন এবং তাদের আশ-পাশের লোকদেরকে তারা খুবই তুচ্ছ মনে করেন। তারা দুনিয়ার মানুষদেরকে নিজেদের পছন্দমত ব্যবহার করতে চান। গালিবের বেলায় এ বিষয়টি আরো একটু বেশি ও ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। কারণ গালিব মনে করেন তার মতো এতো বড় মাপের মানুষ ও এতো উঁচু মর্যাদাবান কবি আর একজনও নেই। তিনি সর্বদাই নিজেকে নিয়ে গর্ব করতেন। এজন্য তাঁর লেখনির মধ্যে বার বারই তাঁর মহত্ত্ব ও অহংকারমূলক কথাবার্তা পরিলক্ষিত হয়।[১২৩]

গালিবের অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কিছু চিত্র আমরা এখানে আলোচনা করার প্রয়াস চালাবো।

এক কবিতায় গালিব নিজের সম্পর্কে বলেন:

آج بھی مجھ سا نہیں زمانے میں

شاعر نغز گوئے گفتار[১২৪]

(এই যুগে আমার মতো নেই কোন শ্রেষ্ট কবি

নেই কোন উত্তম গায়ক ও খোশ গল্পকার)

এখানে মির্যা গালিবের অহংকারের পরিচয় চিত্রায়িত হয়েছে। গালিব এ কবিতার মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট করেছেন যে, তাঁর সময় বা তাঁর যুগে এমন কোন কবির জন্ম হয় নাই যে

তাঁর চেয়ে সুন্দর করে গজল গাইতে পারে, সুন্দর সুর দিতে পারে বা খোশ গল্প বলে ভক্তদের খুশি করতে পারে। তার যুগে তিনি একমাত্র কবি, যিনি সবার চেয়ে উত্তম গজল গেয়ে শ্রোতা ও ভক্তদেরকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছেন। গালিব গর্ব সহকারে একথাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তাঁর সময়ে তাঁর সমকক্ষ ও তাঁর সাথে তুলনা করার মত আর কোন কবি নাই।

গালিব অন্য আরেক জায়গায় বলেন-

رزم کی داستان گر سینے

ہے زبان میری تیغ جوہر دار[১২৫]

(বক্ষে রয়েছে আমার সংগ্রামের শত কাহিনী

মুখে আছে তোমার তরবারির নৈপূন্যতা জানি।)

গালিব উক্ত শে'রের মাধ্যমেও নিজের বড়ত্ব ও অহংকার এবং আত্মমর্যাদার ইতিহাস ও কাহিনী তুলে ধরেছেন। তিনি সগৌরবে বলেন যে, জীবনে আমি অনেক সংগ্রাম করেছি, ধৈর্য্য ধরেছি কিন্তু পরাজয়ের কাছে কখনো মাথা নত করিনি, নিজেকে অন্যের কাছে কখনো ছোট করিনি, এজন্যই আমার জীবন সংগ্রামী। গালিব বুঝাতে চান, আমি আমার মুখের ভাষা দিয়ে, কাব্যিক নৈপুন্য দিয়ে যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছি।

এই কবিতায়ও গালিবের অহংকারের চিত্র ফুটে উঠেছে। মির্জা গালিব আরো একটু বেশি অহংকারের পরিচয় দিয়েছেন নিম্ন বর্ণিত কবিতায়ঃ-

بزم کا التزام گر کیجئے

ہے قلم میرا ابر گوہر بار[১২৬]

(যদি একান্তই কবিতার আসর বসানো হয়,

দেখতে পাবে আমার কলম ঝড় ও রত্ন হয়।)

গালিব ও পংক্তিটির মাধ্যমে অনেক বেশি অহংকারের ভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন যদি কবিদের নিয়ে কবিতার কোন মাহফিল বসানো হয় এবং সেখানে শের-শায়েরীর তুলনামূলক বাহাস-মুবাহাসা করা হয় তাহলে আমার কবিতার দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। একটি হলো সবার কবিতার মধ্যে আমার কবিতা ঝড় সৃষ্টি করবে। দ্বিতীয়টি হলো, সকলের কবিতার মোকাবেলা আমার কবিতা অধিক রত্ন-মাণিক মনে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা গালিবের একটি বিখ্যাত গজল আছে, যাতে গালিবের আত্মম্ভরিতার সমাবেশ ঘটেছে। গজলটি নিম্নরূপ-

بازیچۂ اطفال ہے دنیا میرے آگے

ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے[১২৭]

(আমার কাছে দুনিয়াটা ছোট বাচ্চাদের খেলনার মতো,

দিনরাত যা ঘটেছে সব কিছুই আমার কাছে তামাশার মতো।)

ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک

اک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے[১২৮]

(সুলায়মানের উড়ন্ত খাট আমার চোখে এক খেলনার মাত্র,

ঈসা মসীহের অলোক কীর্তি কিছুই না আমার কাছে।)

প্রথম কবিতাংশে মির্যা গালিবের যে বক্তব্য ফুটে উঠেছে তাতে গালিবের মতে দুনিয়াতে যত বিস্ময়কর ঘটনাই ঘটুকনা কেন যত অসাধারণ কিছুই আবিস্কৃত হোক না কেন গালিবের কাছে তা একান্তই খেল তামাশার বা ছেলে খেলার মত। শিশুদের খেলনার যেমন কোন স্থায়িত্ব নেই যত্রতত্রই ভেঙ্গে যায় একে বারেই ক্ষণস্থায়ী তেমনি দুনিয়া ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড। গালিবের কাছে দুনিয়ার কর্মকাণ্ড একেবারেই তুচ্ছ বিষয়। এখানে গালিবের হৃদয়ে অহংকার প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় কবিতাংশে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর বাদশাহীর ঘটনা ও তার অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে ঈসা (আঃ) এর জন্মের অলৌকিক কাহিনী। পিতা ছাড়া সন্তান জন্মের বিরল দৃশ্যপট। এরকম মুজিজাকে বর্ণনা করে গালিব এখানেও অহংকারি মনোভাব প্রদর্শন করেছেন। গালিব মনে করেন সুলায়মান (আঃ) যেভাবে উড়ন্ত খাটে বা তখতায় করে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াতেন, দেশ শাসন করেছেন এটা কোন ব্যাপারই নয়, এটি একটি খেলনার মতো, এরকম কাজ আমিও মুহূর্তেই ঘটাতে পারি। ঈসা (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অলৌকিক কর্মকান্ডে ও আরো যা কিছু আছে এসব কিছুই অতি সহজ ব্যাপার গালিবের কাছে। গালিব এভাবেই নিজের মর্যাদা ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

গালিব কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত আত্মম্ভরি হয়ে উঠতেন। যা তাঁর নিম্ন বর্ণিত কবিতায় দৃশ্যমান-

مت پوچھ کہ کیا حال ہے مرا ترے پیچھے

تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے مرا ترے آگے[১২৯]

(তোমার পেছনে ঘুরে আমার কি হাল, জিজ্ঞাসা করনা

বরং আমার কি রঙ হলো তাই দেখ সবার আগে।)

ایمان مجھ کو روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ مرے آگے ہے کیسا مرے آگے[১৩০]

(ঈমান যদি আমাকে থামিয়ে দেয়, কুফুর করে রুদ্ধগতি

কাবা আমার পিছনে, প্রতিমার দেবী আগে।)

গালিব আলোচ্য কবিতায় অতিমাত্রায় অহংকার প্রদর্শন করেছেন। তিনি ঈমান আকিদা বা খোদার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারেও অনুচিৎ কথাবার্তা ব্যাক্ত করেছেন। মুসলমানদের কিবলা কাবা ঘরের প্রতিও অসম্মান দেখিয়ে নিজের আত্মম্ভরিতার মাত্রা প্রকাশ করেছেন। গালিব বলেন ঈমান আমাকে থামিয়ে দেয় সকল ব্যাপারে তাইতো বাধ্য হয়ে আমি কুফুরিতে লিপ্ত হই। আর এজন্যই আমি অহংকার করেই কাবা ঘরকে পিছনে রেখে প্রতিমাকে সম্মান করি। গালিব এভাবেই তার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছেন। গালিব দুনিয়ার সাময়িক রূপ সৌন্দর্য কামনা-বাসনার পিছে পড়ে অহংকারী হয়ে ঈমান ছেড়ে কুফরিতে এবং কাবা ছেড়ে প্রতিমার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছেন। যা একজন মুসলমানের জন্য অনুচিৎ।

এক কবিতায় গালিব বলেন-

عاشق ہو پہ معشوق فریبی ہے مرا کام

مجنوں کو برا کہتی ہے لیلے مرے آگے۔[১৩১]

(প্রেমিক আমি, প্রেমের ছলনাই আমার কাজ,

Dhaka University Institutional Repository

লায়লা সামনে এলে মজনুকে দোষারোপ করে।)

এখানে গালিব বলেন আমি প্রেমের সাগরেই সর্বদা ভেসে বেড়াই। প্রেমের বেলায় তাই শুধু আমি ছলছাতুরি ও অভিমান করি। প্রেমিকার শুধু দোষ খুঁজি, যেমনিভাবে ইতিহাস বিখ্যাত প্রেমিক মজনু লাইলিকে কাছে পেলে তাকে দোষারোপ করতো। অর্থাৎ গালিব তার প্রিয়াকে এতো পছন্দ করেন যে, প্রিয়া কখনোই প্রেম দিয়ে গালিবের পাগল মনকে পূর্ন তৃপ্তি করাতে পারেনি। তাই গালিব অহংকারী হয়ে প্রিয়ার হাজারো দোষ খুঁজে বের করেছেন।

মির্যা গালিব অতি মাত্রায় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ বজায় রেখে চলতেন। কখনোই কোন ভাবেই তিনি নিজের আত্মমর্যাদাকে বিকিয়ে দেননি, অপরের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। গালিবের আর্থিক অবস্থা হয়ত ভালো ছিল না। কিন্তু তার পরও তিনি তার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেননি। তিনি শহরের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষের সাথে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন। তিনি শহরের বাজারে যাইতেন পালকিতে চড়ে এবং সাথে চাকর ও দেহরক্ষী নিয়ে চলতেন সম্ভ্রান্ত লোকদের মতো। সম্ভ্রান্ত শ্রেণির যে সকল মানুষ গালিবের বাড়ীতে আসত এবং সম্পর্ক রেখে চলতো গালিব তাদের বাড়ী যেতেন এবং তাদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

একদিন দেওয়ান ফজলুল্লাহ খাঁন মরহুম গালিবের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন গালিবের সাথে দেখা না করেই তিনি চলে গিয়েছেন। গালিব কোনভাবে জানতে পেরেছেন যে, দেওয়ানজি তার বাড়ীর পথ দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু তার বাড়ী আসেন নি। তাই গালিব দেওয়ানজির কাছে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিলো এরকম, আপনি আমার বাড়ীর গলি দিয়ে চলে গেলেন অথচ আমি আপনাকে সালাম করার জন্য উপস্থিত হতে পারলাম না। এই চিঠিটি যখনই দেওয়ানজির কাছে পৌছলো তিনি খুব লজ্জা পেলেন এবং সাথে সাথে গাড়ীতে করে মির্যা গালিবের সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন।

গালিব ছিলেন আভিজাত্যপূর্ণ জীবনের অধিকারী। অতি মাত্রায় আভিজাত্য থাকার কারণেই গালিব আত্মম্ভরি হয়ে উঠেছিলেন। আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্রতা ছিল তাঁর পোষাকেও তিনি মাথায় পড়তেন বেলুনওয়ালী লম্বা টুপি ও লম্বা কুর্তা বা জামা যাতে পরিলক্ষিত হতো ভিন্ন রকমের আভিজাত্যপূর্ণ ভাব। তাঁর খাবারের মেনুতে প্রিয় খাবার হিসাবে থাকতো আম, আচার, ডাল মোরব্বা, টালি কাবাব। তাঁর প্রিয় খেলা ছিলো সতরঞ্জ, চৌসার ও পতঙ্গবাজি। পোষাক পরিচ্ছদ, খাবার, খেলা সব কিছুতেই ছিল আভিজাত্য।

মির্জা গালিব নিজ আভিজাত্য ও নিজ কর্মের স্বীকৃতি নিজেই দিতেন এবং নিজের প্রশংসা নিজেই করতেন। এভাবেই তিনি নিজের গৌরব ও অহংকার প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে গালিব বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

ہم پیشہ و ہم مشرب ہم راز ہے مرا

غالب کہ برا کیوں کہو اچھا مرے آگے[১৩২]

(আমার আভিজাত্য আছে, আরো আছে ধর্ম কত রহস্য

গালিবকে মন্দ কেন বল? বরং গালিব বেশি ভালো।)

গালিব এখানে নিজের বংশ আভিজাত্য, কৌলিন্য ও ঐতিহ্যের বড়াই করেছেন। নিজের ধর্ম কর্ম ও ভালো কাজের জাহির করে অহংকারের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলতে চান আমার এতো ভালো ভালো গুণ গরিমা আছে। সমাজে সুনাম ও খ্যাতি আছে এরপরও কেন মানুষ আমাকে মন্দ বলে? মানুষের উচিৎ আমাকে সাধু হিসাবে ও সৎব্যক্তি হিসাবে মূল্যায়ন করা। কিন্তু আমি যাদের হিতাকাঙ্ক্ষি হই, যাদের বেশি কল্যাণকামী হই, যাদের বেশি উপকার করি তারাই আমাকে গালমন্দ করে। তাদের আমার সম্পর্কে এরকম বাজে মন্তব্য করা মোটেই ঠিক নয়। গালিব এভাবেই তাঁর উর্দু কাব্যে নিজের আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়েছেন।

গালিব দেখতে ছিলেন অনেক সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাইতো ছিলো তাঁর অনেক বন্ধু বান্ধব তাদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন, আড্ডা দিতেন। আড্ডার আসরে থাকতো উন্নতমানের খাবার, থাকতো উন্নতমানের পানীয়। সে সময়ে গালিব দিল্লির আকাশে মনের আনন্দে পায়রা উড়াতেন। এসব কিছু গালিবের জীবনে প্রভাব বিস্তার করার কারনেই তিনি সমাজের সবার চাইতে একটু আলাদা রুচি ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। আর সে জন্যই তাঁর কাজ কর্মে কথা বার্তায় আত্মম্ভরিতার প্রকাশ ঘটেছে। [১৩৩]

এক কবিতায় গালিব বলেন-

سچ کہتے ہیں خود بین و خود آرا ہوں نہ کیوں کہو

بیٹھا ہے بت آئینہ سینہ مرے آگے[১৩৪]

(সত্যি বলছি আমার আছে যত রূপ-অহংকার নেই কারো আর

প্রেমিকা অপেক্ষমান দেখা যায় আমার হৃদয়ের আয়নায়।)

গালিব এ কবিতায় নিজের সুন্দর অবয়ব সুঠাম দেহ এবং আকর্ষণীয় চেহারার বড়াই প্রকাশ করেছেন। তাঁর সুনাম খ্যাতি ও নাম-জশের পরিচয় নিয়ে চরম অহংকারী হয়ে উঠেছেন। তিনি গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে বলেন আমার মতো এতো সুন্দর চেহারা, এতো

*Dhaka University Institutional Repository*

গৌরব ও ঐতিহ্য অন্য কারো নেই। আমার সুন্দর চেহারা দেখে অগণিত সুন্দরী রমণীরা আমার সাথে প্রেম নিবেদনের অপেক্ষায় দন্ডায়মান যা আমি হৃদয়ের আয়নায় দেখতে পাই।

মির্যা গালিব অহংকারী হওয়ার আরো একটি অন্যতম কারণ ছিলো তিনি জীবনে অনেক রাজকীয় সম্মান ও উপাধি লাভ করেছিলেন। গালিবের অসাধারণ বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, সময় উপযোগী কথাবার্তা ও পরামর্শ দানের জন্য এবং বিদগ্ধ কাব্য প্রতিভা ও কাসিদা লেখার জন্য ১৮৫০ সালে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর গালিবকে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে 'দবির উল মূলক' উপাধি প্রদান করেন। এরপর নতুন বাদশাহ যোগ করলেন আরো একটি রাজকীয় সম্মান ফলক: 'নজম-উদ-দৌলা' অর্থাৎ কবিতার অধীশ্বর। এছাড়াও গালিবকে আরো একটি রাজকীয় সম্মান 'মির্যা নওশা' প্রদান করা হয় । সভাসদদের মধ্যে গালিবের আসনটি চিহ্নিত থাকতো। বাহাদুর শাহ গালিবকে এতোই ভালোবাসতেন যে, তিনি গালিবকে সভাকবির পদ ছাড়াও নিজের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া মোগল দরবারের ঐতিহাসিক হিসাবেও ছিলো তাঁর অনেক সম্মান। এসব কারণে রাজকোষের অর্থ দিয়ে তাঁর রাজকীয় জীবনযাপন অতিবাহিত হত। এতো মর্যাদা ও সমাদরের কারণেই গালিব আত্মম্ভরির অধিকারী হয়েছিলেন। [১৩৫]

মির্যা গালিব তাঁর শিক্ষা দিক্ষা ও জ্ঞান ও গরিমা নিয়েও বড়াই করেছেন। গালিব তাঁর শিক্ষা গুরু হারম্জদ ও তার কাছে থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা নিয়েও অহংকার করেছেন । মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালীর মতে হারম্জদ গালিবের সঙ্গে দিল্লী পর্যন্ত গমন করেছিলেন। গালিব ফারসীতে এতখানি পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন যে, একাধিক পত্রে তিনি এ নিয়ে গর্ব করে বলেছেন, "আমি ফারসির পন্ডিত" "ফারসির মানদন্ড আমারই হাতে রয়েছে।" [১৩৬]

জানা যায় যে গালিব তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের সুপন্ডিত ছিলেন। আরবি ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল, কিন্তু আরবির পণ্ডিত বলে তিনি কখনোই দাবি করেননি। গালিব লিখেন "আমি আরবির পণ্ডিত নই, কিন্তু তাই বলে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নই।

চিকিৎসা শাস্ত্রে গালিবের দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। তিনি যথারীতি চিকিৎসক না হলেও এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা যে নগন্য ছিল না তার প্রমাণ এই যে, একদা তিনি নওয়াব কাল্ব-ই-আলীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন ও দুষ্প্রাপ্য রাসায়নিক বস্তু সমূহের সহযোগে তাঁকে ঔষধ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি নওয়াবকে লিখেছিলেন "আমি চিকিৎসক নই, কিন্তু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ বটে।" জ্যোতিস্ক বিদ্যাও গালিবের চিত্ত বিনোদনের এক বিশেষ সামগ্রী ছিল। সে বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত মতামতও শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হতো।

Dhaka University Institutional Repository

এতো বহুবিদ শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারনেই গালিব অহংকারী মনোভাব প্রকাশ করেছেন। [১৩৭]

এক কবিতায় গালিব বলেন-

پھر دیکھے انداز گل افشانی و گفتار

رکھ دے کوئی پیانہ وصہبا مرے آگے [১৩৮]

(তাকিয়ে দেখ বিস্তৃর্ণ ফুল বাগান, শুন আরো যত কথা,

আঙ্গুরী মদ্য পানপাত্র রাখো আমার হেথা।)

গালিব উল্লিখিত কবিতার মাধ্যমে নিজের সাহিত্য সম্ভার ও কাব্য জগতকে ফুল বাগানের সাথে তুলনা করেছেন। শিক্ষার নানাবিদ বিষয়কে বাগানের একেকটি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন। নিজের শিক্ষাকে নিজেই স্বীকৃতি দিয়ে অহংকার প্রকাশ করেছেন। আর অতি উৎসাহিত মনে উন্নতমানের মদ্যপানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন আমার জন্য আঙ্গুরের তৈরি উন্নতমানের মদ ও পানপাত্র মজুদ রাখো।

মির্যা গালিব তার পিতার মৃত্যুর পর থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত মাতুলালয়েই অতিবাহিত করেছেন এবং অতি প্রাচুর্যের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন। মাতুলালয়ের এই স্নেহ আদরের মধ্যে অতি সহজেই তিনি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন ও যৌবনের শুরুতে এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও নিরঙ্কুশ বিলাসিতার মধ্যে স্বীয় স্বার্থ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় অনেক বন্ধু বান্ধবের সাথে খেলা-ধুলা আমোদ প্রমোদ, সুরা পানে মত্ত হয়ে রজনী যাপন করতেন বলে জানা যায়। এসব বন্ধুদের উৎসাহে ও প্ররোচনায় গালিব প্রেমের উচ্ছলতায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন এবং অতি অহংকারী হওয়ার কারণে বিরহী জীবনও কাটিয়েছেন। [১৩৯]

যা নিম্ন বর্ণিত কবিতায় দৃশ্যমান-

جوش ہوتے ہیں ہر وصل میں یوں مر نہیں جاتے

آتی ہے شب ہجران کی تمنا مرے آگے [১৪০]

(মিলনে খুশি তবে তাতে মরে না কেউ

আলোর চাওয়া তাই শুধু বিরহের রাতে।)

গালিব প্রেমের বেলায় সর্বদা বিরহী। তিনি কখনো মিলনের স্বাদ প্রেমের মেলায় সাক্ষাৎ পাননি। প্রিয়ারা গালিবকে শুধু প্রতারণার চেহারাই প্রদর্শন করেছে। গালিব তাই এসব

Dhaka University Institutional Repository

বিরহের কারনেই অহংকারী। তিনি বলেন প্রিয়ার মিলন ঘটলে আমি খুব খুশি হতাম, তবে প্রিয়া যদি আমার জীবনে একবার কোন দিন দেখা না দেয় তাহলে আমি একদম মরে যাব না। প্রিয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলে আমি বিরহী জীবন যাপন করবো এতে আমার সামান্যতম আফসোস নেই। গালিব এভাবেই উর্দু কবিতার মাধ্যমে নিজের আত্মম্ভরিতা বর্ণনা করেছেন।

গালিব সর্বস্থানে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন। মাতুলালয়ে অনেক সুখ-শান্তি ও আভিজাত্যতা থাকা সত্ত্বেও গালিব সেখানে সারা জীবন অবস্থান করাকে আত্মমর্যাদার বিপরীত বলে মনে করেছেন। গালিব তাই রিজিকের সন্ধানে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য মাতুলালয় ত্যাগ করে দিল্লিতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। সম্ভবত মাতামহের মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে মাতুলদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয়নি অথবা অপরের আশ্রয়ে থাকার অনুভূতি তাঁর আত্মসম্মান আঘাত করেছিলো। [১৪৭]

পরিশেষে এ আলোচনার মাধ্যমে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, রুচি ও আত্মসম্মানবোধের এক জাগ্রত প্রতিমূর্তি ছিলেন মির্যা গালিব। মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত চিন্তা ছিল তাঁর অন্তরাত্মর সবচাইতে বড় পরিচয়। অপরের পদাঙ্ক ও নিয়ম-নীতির প্রতি অনুগত হওয়াকে তিনি তুচ্ছ ও দুর্বলতার প্রতীক বলে মনে করতেন। গালিবের অতিমাত্রায় স্বাধীনতা প্রিয়তাই তাঁকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মম্ভরী করে তুলেছিল। তাঁর আত্মম্ভরিতার হাত তেকে অনেক সময় তাঁর নিজস্ব আত্মিয়-স্বজনরাও নিস্তার পায়নি। গালিব এভাবেই তাঁর আত্মমর্যাদা ও অহংকারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য ভাণ্ডারের মাধ্যমে।

## ইতিহাসচেতনা

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ভাঙ্গা-গড়ার শতাব্দী। এ শতাব্দীতে যেমন ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের শেষ পদীপটুকু নিভে গিয়েছে, তেমনি তারই উপরে গড়ে উঠেছে একটি নয়া সাম্রাজ্যের ইমারত। এই প্রক্রিয়াটি মোটেই শান্তিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়নি। ১৮৫৭'র বিদ্রোহের পরে মোগল সাম্রাজ্যের পতন এইসব ঘটনারই দ্যোতক। গালিব ছিলেন এই শতাব্দীর একজন সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। বলা যায়, ঊনবিংশ শতকের এই ভাঙ্গা-গড়ার তিনি ছিলেন একজন প্রত্যক্ষদর্শী।

১৮৫৭ সালে সারা হিন্দুস্তানে সিপাহীদের জাগরণ ঘটে। ষাট বছরের বর্ষীয়ান গালিব তখন কবিখ্যাতির শীর্ষে এবং দিল্লিতেই তাঁর অবস্থান। ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হয়। বিজয়ী ইংরেজ ফৌজ দিল্লিতে ব্যাপক গণহত্যা চালায়, নগর পুড়িয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে, জামে মসজিদের উপাসনা প্রাঙ্গণে সেনা ছাউনি বসায়, দিল্লি তথা শাহাজানাবাদ পরিণত হয় লাশের নগরীতে। গালিব সেসময় তাঁর বিল্লিমারান গলির বাড়িতে ভগ্ন হৃদয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন। বিপ্লবকালে তিনি দেখেছেন তাঁর কিছু

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধুর অসহায় মৃত্যু। এতে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁদে উঠে। রক্তাক্ত তাঁর হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসা গযলের এই দুটি পদে সেই শোক উচ্চারিত হয় এভাবে-

یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں

دیکھنا بستیوں کو تم کہ ویران ہو گئیں[১৪১]

(এভাবে যদি কাঁদতে থাকে গালিব, তবে হে জগতবাসী

দেখ সে জনপদ বিরান হয়ে যাবে।)

ঐতিহাসিক চেতনা ব্যতীত জীবন ও শিল্প উভয়ই অর্থহীন। এজন্যই আমরা গালিবের মধ্যে গভীর ইতিহাসবোধ লক্ষ্য করি। তাঁর মধ্যে আমরা অতীতকে আহত ও রক্তঝরা রূপে দেখতে পাই। একটি সুশোভিত উদ্যানের পত্রঝরা আমাদের ব্যথিত করে। তবে ভবিষ্যতের সফলতা অতীতের গৌরববোধ থেকেই জন্ম নিতে পারে। গালিব বলেন-

قید میں یعقوب کو گو نہ یوسف کی خبر

لیکن آنکھیں روزن دیوار زنداں ہو گئیں

جوئے خون آنکھوں سے بہنے لگے دو کہ ہے شام فراق

میں یہ سمجھونگا کہ شمعین دو فروزاں ہو گئیں۔[১৪২]

( যদিও ইয়াকুব নেয়নি কয়েদখানায় বন্দী ইউসুফের খবর,

তবু তার আকুলতা চোখ পেতে রাখে আলোক-ছিদ্র যথা

আঁখি জল ধারা বইতে দাও গো বিরহের কালো রাতে

এ দুটি উজ্জ্বল বাতির আলোক জাগুক আমার সাথে।)

দূর মিসরের এক কয়েদখানায় বন্দী রয়েছেন ইউসুফ, পিতা ইয়াকুব তার খবর নিচ্ছেন না। কিন্তু এই অপবাদ সত্য নয়। কয়েদখানায় নিবিড় অন্ধকার গৃহের দেয়ালে যে আলোকছিদ্র রয়েছে, সেই আলোকছিদ্রই যে ইয়াকুবের নির্নিমেষ চাহনি। প্রিয় পুত্রের তীব্র মায়াই তো ইয়াকুবকে বাঁচিয়ে রাখবে। আলোচ্য কাব্যাংশটি গালিবের ইতিহাস চেতনার এক অনবদ্য কাব্যরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা গালিব একজন ইতিহাস সচেতন কবি ছিলেন, সে কথারই প্রমাণ মিলেছে উপরোক্ত কবিতায়। গালিব এখানে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ণ ঘটনা আলোচনা করেছেন এবং তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন। গালিব বলেন বিদ্রোহীদের তাণ্ডবলীলা চালানোর সময় কিছু অসহায় ভীরু মানুষ যারা ইংরেজদের অধীনে কর্মরত ছিল। তারা যুদ্ধ বা মারামারি, ঢাল-তরবারি ও তীর ধনুকের কোন পার্থক্যই বুঝে না আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন।

গালিব বলেন এ করুণ সময়ে আমি নিজ গৃহে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বসে ছিলাম। হঠাৎ বিকট গোলাগুলি ও হৈ চৈ এর আওয়াজ শুনতে পাই। এর কারণ জানার চেষ্টা করলাম, জানা গেল কেল্লার ভেতর বিদ্রোহীরা প্রবেশ করে ইংরেজ এজেন্ট এবং কেল্লা রক্ষককে হত্যা করেছে। চারিদিকে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ছুটাছুটির আওয়াজ শুনা গেল। পুরো দিল্লীর ভূপৃষ্ঠ ইংরেজদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাগানের সর্বত্র প্রতিটি আনাচে কানাচে বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তুপে সাহসীদের সমাধি তৈরি হয়েছে। [১৪৩]

দিল্লির বাদশাহ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। বিদ্রোহী সৈন্যরা সেনা পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। বাদশাহ অসহায় অবস্থায় পতিত হন। বাদশাহকেও সৈন্যরা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় যেন চন্দ্রগ্রহণ চাঁদকে গ্রাস করেছে। দিল্লী শহরের ভেতরে ও বাইরে প্রায় ৫০ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য ছিল তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও অপেক্ষায় দন্ডায়মান। ইংরেজরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাহাড়ি এলাকায় একটি মজবুত সামরিক পরিখা তৈরি করছিল। পরিখার চারপাশে সারি সারি তোপ বসানো হয়েছিল এবং ধৈর্য্যের সাথে প্রতিরোধের অপেক্ষায় ছিল। অন্যদিকে নগর প্রাচীরের ওপর কামান বসানো হয়েছিল, এভাবেই ইংরেজরা বিদ্রোহী কমান্ডারদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের দাঁড় করায়।

বন্দুক ও তোপের গোলার ধোঁয়ায় মনে হয়, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটায় ছেয়ে গেছে এবং আকাশ থেকে শিলাবৃষ্টি পড়ছে। রাত দিন দু'পক্ষের গোলা বিনিময় দেখে মনে হয়, উপর থেকে পাথর বর্ষিত হচ্ছে। যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হলো। ইংরেজরা বিজয়ী বেশে দিল্লী প্রবেশ করল। মুসলমানদের গ্রেফতার করে কয়েদখানায় ভরলো এবং কত হাজার মুসলিম ফৌজকে হত্যা ও ফাঁসি দিয়েছে তার হিসাব নেই। তারা জালাও পোড়াও হত্যা ও ধ্বংস চালিয়ে দিল্লীকে মুসলিম বিরান ভূমিতে পরিণত করেছিল। গালিব এভাবেই তার কবিতার মাধ্যমে দিল্লির সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। [১৪৪]

হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন মহান আল্লাহ তায়ালার একজন পয়গম্বর। হযরত ইউসুফ (আঃ) ও ছিলেন আল্লাহ তায়ালার একজন নবী ও পথ প্রদর্শক। তিনি ইয়াকুর (আঃ) এর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা-দিক্ষা ও দেখা-শোনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর বুদ্ধিমত্ত্বা ও দক্ষতার কারণে ইয়াকুব (আঃ) তাকে অনেক আদর স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। এটি ইউসুফের (আঃ) এর অন্যান্য ভাইয়েরা ভালো

Dhaka University Institutional Repository

চোখে দেখতে পারলেন না। তারা ইউসুফের শত্রুতে পরিণত হলো। বড় ভাইয়েরা ফন্দি আঁটলো ইউসুফকে হত্যা করার জন্য একদা তারা ষড়যন্ত্র করে ইউসুফকে গহীন কুপে ফেলে দিলো। বাড়ী ফিরে পিতা ইয়াকুব (আঃ) কে বললো যে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পিতা ইয়াকুব পুত্র শোঁকে কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৃষ্টিহীন হয়ে গেলেন। খোদার অসিম কুদরাতে ইউসুফ (আঃ) গহীন কুপ থেকে রক্ষা পেয়ে অজানা পথ ধরে মিশরে গিয়ে পৌঁছান। সেখানে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসায় চাকুরি নেন। তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন সুন্দরী রমনী জুলায়খা। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁকে আবদ্ধ করা হয় মিশরের কারাগারে। কিন্তু মিশরের বাদশা আজিজে মেসরের স্বপ্নের সঠিক ও মনপুত ব্যাখ্যা প্রদান করেন কয়েদখানায় বসে। বাদশাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে মুক্তি দান করেন। সীমাহীন জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে বাদশাহ তাকে মিশরের খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। দায়িত্ব পেয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) মিশরের খাদ্যাভাব পূরণ করে আরো কয়েক বছরের খাবার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হন। এসব ইসলামিক ঐতিহাসিক ঘটনা যেমনিভাবে কুরআনে হাদীসে পাওয়া যায় তেমনি ভাবে দৃশ্যায়িত হয়েছে গালিবের উপরোক্ত কবিতা দু'টিতেও।

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় আরো অনেক নবী রাসূল বাদশাহ ও ঐতিহাসিক ইসলামী ব্যক্তিত্বদের ইতিহাস ও ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়।

গালিব এক কবিতায় বর্ণনা করেন-

کیا فرض ہے کہ سب کو ملے اک سا جواب

اور نہ ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی[১৪৫]

(কি এমন সত্য কথা, যে একই উত্তর মিলবে সব প্রশ্নের

তার চেয়ে চলো সবাই মিলে তুর পাহাড়ে বেড়াতে যাই।)

এখানে হযরত মূসা (আঃ) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মির্যা গালিব উপরোক্ত কাব্যাংশে আল্লাহর অন্যতম এক রাসূল হযরত মূসা (আঃ) এর সময়কার ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) প্রায়ই আল্লাহর সাথে কথা বলতেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালার সাথে মূসা (আঃ) এর কথোপকথনের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তায়ালা মূসা (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেন-"হে মুসা! তোমার ডান হাতে কী? মুসা (আঃ) বললেন, এটি আমার লাঠি, এটি দ্বারা ভর করে আমি পথ চলি এবং এটি দিয়ে গাছের পাতা ছিড়ে ছাগলকে খাওয়াই আরো অনেক কাজকর্ম সম্পাদন করি"। একদা হযরত মূসা (আঃ) মহান আল্লাহকে দেখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে দাওয়াত করলেন کوہ طور অর্থাৎ তূর পাহাড়ে পাদদেশে আসার জন্য। মূসা (আঃ) کوہ طور এ আগমন করলে আল্লাহর নূরের এক ঝলকেই সমগ্র তুর পাহাড় পুরে তামা এবং ছাই হয়ে গেলো।

Dhaka University Institutional Repository

এই হলো হযরত মূসা (আঃ) এবং প্রভূ দর্শনের চিত্র। গালিব এখানে ইসলামিক ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামী সাহিত্যের মিষ্টিক দিশারী হযরত খিজির। কথিত আছে, বাদশাহ সিকান্দার আবে হায়াতের অন্বেষণে ছিলেন। বাদশাহ খিজিরের সাক্ষাত লাভ করে তাঁকে আবে হায়াতের সন্ধান দিতে বলেন। খিজিরের নির্দেশনা পেয়েও বাদশাহ আবে হায়াত খোঁজ করে তার তীরে পৌঁছতে পারেননি। এই দিকে ইঙ্গিত করে গালিব বলেন-

کیا خضر سکندر سے

اب کیسے رہنما کرے کوئی[১৪৬]

( সিকান্দারের জন্য খিজির কতই না করলেন

এখন আর কাকে দিশারী করবে বল ?)

গালিব অন্য আরেক জায়গায় বলেন:

لازم نہیں کہ خضر ہم پیروی کریں

جانا کہ ایک بزرگ، ہمیں ہم سفر ملے[১৪৭]

খিজিরের হুবহু অনুকরণকারী হওয়া জরুরি নয় মানলাম

একজন বুজুর্গের সফর সঙ্গী ছিলাম এটা যেভাবে মানলাম।

আলোচ্য কবিতা দুটিতে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণ করা হয়েছে। প্রথম কাব্যাংশে হযরত খিজির (আঃ) এবং বাদশাহ সিকেন্দারের অনুভূতি ইচ্ছা আকাঙ্খা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গালিব এ কবিতায় বিশেষ ভাবে এ কথাই তুলে ধরেছেন যে, মহান আল্লাহ তায়ালা হযরত খিজির (আঃ)কে দীর্ঘায়ু দান করেছেন। তিনি আজও বেঁচে আছেন। বাদশাহ সিকেন্দারেরও ইচ্ছা আবে হায়াত পান করবে এবং সে সারা জীবন বেঁচে থাকবে। এজন্য তিনি হযরত খিজির (আঃ) এর কাছে আবে হায়াতের সন্ধান প্রার্থনা করলেন। খিজির বাদশাহকে এ ব্যাপারে অনেক উপদেশ ও পরামর্শ ও দিয়েছিলেন কিন্তু বাদশাহ সিকান্দার আবে হায়াত খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় কবিতাংশে মির্যা গালিব হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত খিজির (আঃ) এর সফরের ইতিহাস ও ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে জানা যায় যে, হযরত মুসা (আঃ) অনেক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। একদা কোন এক সমাবেশের বক্তৃতায় মূসা (আঃ) বললেন আমার যুগে আমিই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, কারণ আমি আল্লাহর নবী। মূসা

Dhaka University Institutional Repository

(আঃ) এর বক্তব্যে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হলেন, এবং মূসা (আঃ) এর প্রতি নির্দেশ দিলেন যে দুনিয়াতে তোমার চেয়ে আরো জ্ঞানী রয়েছে তাকে তুমি খুঁজে বের কর এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ কর। হযরত মূসা (আঃ) অনেক সন্ধান চালালেন জলে-স্থলে সেই মহাজ্ঞানী লোককে বের করতে। চেষ্টায় সফল হলেন, খিজিরকে খুঁজে পেলেন।

তাঁর সফর সঙ্গী হলেন জ্ঞান আহরণের জন্য কিন্তু পূর্ণ জ্ঞান তাঁর নিকট থেকে আহরণ করতে পারলেন না। কারণ মূসা (আঃ) খিজিরের বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দেখে অস্থির হয়ে গেলেন। মূসা (আঃ) তাকে আর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারলেন না।

হযরত খিজিরের প্রথম পদক্ষেপ নিখুঁত নৌকাকে খুঁত করে দেওয়া এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ নিষ্পাপ সন্তানকে হত্যা করা এর ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যত জ্ঞান সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) কে অবহিত করলেন, আরো অবহিত করলেন ভাঙ্গা প্রাচীরকে পূর্ণ নির্মাণ করার কাহিনী। এ পদক্ষেপ গুলীর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

প্রথম পদক্ষেপের ব্যাখ্যা হলো- খিজির (আঃ) ও মুসা (আঃ) যে নৌকা দিয়ে নদী পার হলেন সে নৌকাটি ছিলো এক হত দরিদ্র লোকের। সে যুগের বাদশাহ ছিল অত্যাচারি। বাদশাহ নিখুঁত নৌকাগুলী এক সময় গ্রাস করে নিতো তাই খিজির (আঃ) নৌকাটি খুঁত করে দিলেন যাতে অত্যাচারি বাদশাহ তার নৌকাটি না নেয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপের ব্যাখ্যা হলো শিশু সন্তানটি বড় হলে পাপ কর্মে লিপ্ত হতো। তাদের পিতামাতা ছিলো খুবই ভালো। ভবিষ্যতে পিতামাতার অবাধ্য হবে বিধায় আল্লাহর অনুগ্রহে খিজির (আঃ) শিশু দুটিকে হত্যা করেছিলেন। আর তৃতীয় পদক্ষেপ এর ব্যাখ্যা হলো প্রাচীরের নিচে মণি-মুক্তার বা স্বর্নের খনি লুকায়িত ছিলো যার মালিক বৃদ্ধ কিন্তু তার সন্তানেরা শিশু, যাতে তার সন্তানগুলী প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে সে সম্পদের মালিকানা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য হযরত খিজির (আঃ) ভাঙ্গা প্রাচীরটিকে পূর্ণ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এসকল অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে হযরত মুসা (আঃ) এর কোন ধারনাই ছিলো না। তিনি এ ভবিষ্যত ও পূর্বজ্ঞানসমূহ হযরত খিজির (আঃ) এর নিকট থেকে প্রাপ্ত হলেন। মির্যা গালিবের আলোচ্য কবিতায় এদিকেই ইঙ্গিত করে রচিত হয়েছে। [১৪৮]

গালিবের ইতিহাসচেতনার বিশেষ একটি লক্ষনীয় দিক হল, তাঁর কাব্যে বেশকিছু ঐতিহাসিক ইসলামী ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁদের কয়েকজন যেমন- হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মরিয়ম (আঃ), হযরত খিজির (আঃ), বাদশাহ সিকান্দার, ইরানের বাদশাহ জামশেদ প্রমুখ। উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতাংশ উদ্বৃত করা হল-

ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک

اک بات ہے اعجاز مسیحا مرے آگے [১৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

(সুলায়মান উড়ন্ত খাট আমার চোখে না যাচে

ঈসা মসীহেব আলোক কীর্তি কিছু না আমার কাছে।)

উপরোক্ত কবিতাংশে মির্যা গালিব আরো দু'জন ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নবী সম্পর্কে ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন করেছেন। একজন হলো হযরত সুলায়মান (আঃ) আর অন্যজন হলো হযরত ঈসা (আঃ)। নিম্নে তাদের সময়কার কিছু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরছি-

হযরত সুলায়মান (আঃ) সে যুগে সারা পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিভিন্ন ভাষাগত জ্ঞান, বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও দূর্দশিতা দান করেছিলেন। তিনি মানুষ সহ সকল পশু পাখীদের ও জীন জাতীর ভাষাও বুঝতেন। তিনি একাই সারা দুনিয়ার বাদশাহী করতেন, সেক্ষেত্রে তাঁর কোন সহযোগী ছিলো না। তার কোন কার্যনিবাহী বা মন্ত্রিপরিষদ ছিলো না। মহান আল্লাহ তাকে একটি উড়ন্ত তখ্ত বা সিংহাসন দান করেছিলে এবং বার্তাবাহক হিসাবে একটি হুদহুদ পাখি পাঠিয়ে ছিলেন। এই উড়ন্ত সিংহাসনে চড়েই সারা বিশ্ব শাসন করতেন আর মাঝে মধ্যে হুদহুদ পাখির মাধ্যমে বিভিন্ন খবরাখবর আদান প্রদান করতেন। জরুরি কোন কাজের প্রয়োজন হলে তিনি জিন সরদারকে নির্দেশ দিতেন সাথে সাথে তাঁর সকল কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যেত। মাসজিদে আকসার মতো বিশাল ধর্মীয় গৃহ জীন দ্বারা নির্মাণ করিয়েছেন অথচ তিনি সে সময় মৃত ছিলেন কিন্তু জিনেরা বুঝতেই পারেনি তিনি মৃতাবস্থায় লাঠি ভর করে দাড়িয়ে আছেন।

হযরত সুলায়মান (আঃ) এর বাদশাহী সম্পর্কে ইরানের কবি সেখ সাদী বলেন-

بسلیماں داد ملک سروری

شد مطیع خاتمش دیو و پری[১৫০]

(সুলায়মানকে আল্লাহ দান করেছিলেন বাদশাহী ও সিংহাসন

দেও-দানব ও পরী সহ সকল সৃষ্টিকে তাঁর অনুগত করেছিলেন।)

তার সময়ে দুনিয়া জুড়ে কোন অশান্তি হানাহানি ও অন্যায় ছিল না। পুরো দুনিয়া ব্যাপী শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত ছিলো।

হযরত ঈসা (আঃ) এর অলৌকিক ইতিহাস হলো, তিনি মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে পিতা ছাড়াই হযরত মারয়াম (আঃ) এর উদরে জন্মগ্রহন করে পৃথিবীতে আগম করেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ জ্ঞান ও হিকমত সহকারেই এবং আসমানি কিতাব সহকারে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তার সকল কর্মকাণ্ড দেখে সে যুগের সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা গালিব হযরত ঈসা (আঃ) এবং মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ) এর ইতিহাসও বর্ণনা করেছেন যা তাঁর উর্দু কবিতায় সুনিপুণভাবে ধড়া পড়েছে। এমনি কিছু উর্দু কবিতা গালিবের দিওয়ান থেকে নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ابن مریم ہوا کرے کوئی

میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

بات پرواں زبان کٹتی ہے

وہ کہیں اور سنا کرے کوئی

نہ سنو گر برا کہے کوئی

نہ کہو گر برا کرے کوئی[১৫১]

(মরিয়ম পুত্র জন্ম নিল কীভাবে

আমার ব্যাথ্যার শিফা মিলবে কীভাবে।

মাতৃক্রোরে মুখের ভাষা মুখে শুনা যায়,

এমন কাহিনী আর কি কোথাও শুনা যায়।

শুনবেনা তার কথা যদি মন্দ বলে কেউ,

বলবেনা কিছু, যদি মন্দ করে কেউ।)

উপরিউল্লিখিত কবিতাগুলিতে মির্যা গালিব হযরত মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আঃ) এর ব্যাপারে বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে সবাই আশ্চার্যন্বিত হয়ে পড়েন। সবার অভিপ্রায় হলো দুনিয়াতে কীভাবে পিতাহীন পুত্রের আগমন ঘটতে পারে? এটা কিভাবে সম্ভব? কুচক্র মহল হযরত মরিয়ম (আঃ) কে নিয়ে অনেক আজে বাজে মন্তব্য করা শুরু করল। এতে হযরত মরিয়ম (আঃ) মনে অনেক ব্যাথা পেলেন। বদনাম ঘুচানোর জন্য দূর নির্জনে গিয়ে আবাসন স্থাপন করলেন মরু খেজুর গাছের তলায়। পুতপবিত্র ও সধবা নারীর প্রতি অপমানজনক কুমন্তব্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন ভাবেই সহ্য হলো না। মহান প্রভু কুমতলব ও কুচক্রকারীদের দাঁত ভাঙ্গা উত্তর প্রদানের জন্য মাতৃক্রোরের অবুঝ শিশুর যবান খুলে দিয়ে তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। শিশু ঈসা (আঃ) মায়ের কোল তেকে স্বউচ্চস্বরে বলে উঠলেন- "আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হিকমত ও শক্তি প্রদান করেছেন, আল্লাহ আমাকে আসমানি কিতাব দান করেছেন।" সাবধান:আমার পুত পবিত্র মাতার প্রতি বদমন্তব্য করার সাহস তোমাদের কে দিয়েছে?"

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ তায়ালা তাইতো হযরত মরিয়ম (আঃ) কে খুব মায়া করে বলেছেন হে মরিয়ম, বদ চরিত্রের মানুষেরা যদি তোমাকে কোন খারাপ কথা বলে তা তুমি কানে শুনবে না। তারা যদি কোন খারাপ কাজ করে তাদেরকেও তুমি কিছু বলবেনা । পৃথিবীর কোথাও কি এমন ইতিহাস আছে? যে পিতা ছাড়া পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করেছে? এমন কোন খবর পাওয়া যাবে যে মাতৃক্রোরে কোন শিশু কথা বলে? আল্লামা ফরীদুদ্দীন আত্তারের পান্দেনামা গ্রন্থে একটি ফাসী কবিতা পাওয়া যায়, যাতে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। কবিতাটি নিম্নরূপঃ

بے پیدر فرزند پیدا او کند

طفل را در مہد گویا او کند[১৫২]

(আল্লাহ তায়ালা পিতা ছাড়া পুত্র বানাতে পারেন,

শিশুকে আল্লাহ তায়ালা মাতৃক্রোরে কথা বলাতে পারেন।)

মির্যা গালিব খোদার প্রতি বিদ্রোহী নমরুদের ইতিহাসও তাঁর উর্দু কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে অনেক মানুষকে ক্ষমতা ও শক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তার অপব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সীমালঙ্গনের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন তিনি ফেরাউনকে নীল নদে, আবরাহার হস্তী বাহিনীকে আবাবিল পাখির ঠোটের পাথর দ্বারা, নমরুদকে একটি লেংরা মশা তার নাকের ভিতর ঢুকিয়ে চরম শিক্ষা দিয়ে পৃথিবীতে জ্বলন্ত ও যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করে রেখেছেন। সে কথাগুলি গালিব তার দিওয়ানে সংরক্ষণ করে একটি ইতিহাস তৈরি করেছেন।[১৫৩]

মির্যা গালিব এক জায়গায় বলেন-

کیا وہ نمرود کی خدائی تھی

بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا[১৫৪]

(মহান আল্লাহ নমরুদেরও খোদা ছিলেন

দাসত্য করেও আমার জীবন সুখী হলো না।)

মির্যা গালিবের দিল্লির মোগল সম্রাটের রাজ দরবারের সভা কবি ও রাজ বংশের ইতিহাস রচনা করার ব্যাপারেও প্রসিদ্ধি রয়েছে। গালিব যখন অর্থনৈতিক দৈন্য দশায় ভুগছিলেন এবং কাজের সন্ধান করছিলেন, তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু রাজদরবারের মন্ত্রী ও শাহী হাকিম আহসানউল্লাহ খাঁর সুপারিশক্রমে বাহাদুর শাহ জাফর গালিবকে ১৮৫০ সনে জুলাই মাসে তৈমুর শাহী বংশের ইতিহাস ফার্সী ভাষায় লেখার কাজে নিযুক্ত করেন। আর এজন্যে

Dhaka University Institutional Repository

গালিবকে বাৎসরিক ভাতা হিসাবে ৬০০ টাকা মঞ্জুর করলেন। বাদশাহ গালিবকে নজমুদ্দৌলা দবীরুল মূলক ও নিজাম জঙ্গ খেতাবেও ভূষিত করলেন গালিব এ সুযোগেই মৌগল রাজদরবারে চাকুরী লাভ ধন্য হলেন।

মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর মন্ত্রী আহসান উল্লাহ খাঁকে এই মর্মে নিদের্শ জারি করলেন যে, তিনি ঐতিহাসিক সকল তথ্য সামগ্রী একত্র করে মির্যা গালিবের কাছে সরবরাহ করবেন। গালিব প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য ও উপাত্তর আলোকে ফার্সী ভাষায় গ্রন্থকারে মোগল বংশের এক খানা ইতিহাস প্রণয়ন করবেন। গালিবের এই ইতিহাস প্রণয়নের কাজ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো।

গালিব মোগল বংশের ইতিহাসটি দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এক ভাগ হলো তৈমুর শাহ থেকে শুরু করে বাদশাহ হুমায়ুন এর রাজত্ব কাল পর্যন্ত। অন্য ভাগ হলো বাদশাহ আকবর থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর এর আমল পর্যন্ত। আর এ দুভাগকে আলাদা আলাদা দুটি গ্রন্থে বা খণ্ডে সমাপ্ত করতে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন।

আহসানউল্লাহ খাঁকে তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়ে ছিল সে দায়িত্ব তিনি প্রথম দিকে পালন করতে পারলেও পরবর্তীতে তা নিয়মিত করতে পারেননি কারণ তার ওপর দরবারের আরো অনেক গুর দায়ভার ছিলো। গালিব কয়েক বছর লাগাতার-অবিরাম পরিশ্রম করে প্রথম খন্ড সম্পূর্ণ করে বাদশাহের নিকট জমা দিতে পারলেও বিদ্রোহের কারণে ও তথ্য সামগ্রীর অভাবে দ্বিতীয় খণ্ড আর রচনা করতে পারেননি।

প্রথম খন্ড ১৮৫৪ সনে লাল কেল্লার শাহী ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত হয়ে 'মিহরে নীমরোজ' বা দিপ্রহরের সূর্য নামে প্রকাশিত হয়। গালিব দ্বিতীয় খন্ডের নামে দিতে চেয়েছিলেন 'মাহে নীম সাহ' অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। যদিও তা লেখার ভাগ্য হয়নি। [১৫৫]

গালিব যথাযথ সম্মান পেতে উপেক্ষিত হয়েছেন সবখানে। রাজদরবারে তার যথাযথ সমাদর হয়নি। গালিব সুদীর্ঘ কাল দিল্লীতে অবস্থান করেছেন রাজদরবারে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন রাজবংশের ইতিহাস লিখেছেন। তারপরও কেন রাজদরবারের পৃষ্টপোষকতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন সে ইতিহাস গালিব সংরক্ষণ করেছেন। পৃষ্ঠপোষকতা থেকে উপেক্ষিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো বাহাদুর শাহর কবিগুরু জওকের বিরোধিতা থাকা। জওক চিরদিনই গালিবের কবি প্রতিভার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। গালিবের মতো মহা প্রতিভাবান কবির যদি রাজদরবারে স্বীকৃতি মিলে তাহলে তার মর্যাদার হানি হবে এই ভীতি সবসময় তাঁর মনে করা আঘাত করত। এ কথাগুলি গালিবের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায়। গালিব বলেন-

تسکیں کو ہم نہ روئیں، جو ذوق نظر ملے

حوران خلد میں تری صورت مگر ملے[১৫৬]

(জওকের মতো প্রশান্তি যদিও এখানে না মিলে

জান্নাতের হুরের মাঝে তোমার ভাব যদি মিলে।)

গালিব এখানে রাজদরবারের চিত্র তুলে ধরেছেন। রাজদরবারে জওকের আরাম-আয়েশ যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু গালিব উপেক্ষিত ছিলেন। গালিব তাই দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছেন, দুনিয়ার রাজদরবারে যদিও আমার সম্মান, সুখ-শান্তি কাছে ধরা পরেনি, কিন্তু খোদা তোমার দরবারে জান্নাতে হুরের মাঝে যেন তোমার দেখা পাই, তোমার সাথে ভাব বিনিময় করতে পারি।

গালিব এক প্রেমিক যুগলের ইতিহাসও বর্ণনা করেছে তাঁর উর্দু কবিতায়। উদাহরনস্বরূপ গালিবের দিওয়ান থেকে একটি কবিতা দেখা যাক-

تم کو بھی ہم دکھائیں کہ، مجنون نے کیا کیا

فرصت کشاکیش غم پنہاں سے گر ملے[১৫৭]

(আমি তোমাদের দেখাতে চাই,

লাইলির জন্য মজনু কত কিছুই না করেছে

দীর্ঘ সাধনার পর মজনু লাইলির সাক্ষাত পেয়েছে।)

গালিব অত্র কবিতাংশে লাইলি মজনুর প্রেমের ইতিহাস রচনা করেছেন। মজনু লাইলির জন্য দিওয়ানা ছিলেন। কিন্তু লাইলি সুযোগ পেলেই মজনুর দোষ খুঁজেছেন। মজনু অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সীমাহীন ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছেন। প্রেমের পরিক্ষায় মজনু সফলকাম হয়েছেন জীবনের বিনিময়ে অবশেষে মজনু লাইলীকে জীবন সঙ্গীনী হিসাবে কাছে পেয়েছেন। গালিব এভাবেই তার কবিতায় দুনিয়ার বিচিত্র ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। আর এজন্যই গালিবকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ ইতিহাস সচেতন কবি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো গালিবের দিওয়ান থেকে বাছাইকৃত উপরিউল্লিখিত কবিতাগুলী।

## স্পষ্টবাদীতা

গালিব ছিলেন স্পষ্টবাদী কবি, কোন প্রকার মিথ্যাচার, হীনতা তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর চোখে যা অন্যায় তা তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিতেন। প্রিয়ার নির্দয় আচরণ, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা এমনকি নিজের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিও তুলে ধরতে পিছপা হতেন না। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন নিজের মদ্যপানের কথা। মদ্যপানের কারণও তিনি শে'রের মধ্যে জানিয়ে দেন। আনন্দে আর বেদনায় মদের মতো আর কী আছে! মজা লুটবার জন্য নয় বরং দুঃখ ভুলে থাকার জন্য মদের দরকার। তিনি জানতেন, এ মদ তান্ত্রিক-সুফিদের মদ নয়, নিতান্তই বোতলের মদ, যা পার্থিব এবং প্রচলিত ধর্মের পরিপন্থী। কবির ভাষায়-

Dhaka University Institutional Repository

مئے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو

اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئیے[১৫৮]

( মজা লুটতে মদ খেয়েছে কোন সে মুখ পোড়া

আমি শুধু দিবারাত্রি একটু ভুলে থাকতে চাই।)

আর্থিক টানাপোড়েন ছিল গালিবের নিত্য সঙ্গী। কখনো অবস্থা এমন হত যে, ঋণ করে তাঁকে সংসার চালাতে হতো। ঋণের ভারে তিনি এতটাই ন্যুজ ছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে চার-চারটি মামলা রুজু করা হয়। তিনি ঘর থেকে বের হতে পারেন না। মহাজনেরা কবিকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে যায়। কবি তাঁর সেই ঋনের কথা স্বীকার করে কাজীর সামনে নিম্নোক্ত কবিতাংশটি পাঠ করেন-

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں

رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن[১৫৯]

(ধার করে খাচ্ছি মদ, যাচ্ছে ঠিকই বোঝা

একদিন ঘরে রং ছড়াবে ভুখা থাকার মজা।)

চাকরি বা মাসিক ভর্তুকীই ছিল গালিবের জীবনের নিত্যসঙ্গী। দিল্লির শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের রচিত রচনাকর্ম দেখে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি এই মাসিক ভাতা পেতেন। নিজের অপছন্দ সত্ত্বেও গালিব এই কাজ করতেন। কিন্তু এই দুঃখ তিনি ভুলতে পারেননি।

ہم نے مانا کہ تغافل نہ کروگے لیکن

خاک ہو جائینگے ہم تم کو خبر ہونے تک[১৬০]

মৃত্যুর সাংবাদ শুনে তুমি আসবে সেতা জানি

তুমি সংবাদ পাবার আগে মাটিতে মিশে যাব আমি।

আলোচ্য কবিতাংশে গালিব আরো বলেন-হে আমার মাহবুবা তুমি যখন আমার শারিরীক বেগতির অবস্থা মানুষের কাছে শুতে পাবে আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার মিলনে ধরা

Dhaka University Institutional Repository

দিবে কিন্তু লোকেরা এতই দেরীতে তোমাকে সংবাদ পৌছাবে যে, ততক্ষনে আমার মৃত্যু হয়ে আমার দেহ মন ও হাড্ডি গুড্ডি মাটির সাথে মিশে যাবে।

গালিব সর্বদা প্রেয়সীর মন জয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার প্রেমিকা তার ডাকে সাড়া দেয়নি। প্রেমিকা সর্বদাই গালিবের সাথে অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন। তাই প্রেমিক কবি গালিব এই চিরাচরিত নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন।

গালিব বলেন-

بیدار عشق سے نہیں ڈرتا، مگر اسد!

جس پہ ناز تھا مجھے، وہ دل نہیں رہا۔[১৬১]

(ভালোবাসা নিষ্ঠুরতায় ভয় পায় না আসদ

যে হৃদয়ে গর্ব ছিলো নেই শুধু আজ সেই হৃদয়।)

গালিব নিজের দোষত্রুটি ও আমিত্ব এবং বড়ত্বর কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। গালিব যে নিজের সুন্দর চেহারার কারণে কোন এক সময় অহংকারী হয়ে গিয়েছিলেন সে কথার স্বীকৃতিও তার কবিতায় ধরা পড়েছে। গালিব এক জায়গায় বলেছেন-

بھر جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا

اگر اس طرۂ پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔[১৬২]

(চলে যাব একদিন তোমার রূপ সৌন্দর্য

সুঠাম দেহ, সুন্দর জীবন হে অত্যাচারী।

ললাটের বাঁকা কেশগুচ্ছ

থাকবে ঠিক বাঁকা ও মোচড়ানো।)

গালিব মানুষের আভিজাত্যপূর্ণ জীবন ও লোক দেখানো অহংকার বড়াই ও চাকচিক্যের প্রতি তীর্যক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এক কবিতায় গালিব বলেন-

پوچھ مت رسوائی انداز استغنائے حسن

دست مدہون حنا، رخسار رہن غازہ تھا[১৬৩]

(বাহ্যিক সুন্দর্য, বে-পরওয়া জীবনের

অপমানের কথা জিজ্ঞাসা করোনা,

Dhaka University Institutional Repository

হাতে মেহেদীর নকশা ছিলো যত

মুখ মন্ডলে প্রসাধনের সাজ ছিলো তত।)

গালিবের প্রিয় বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়তমারাও গালিবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বন্ধুকে পাঠিয়েছেন প্রিয়ার কাছে চিঠি পৌছাতে সেখানেও বন্ধু গালিবের উপকার না করে অপকার করেছে, বন্ধু নিজেই গালিবের প্রিয়ার সাথে প্রেমে জড়িয়েছে। কবিও প্রিয়ার মাঝে দুরত্ব গড়ে তোলে। এক কবিতায় গালিব বলেন-

دیا ہے دل اگر اس کو، بشر ہے کیا کہے

ہوا رقیب تو ہو، نامہ بر ہے، کیا کہئے[১৬৪]

(যদি দিয়ে থাকি তাকে হৃদয় সে তো মানুষ কী আর বলব তারে

হয় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী তবে হউক, সে তো পত্রবাহন, কী আর বলব তারে।)

মির্যা গালিবের সাথে তাঁর খুব প্রিয় একজন প্রিয়তমাও যে প্রতারণা করেছে গালিব তাঁর প্রিয়তমার সে বিশ্বাসঘাতকতার ছবিটি স্পষ্ট করে তাঁর মুরসিয়াতে বর্ণনা করেছেন। বিখ্যাত সে মারসিয়ার দু'টি লাইন নিম্নে প্রদত্ত হলো-

درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری ہائے ہائے

کیا ہوئی ظالم تری غفلت شعاری ہائے ہائے[১৬৫]

(তুমি বিনে হৃদয় আমার ব্যাথায় কাঁদে হায় রে হায়

কোন জালিমের তীর এসে গো তোমার বুকে বিধলো হায়।)

کیوں مری غم خوارگی کا تجھ کو آیا تھا خیال

دشمنی اپنی تھی میری دوستداری ہائے ہائے[১৬৬]

(আমার সাথে মিলতে তোমার এসেছিলো কোন সে খেয়াল

দুশমনি তো বন্ধু মাঝে লুকিয়ে ছিলো হায়রে হায়।)

গালিব নিজের জীবনের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটিও তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষনা করেছে তার মদপানের কথা। এ সম্পর্কিত দু'টি কবিতা নিম্নে দৃশ্যমান-

Dhaka University Institutional Repository

غالب چھوٹی شراب ہر ابھی کبھی کبھی

پیتا ہوں روز ابر و شب مہتاب میں[১৬৭]

(গালিব ফেলে দিয়েছে শরাব তবু কখনও

পান করি মেঘলা দিনে অথবা চাঁদনী রাতে।)

মির্যা গালিব ছিলেন সহজ সরল সাদা মনের মানুষ। সারাজীবন সকল মর্ম কষ্ট নিরবে নিভৃতে সয়ে গেছেন। সে সরল মনের প্রকাশ ঘটেছে গালিবের নিম্ন বর্ণিত উর্দু কবিতায়-

اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں[১৬৮]

এই সরলতার তানে কে আর জীবন দিবে খোদা

যুদ্ধের ময়দানে টিকে আছে বীনা তলোয়ারে খোদা।

আলোচ্য শে'রের দ্বারা গালিবের কবি মনের সরল মনোভাবের চিত্র ফুটে উঠেছে। গালিব খোদার দরবারে স্পষ্ট এটাই বলতে চান যে, আমি সাদা মনের মানুষ হিসাবে সকল প্রকার যাতনা সয়ে সয়ে ধুকে ধুকে মরছি। জীবন যুদ্ধসাগরে সাঁতার দিয়েছি। বীনা অস্ত্রে ও ঢাল তলোয়ার ছাড়াই আপন মনের শক্তি সঞ্চার করে যুদ্ধের ময়দানে বহাল তবিয়তে আছি। কিন্তু এই অস্ত্র ছাড়া সংগ্রাম আর কতদিন চলবে এটাই আমার মনের প্রশ্ন।

মোটকথা গালিবের যেমন ছিল উদার হৃদয়, তেমনি অন্তওে ও বাহিরে তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী। তাঁর মধ্যে লুকোচুরির কোন বালাই নাই। মানুষ মাত্রই কোন না কোন দোষ থাকা স্বাভাবিক। তার মধ্যেও তেমনি দোষ ছিল, কিন্তু গালিব তা কখনোই লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন না। বস্তুত তিনি ছিলেন দিল খোলা ব্যক্তি। গালিবের মদ্যপানের যে বদ অভ্যাস ও নেশা ছিলো তাও তিনি বন্ধু-বান্ধবের নিকট কাব্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে কখনই দ্বিধাবোধ করতেন না। অকৃত্রিম সরলতার সহিত তাঁর সকল দোষ অকপটে ব্যক্ত করলেও গালিবের খুব আত্মসম্মানবোধ ছিল। কবিবরের অধ্যাপকের পদ ত্যাগের মধ্যে তাহা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে।

গালিব মদ পান করেছেন নানা কারণে। বার বার তিনি মদ ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদাও করেছেন। কিন্তু জ্বালা-যন্ত্রণা এতোই ছিল যে, তা ভুলে থাকার জন্য তাঁর কাছে মদের বিকল্প আর কিছুই ছিল না। তাঁর একথাটি স্পষ্টতই ধরা পরেছে নিম্নবর্ণিত উর্দু কবিতায়-

Dhaka University Institutional Repository

تونے قسم میکشی کی کھائی غالب

تیری قسم کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔[১৬৯]

(ছুঁয়ে তুমি দেখবে না মদ

করলে, গালিব, শপথ তো এই !

কিন্তু তোমার শপথে যে

কারোই কোনো ভরসা নেই ।)

মির্যা গালিব বুঝতে পারতেন মদ পান করা হারাম এটি পান করা তাঁর জন্য মোটেই সমীচীন নয়। সে কারণেই গালিব বার বার মদ পান করা থেকে বিরত থাকতে চেয়েছেন এবং বার বার শপথ করেছেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে আবার মদের বোতল হাতে তুলে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি পুনঃ পুনঃ শপথ করে আবার সেই শপথ ভঙ্গ করেছেন তাই তিনি নিজের সেই ভূল ত্রুটিকে অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর উপরোক্ত কবিতাংশে।

## প্রকৃতির চিত্রায়ণ

প্রকৃতির চিত্রায়ণ গালিবের বৈচিত্র্যময় কাব্যের আরেকটি অঙ্গ। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন পটভূমি রূপে নয়, বরং প্রকৃতিকে উপলক্ষ্য করে। বর্ষা, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুকে প্রসঙ্গ করে গালিব যে কবিতা লিখেছেন, তাতে তাঁর আধুনিক মনস্কের পরিচয় মেলে। গালিব বর্ষার রসঘন চিত্র এঁকেছেন। বর্ষার আনন্দের সংগে নিজের আনন্দের একাত্মতা ঘোষণা করেছেন । গালিবের ভাষায়-

پھر ہوا ہے وقت کہ ہو دلکشا موج شراب

دے بط مے کو دل و دست شنا موج شراب

پوچھ مت وجہ سیہ مستئی ارباب چمن

سایۂ تاک میں ہوتی ہے ہوا موج شراب

ہے یہ برسات وہ موسوم کہ عجب کیا ہے اگر

موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب۔[১৭০]

*Dhaka University Institutional Repository*

( আবার সে মৌসুম এসে গেছে, তাই সুরায় ঢেউ উঠতে শুরচ করেছে

হংসরূপী সুরাপাত্রকে এখন সাঁতার কাঁটতে দাও,

বনের বৃক্ষলতা এমন মাতাল কেন জিজ্ঞাসা করো না

সজল হাওয়ায় ঢেউ আংগুর লতার কুঞ্জ ছুঁয়ে গেছে,

এ বর্ষাকাল এমন এক মৌসুম যে, তার মদমত্ত হাওয়া যদি

অস্তিত্বকে মাতাল করে দিয়ে যায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।)

আলোচ্য কবিতায় কবির গভীর আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে কবি বর্ষার সজল হাওয়াকে অস্তিত্বের মাতাল হওয়ার পক্ষে অনুকূল বলে ভেবেছেন।

অন্য এক কবিতায় গালিব হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুর প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন-

خزاں کیا فصل گل کہتے ہیں کس کو کوئی موسم ہو

وہی ہم ہیں قفس ہے اور ماتم بال و پر کا ہے۔[১৭১]

( হেমন্ত কী, বসন্ত ঋতু কাকে বলে-

পিঞ্জিরাবদ্ধ বুলবুল আমি, আমার তো

শুধুমাত্র পালক-পাখার বিলাপ।)

মির্যা গালিব সর্বদাই প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেও পরিবর্তন হয়ে যেতেন। গালিব ছিলেন প্রকৃতি প্রেমী কবি। তিনি বর্ষার ঘনঘটা গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও আঁধার রাতের আকাশের রূপ-বৈচিত্র বর্ণনা করেছেন তার কবিতায়-

کس طرح کاٹے کوئی شب تارے برس گال

ہے نظر خو کردۂ اختر شماری ہائے ہائے۔[১৭২]

(বর্ষা আঁধার রাত্রিগুলো

কাটবে বলো কোন আবেগে,

তারা গণার স্বভাব নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

দু'চোখ আমার রয় সে জেগে।)

আলোচ্য কবিতাংশের মাধ্যমে গালিব বর্ষার অন্ধকার রজনীর রূপ ও সৌন্দর্যের চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। তিনি বলেন বর্ষাকালে আকাশ বাতাশ ভারী হয়ে যায়। আকাশ গোমরা মুখ করে বসে থাকে, রাখাল বালক মাঠে গরু চড়ায়, কৃষক মাঠে ফসল বুনায়। এরি মাঝে হঠাৎ অঝরে বৃষ্টি পরে, মুহুর্তের মধ্যে মাঠ-ঘাট পানিতে ভরে ওঠে। সবাই বর্ষাকে উপেক্ষা করে নিজ কর্ম সম্পূর্ণ করে ঘরে ফিরে। হাতের কাজ শেষ করে রাতের খাবার গ্রহণ করে। রাখাল ও কৃষক, বৃদ্ধ ও মধ্য বয়সীরা দিনের কর্ম ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেয়ে রাতের বেলা অবসর সময়ে কিছুক্ষণ মনের আনন্দে গল্প গুজবে মেতে ওঠে। মায়েরা শিশুদের আঁধার রাতে ঝলমল তারা দেখিয়ে বিভিন্ন গান শোনায়। প্রকৃতি প্রেমী গালিব ও বর্ষা রাতের আধারে তারাদের সাথে রাত্রি জাগরণ করতে চান। সারারাত্রি তারাদের রূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তাদের প্রেমে সারা দিয়ে কাটাইতে চান। গালিব প্রকৃতির কবি হিসাবে এখানে বর্ষা রাতের মনভুলানো দৃশ্যটিই অংকন করেছেন বিভিন্ন বর্ণনা ভঙ্গীর মাধ্যম।

প্রকৃতির ঋতুর রানী হলো বসন্তকাল। এসময় গাছে গাছে পাতায় পল্লবে ভরপুর থাকে। বাগানে রং-বেরংগের ফুল ফোটে। প্রকৃতি নব বধুর মতো রূপ সজ্জায় সজ্জিত হয়। বসন্তের সেই রূপের কথা ধড়া পরেছে গালিবের নিম্নবর্নিত এক উর্দু কবিতায়-

آغوش گل کشادہ برائے بداہے

وہ اندلیب چل کہ چل دن بہار کے[১৭৩]

(বসন্তকাল বিদায় নেবে

চলো বুলবুল চলো এবার

ফুলেরা কয় পাপড়ি মেলে

সময় হলো বিদায় নেবার।)

মির্যা গালিব এখানে ঋতুর রানী বসন্তকালের রূপ ও গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন। গালিব বলেন, বসন্তকালে পুরো প্রকৃতি সবুজের আলোয় ঘেরা থাকে। চারিদিকে হরেক রকমের ফুলের ঘ্রানে ও লাল, নীল, হলুদ, সাদা বিভিন্ন ফুলের রংঙের কারনে প্রকৃতি যেন রূপসী কন্যা, রমণী ও নতুন বধূ সেজে বসে থাকে, আপন রং ও সৌন্দর্য বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। বসন্তকাল হলো ফুলের পূর্ণ যৌবন শেষে বিলুপ্তির সময়। কারণ তখন সব ফুল তার পাপরিগুলী পরিপূর্ণভাবে মেলে ধরে আর আস্তে আস্তে সে পাপরিগুলী ঝড়ে পরে যায়। ফুলের এমন বিলুপ্তি দেখে বুলবুলি পাখিরাও বসন্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাখিরা একে অন্যকে কানে কানে জানান দেয় আর দেরী করে লাভ নেই, কারণ আমাদের মধু আহরণের উৎস স্থল সব ফুলই ঝড়ে গিয়েছে।

গালিব ছিলেন প্রকৃতি পুজারি। প্রকৃতির প্রশংসা বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। গালিব বলেন, প্রকৃতি হলো মহান আল্লাহর দান। প্রকৃতির রূপ ও ভালো বাসা নিয়েই, প্রকৃতির প্রতি মায়ার কারণেই মানুষ আজও বেঁচে আছে। গালিব মনে করেন প্রকৃতির অন্যতম উপাদান হলো ফুল। কারণ ফুল হলো পবিত্র এবং সৌভাগ্যের প্রতীক। প্রতিটি ফুলের সুগন্ধি একথাই জানান দেয় যে, আমি খাঁটি, আমি সুন্দর, আমি পবিত্র। তাই ফুলকে দুনিয়ার সবাই ভালোবাসে, ফুল হলো ভালোবাসার প্রতীক। বিশেষ করে গোলাপ ফুল, গোলাপকে কে না পছন্দ করে, কে না ভালোবাসে। প্রেমিক যুগলের ভালোবাসার প্রধান ও প্রথম মাধ্যম হলো লাল গোলাপ ফুল। রসের কবি, প্রেমের কবি ও প্রকৃতির কবি তাই ফুলের নানা প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে গালিব বিভিন্ন ফুল বাগান, বাগানের গোলাপ ফুলের প্রশংসা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন নিম্ন বর্ণিত কবিতার মাধ্যমে। গালিব বলেন-

تمشائے گلستن تمنائے چیدن

بھار آفرینا گناہ گار ہے ہم[১৭৪]

(কানন দেখে মুগ্ধ আমি

পুষ্প ছেঁড়ার হচ্ছে তবু

মন যে আমার পাপী বড়ই

ফুল ফাগুনের স্রষ্টা প্রভূ।)

গালিব এখানে বলেন যে, আমি প্রকৃতির এতো সুন্দর ফুলবাগান দেখে খুবই আনন্দিত। আমার ইচ্ছে করে ফুল থেকে সুঘ্রান নিতে। আমার আরো অনেক ইচ্ছা বাগানের ফুল ছিড়ে হাতে নিয়ে মন ভরে দেখতে। কিন্তু ফুল ছিড়লে যে, বাগানের সুন্দর্য নষ্ট হবে, ফুল ছেঁড়া যে, অন্যায় ও পাপের কাজ। ফুল ছিড়ে আমি এর মালিকের কাছে দোষী ও পাপী হতে চাইনা। গালিব এভাবেই প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়।

মির্যা গালিব সবুজ শ্যামল ফুলে ভরা প্রকৃতি দেখে দারুনভাবে মুগ্ধ। ফুলের সুবাস কবির মনে যেন আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেয়। এমনি ভাব প্রকাশ পেয়েছে নিম্ন বর্নিত ফুলের রানী লাল গোলাপের প্রশংসা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। গালিব বলেন-

سب کہاں دکچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گیا

خاک میں کیا صورت ہو گی کہ پنہاں ہو گیا۔[১৭৫]

(সবাই বলে গোলাপ লালই

রূপের রানী সে সব মিছে

কী রূপসী ছিলেন তাঁরা

যারা এখন মাটির নিচে।)

উপরিউক্ত কবিতার মাধ্যমে গালিব বলেন যে, ছোট-বড়, নারী পুরুষ বৃদ্ধ যুবক সবাই এ ব্যাপারে একমত যে গোলাপ ফুলই প্রকৃতির রাণী। গোলাপের রূপের ডালির কারণেই প্রকৃতি হাঁসতে থাকে। গালিব বলেন আমার প্রিয়তমা এতোই রূপ লাবণ্যে ভরপুর যে, তা যেন ফুলের রাণী লাল গোলাপ ফুলকে হার মানায়। তবে এতো সুন্দরী হওয়ায় পরও সকল সুন্দরের অধিকারী আমার প্রিয়া নয়। কারন মাটির গভীরে আরো সুন্দর কারুকার্য ও সুচারুতা লুকায়িত আছে, যা মানুষের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ গালিব বলতে চান লাল গোলাপ আমার প্রিয়ার সুন্দর চেহারায় চেয়েও আরো অনেক সুন্দর, সুন্দর নকশা গোপন আছে যার সব কিছুই সুদক্ষ শিল্পির অভাবে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়নি । মির্যা গালিব এখানে তাঁর প্রিয়ার রূপের বর্ণনায় লাল গোলাপ ফুলের উপমা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃতির রূপের কথাই বর্ণনা করেছেন।

মির্যা গালিব প্রকৃতির অপরূপ বৈচিত্র্যতা অংকন করেছেন তাঁর উর্দু কবিতায়। গালিব এক কবিতায় বলেন-

خوشی کیا کھیت پر مرے اگر صوبر ابر آئے

سمجھتا ہوں کہ ڈھونڈ ہے ابھی برق خرمن کو[১৭৬]

(খুশী কিসের আমার ক্ষেতে

নাচলে শত মেঘের দোলা,

বজ্র জানি এখন থেকেই

খুজছে আমার ধানের গোলা।)

গালিব এখানে প্রকৃতির এক অপরূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। গালিব বলেন, মেঘ সকলের মনে আনন্দ ও প্রশান্তি আনলেও কৃষক তাতে মোটেও খুশি হতে পারেননি। কারণ বাদলা হাওয়া ও মেঘ-বৃষ্টি হলো বিধ্বংসি ঝড়ের পূর্ভাবাস । এই বাদলা হাওয়ার পরই প্রচন্ড বেগে ঝড় শুরু হবে এবং তাতে কৃষকের শত পরিশ্রমের ফল, ফসলি জমিতে তীব্র বেগে আছড়ে পরবে। এই ঝড়ের কারনে পাকা ধানের ক্ষেতের যে ক্ষতি সাধিত হবে তাতে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর এ জন্যেই কৃষক প্রকৃতির বাদলা হাওয়া ও মেঘ দেখে খুশি না হয়ে ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। গালিবের এ কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতির একটি বাস্তব ও নির্মম চিত্র অংকিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গালিব মনে করেন দুনিয়ার এতো সুন্দর ও নির্মল প্রকৃতির দৃশ্য সবই একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনি বক্তব্যের সমাবেশ ঘটেছে গালিবের নিম্ন বর্নিত এক উর্দু কবিতায়-

ہے جبال امادہ اجزا آفرینش کے تمام

مہرے گردوں ہے چراغے راہ گزار بادیاں۔[১৭৭]

(সৃষ্ট যা তার সকল কিছুই

উন্মুখ যে ধ্বংস পাওয়ায়।

সূর্য সেতো এক পথিকের

হাতের প্রদীপ-ঝড়ো হাওয়ায়।)

মির্যা গালিব এখানে প্রকৃতির অতি বাস্তব ও সত্য বাণীটুকু খুব গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে। তিনি বলেন এ বিশ্ব প্রকৃতির যা কিছু বিদ্যমান আছে তার সবকিছুই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু মাত্র খোদা পাকের নামই বিদ্যমান থাকবে। গালিব আরো বলেন এমনিভাবে বৈশাখ মাসে যখন তুমুল বেগে কাল বৈশাখী ঝড় উঠে আসে তাতে প্রকৃতির সব কিছুই যেমন ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার অন্ধকারে নিমিজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। সে সময় মানুষ পশুপাখি, জীব-জন্তু সব কিছুই আপন আপন কক্ষপথ হারিয়ে ফেলে তারা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাননা। তখন পথিকের একমাত্র অবলম্বন থাকে তারার আলো। তারা তখন তারার আলোকেই অন্ধকার পথের প্রদীপ হিসাবে মনে করেন। প্রকৃতির কবি মির্যা গালিবের কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতির ঝড় হাওয়ার চিত্র এভাবেই বর্নিত হয়েছে।

বর্ষাকালে আকাশে যখন বিজলী চমকায় তখন প্রকৃতিতে এক ভয়াবহ অশুভ সংবাদ বয়ে যায়। প্রকৃতির এ দৃশ্যটিও ধড়া পরেছে গালিবের কবিতায়।

গালিব বলেন-

بجلی ایک کوند گئے آنکھوں کے اگ تو کیا،

بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا۔[১৭৮]

(চোখের সামনে বিজলী রেখা

চমকে গেলেও কাটে কি ঘোর

ওষ্ঠ আমার কথা বলার

জন্যে ছিল তৃষ্ণা কাতর।)

বর্ষাকালে ঘনঘন বৃষ্টি, আকাশে মেঘের গর্জন বিদ্যুৎ চমকানো অবিরাম ঝড় -বৃষ্টি, বৃষ্টির কারণে প্রকৃতির রাস্তা-ঘাটের নাজেহাল অবস্থা সব কিছু মিলে প্রকৃতিতে যে এক দূরাবস্থার সমাবেশ ঘটে। তার একটি সুন্দর চিত্র লক্ষ্য করা যায় গালিবের এ কবিতায়। গালিব বলেন, আকাশে যখন বিকট শব্দে গর্জন শুরু হয় তখন মানুষ ও পশু পাখি সবারই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে কলিজার পানি শুকিয়ে যায়, সবাই ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় সকল জীব প্রভূর কাছে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করে। বিনা দ্বিধায় মুখ থেকে কাকুতি মিনতির শব্দ বের হয়ে আসে। গালিব এভাবেই বর্ষার বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তার উর্দু কবিতায়।

**উপসংহারঃ**

পরিশেষে বলা যায়, যে গালিব একজন অসাধারণ প্রাজ্ঞ ও শক্তিমান কবি ছিলেন। তাঁর এই অসাধারণত্ব ও শক্তিমত্তাই উর্দু সাহিত্যে তাকে বিশিষ্টের মর্যাদা দিয়েছে। এতে সন্দেহ নেই যে, গালিব শুধু উপমহাদেশের নন, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম জনপ্রিয় ও শ্রেষ্ঠ কবি।

*Dhaka University Institutional Repository*

তথ্যসূত্র:

০১। প্রফেসর নুরুল হাসান নকবী, *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার* , ইজুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০০২, পৃ-৫০।

০২। মির্যা গালিব, *দিওয়ানে গালিব*, লাহর, তারিখ বিহিন, পৃষ্ঠা-৩২

০৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

১০। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার* , পৃ-৫৪

১১। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার* , পৃ-৫৫

১২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৪। ডক্টর মালিক রাম, *মির্যা গালিব*, কিশোর বইমেলা, ঢাকা ১৯৯৪, পৃ: ২৭

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭

১৬। *দিওয়ানে গালিব*,পৃ. ৬০-৬১

১৭। *মির্যা গালিব*, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

১৮। ডক্টর মফিজ চৌধুরী, *গালিবের গজল*, ১৫২/২, জে গ্রীন রোড-ঢাকা-২০০৫ পৃ:১৩

১৯। *দিওয়ানে গালিব*. পৃষ্ঠা-৩২

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯

২২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

২৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫

২৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১০

২৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩

২৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৪

২৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-০৮

৩০। আব্দুর রশিদ খাঁ, *যখিরায়ে উর্দু*, আবুল হায়াত প্রিন্টিং, দিল্লি-২০০২ পৃঃ ৩৬৪

৩১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৪।

৩২। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-৩৬

৩৩। কালিদাস গুপ্তা রেজা, *দেওয়ানে গালিব কামিল*, আঞ্জুমানে তারাক্কি করাচি, পৃ. ২২

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২২

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২২

৩৬। *যখিরায়ে উর্দু*, পৃঃ ৩৬৪।

৩৭। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-৬৭

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৯। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার* , পৃ-৪০

৪০। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-১৫

*Dhaka University Institutional Repository*

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৪২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৪

৪৩। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৬৬

৪৪। দিওয়ানে গালিব, পৃষ্ঠা-৪০

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১

৪৬। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৬৭

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৪৮। দিওয়ানে গালিব, পৃষ্ঠা-৯৭

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ০২

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৬১। ইউসুফ সেলিম চিশতি, শরহে দেওয়ানে গালিব, ইশরাত পাবলিকেসন্স, লাহোর, পৃ:১৪২

৬২। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৭১

৬৩। ড. মুহাম্মদ ইস্রাফিল, উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা, টি এ টি পাবলিকেশন্স, ঢাকা জুলাই ২০১৪ পৃ. ৯২

৬৪। দিওয়ানে গালিব, লাহর পৃষ্ঠা-২২

৬৫। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৭১

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৬৭। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-৬৮

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৭২। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৭৪

৭৩। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-৭৩

৭৪। প্রফেসর ড. শওকত সবজওয়ারী, কালামে গালিব, পৃ. ৮৬

৭৫। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-১১৫

৭৬। *দিওয়ানে গালিব*, পৃষ্ঠা-১১৫

৭৭। মিকাস মুলার, *হিন্দি ফালসাফায়ে নিযামহায়ে শসগনা*, ১৯৬২, পৃ. ১০৬

৭৮। *ফালসাফায়ে কালামে গালিব*, পৃ. ১১৪

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৮০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৮১। *দেওয়ানে গালিব কামিল*, পৃ. ৭৬

৮২। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১০০

৮৩। *হিন্দি ফালসাফায়ে নিযামহায়ে শসগনা*, পৃ. ১০৬

৮৪। *ফালসাফায়ে কালামে গালিব*, পৃ. ১১৪

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

৮৭। দেওয়ানে গালিব, পৃ. ১৯

৮৮। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৮৭

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৯১। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ২৩

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯০

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ, ১২৯

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩০

১০০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১০১। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৮৭

১০২। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১৪৯

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

১০৪। মুস্তফা জামান আব্বাসী, *গালিব হৃদয় ছুঁয়ে যায়*, মুক্তদেশ প্রকাশ একুশে বইমেলা,২০১২, ঢাকা, পৃ:৫০

১০৫। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ৭৯

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

১০৭। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, *ইয়াদগারে গালিব*, ইশরাত পাবলিকেশন, পৃ. ৫১

*Dhaka University Institutional Repository*

১০৮। *গালিব হৃদয় ছুঁয়ে যায়*, পৃ. ১৫১

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১১০। *ইয়াদগারে গালিব*, পৃ: ৭৩

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১১২। *শরহে দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১১৫

১১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

১১৪। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ৯২

১১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬
১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬
১১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৬
১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫
১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬
১২০। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৫৬

১২১। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, সাধনা প্রেস, কোলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৬২ পৃ: ১৭০
১২২। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ১৫৭
১২৩। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃষ্ঠা-৮৪

১২৪। প্রাগুক্ত, পৃ:৮৩

১২৫। প্রাগুক্ত, পৃ:৮৩
১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ:৮৪
১২৭। দেওয়ানে গালিব, পৃ: ৮৭
১২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১৩২। প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৮
১৩৩। *গালিব হৃদয় ছুঁয়ে যায়*, পৃ, ১২২
১৩৪। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ৮৭
১৩৫। *গালিব হৃদয় ছুঁয়ে যায়*, পৃ, ২৫

১৩৬। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *দিওয়ানে ই গালিব*, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা সেপ্টেম্বর-২০০৫ পৃ: ১২
১৩৭। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ১৫৭
১৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৩৯। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *দিওয়ানে ই গালিব*, *পৃ.* ১৩
১৪০। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ: ৮৮
১৪১। প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৮
১৪২। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ. ১২৯
১৪৩। *গালিবের হৃদয় ছুঁয়ে যায়*,পৃ. ৭৪
১৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৪৫। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ, ৫৮
১৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
১৪৮। *সুরা কাহাফ*, আয়াত নং-৭৮-৮৩
১৪৯। দেওয়ানে গালিব, পৃ, ৮৭
১৫০। আল্লামা আত্তার , *পান্দে নামাহ*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ-৭
১৫১। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ: ১৬৭
১৫২। *পান্দে নামাহ*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, পৃ-৭
১৫৩। *গালিবের হৃদয় ছুঁয়ে যায়*,পৃ. ৭১
১৫৪। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ: ৬৩
১৫৫। *দীওয়ানে গালিব অনুদিত*, পৃ. ২২
১৫৬। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ: ৬৩
১৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
১৫৮। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, সাধনা প্রেস, কোলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৬২ পৃ: ১৭৪
১৫৯। জাফর আলম (অনুদিত), *দাস্তাম্বু*, প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৯৩
১৬০। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ: ৩২
১৬১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৬২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

*Dhaka University Institutional Repository*

১৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
১৬৯। *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস,পৃ.* ১৭০
১৭০। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ.* ১৯০-১৯৫
১৭১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯৫
১৭২। *দিওয়ানে গালিব*, পৃ: ৩২
১৭৩। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩২
১৭৪। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৩৪
১৭৫। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪৫
১৭৬। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪০
১৭৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪০
১৭৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৪০

Dhaka University Institutional Repository

# তৃতীয় অধ্যায়

## মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপঃ

মির্যা গালিব উর্দু কাব্য  দুনিয়ার এক স্বতন্ত্র নাম। তার উর্দু  কবিতার ভাষা, ভাব, উদ্দেশ্য সব কিছুতেই রয়েছে ভিন্নরূপ। দুনিয়ার অন্যান্য কবিদের কবিতার চেয়ে গালিবের কবিতা আলাদা। উর্দু কবিতার শব্দ চয়ন, ভাব নির্ধারণ ও পরিবেশ পরিস্থিতি উপলব্ধি করে এক ভিন্ন ঢঙ্গে কবিতা লিখতেন গালিব। গালিবের কবিতার এই অভিনব পরিবর্তন, স্বতন্ত্র শিল্পোবোধের মূল কারণ হলো গালিব কবিতা লিখতেন নিজের মনের অফুরন্ত চিন্তা থেকে। তিনি এক্ষেত্রে অন্য কোন উস্তাদ বা কবিদের দ্বারস্ত হননি। তাই গালিবের উর্দু কবিতাগুলো সুবিন্যাস্ত, শিল্পায়িত ও শ্রুতিমাধুর্য মণ্ডিত। এ  অধ্যায়ে মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপ নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করার প্রয়াস চালিয়ে যাব।

**নতুনত্বঃ**

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতা চর্চা, লেখা, আলোচনা-পর্যালোচনা, কবিতার আসর বসানো, আড্ডা দেওয়া, বাহাস মুবাহাসা করা, কাউকে কবিতা দিয়ে প্রশংসা করে নিজের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি করা, কাউকে কবিতা দ্বারা প্রেমের জালে আবদ্ধ করা মোট কথা কবিতা নির্মাণের সকল চূড়ায় মির্যা গালিব উর্দু কবিতা লিখতেন একে বারেই নতুন ভাবে, যা অন্য সকল কবির কবিতা থেকে একদম আলাদা। যা গালিবের কবিতার প্রতিটি চরণেই দৃশ্যমান। নিম্নে তাঁর কবিতার নতুনত্ব বিষয় সম্পর্কে কিছু তথ্য উপাত্ত বর্ণনা করা হলো। আশা করি এ ব্যাপারে আলোচনা মাধ্যমে মির্যা গালিবের কবিতার পরিচিতি সকলের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবো।

মির্যা গালিব কাব্য চর্চা করতেন এক অভিনব পন্থায়। গালিব সর্বদা অন্যান্য কবিদের কবিতাচর্চা ও অনুশীলন করা থেকে বেঁচে থাকতেন। তিনি একক মন মানসিকতা নিয়ে সম্পূর্ণ স্বকীয়ভাবে কবিতা লিখতেন ও  অনুশীলন করতেন। আর এখানেই মির্যা গালিবের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য লুকায়িত ছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার এক বিশেষ শিল্প বা আর্ট।

মির্যা গালিব কখনো অন্য কোন কবির কবিতার নিয়মনীতি অনুসরণ করে কবিতা রচনা করেননি। তিনি সব সময় কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তে নিজের পন্থা নিজেই আবিস্কার

Dhaka University Institutional Repository

করে নিতে সক্ষম ছিলেন । তিনি কবিতা চর্চা করতেন নিজের মন-মেজাজ ব্যবহার করে। পিছনে কেউ কিছু বলল না বলল, তা নিয়ে গালিবের কোন মাথাব্যাথা ছিলো না। সামনে যদিও বা অন্য কোন কবির কবিতা দৃশ্যায়িত হয় সেটি নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ তার ছিল না। অতপর সে কবিতাটি যদি তার পছন্দ হতো তাহলে তা গ্রহণ করতেন আর যদি পছন্দ না হতো তাহলে কোনরূপ ভাবনা ছাড়াই তা প্রত্যাখান করে দিতেন। কোন বিষয় নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকাকে তিনি তার মর্যাদার পরিপন্থি মনে করতেন। মির্যা গালিব খুব ভালোভাবেই বুঝতেন, যে ব্যক্তি অন্য কোন কবির সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে এবং সে অনুযায়ী পথ চলে তাহলে তার পথচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এজন্য তিনি মনে করতেন, দুনিয়া ও দুনিযার কার্যক্রম যে ভাবেই চলুক আমার কাজ হলো সকল পর্যায়ে সাবধান মতো পথ অতিক্রম করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাওয়া। মির্যা গালিবের এই বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তার নিম্নের কবিতার মধ্যে।

ازاں کہ پیروی خلق گمراہی آرد

نمی رویم بہ راہے کہ کارواں رفتہ است[১]

অন্যের তৈরি জিনিসের অনুসরণে পথ ভ্রষ্টতা থাকে,

কার্যক্রম যে ভাবেই চলুক উচিৎ হবে সাবধানে চলা।

গালিব ছিলেন উর্দু কবিতা চর্চার ক্ষেত্রে এক মহাপণ্ডিত। সে পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তার লিখনির মধ্যে। তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষয়কে পুনরায় আগের মতো জীবনদান করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখনি তিনি জানতে পারতেন তার এই কাজের মতোই এমন কিছু কাজ যা তার পূর্বের কোন কবি করে গেছেন সাথে সাথে তিনি সে কাজকে প্রত্যাখান করতেন।

মির্যা গালিবের সম্পূর্ণ নতুনভাবে কাব্য নির্মাণের কথা সারা বিশ্ববাসী স্বীকার করেন। তাঁর এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্য রচনার জন্য তার আগের ও পরের সময়কার সকল কবি তার পায়ে সালাম করতেন এবং সম্মানের দৃষ্টিতে তার পায়ে চুমু দিতেন। গালিবের এমন আলাদা ও নতুন বৈশিষ্ট্যে কবিতা রচনার কথার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে মজনু গুরখুপুরি তার স্বীকারুক্তিমূলক বক্তব্য পেশ করেন যা নিম্নরূপঃ

جناب مجنوںؔ گھپوری نے جو کچھ فرمایا ہے اس لب لباب یہ ہے کہ غالب صاحب ہنر تھے۔ قدرت نے انہیں تخلقی توانائی عطا کی تھی۔ ایسا خلاق ذہن جب مستعمل طریقوں کو از سر نو استعمال کرتا ہے تو ان میں اپنی انفرادی شان پیدا کر لیا ہے۔[২]

(জনাব মজনু গুরখুপুরি মির্যা গালিব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার মৌখিক স্বীকৃতিটা এমন, গালিব সাহেব বুদ্ধিমান ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবেই তাঁকে

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিমত্তা দান করেছিলেন। আর এরকম আল্লাহ প্রদত্ত্ব জ্ঞান কে যদি সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে নিজের কাব্যচর্চায় অবশ্যই স্বতন্ত্র চিত্র ফুটে উঠবে। )

গালিবের কবিতা পড়লে অন্য কোন কবির কবিতার সাথে মিলে যাওয়ার মতো কোন আশঙ্কা থাকেনা। কারণ তিনি ধ্বংস বা ক্ষয়প্রাপ্ত ও জনসাধারণের কথাবার্তা থেকে তার কাব্যচর্চা সর্ম্পূর্ণ ভিন্ন থাকতো। তিনি প্রমাণস্বরূপ যে সকল গজল ও কবিতাসমূহ বর্ণনা করতেন। তাতেও পাওয়া যেত সরলতা, অনাড়ম্বরতা এবং স্বতন্ত্রতা। যার বর্ণনাভঙ্গি, আচরণবিধি সম্পূর্ণ আলাদা। এ কথাগুলি মির্যা গলিব যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে অন্য কোন কবি বলতে সক্ষম হননি।

উপরিউক্ত আলোচনর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, গালিব ছিলেন এক অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা। তাঁর গীত বর্ণনা, কাব্য রচনা, গজল গাওয়া, কথা বলা, কবিতার সুর দেওয়া, কবিতার ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি, উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি সকল ক্ষেত্রে ছিল নতুনত্ব, বিরলতা ও শ্রুতিমাধুর্যে ভরপুর।

## বর্ণনাভঙ্গি

কোন উন্নতমানে কবিতা লেখার ক্ষেত্রে বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দচয়ন দুটিই উন্নত মানের হওয়া দরকার। মনোমুগদ্ধকর বণর্নাভঙ্গি মানুষের হৃদয়ে আনন্দের আবহ বইয়ে দেয় এবং মানুষকে জাগ্রত করে তোলে। মির্যা গালিব হলেন উর্দু কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি তার কবিতায় বর্ণনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছেন তা অন্য কবিদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। তার কবিতা পাঠে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও অন্তকরণ সব কিছুতেই আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হয় এবং তাতে পাঠক ও শ্রোতা উভয়েই মনের গভীরে প্রশান্তি খুঁজে পায়।

যদি বিষয়ভিত্তিকভাবে গালিবের উর্দু কবিতাগুলীকে পড়া যায় এবং গবেষণা করা যায় তাহলে এ বাস্তব বিষয়টি প্রকাশ পাবে যে, কবিতার সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হলো চিত্রকল্প ও সঙ্গীতায়ন। সকল বিখ্যাত কবিদের কবিতায় এ দু'টি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যার দ্বারা উর্দু কবিতা রচনা ও পাঠ এবং শ্রবণে মনের প্রশান্তি পাওয়া যায় ও কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়গুলী গালিবের উর্দু কবিতার বিষয় বৈচিত্রের সোপান বলা চলে।

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতা জগতের এ বিশাল সমুদ্রের প্রধান ও প্রথম শিল্পকলা হলো কাব্যর্চচার সকল ক্ষেত্রে পরিমাপ করে কথা বলা। এটাই গালিবের কবিতা রচনার মাহাত্ম ও মূল ভিত্তি। আর পরিমাপ করে কবিতা রচনা সম্পর্কে গালিব বলেন-

ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے

Dhaka University Institutional Repository

کہتے ہیں غالب کا ہے انداز بیان اور

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا

صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لئے[৩]

পৃথিবীতে কথা বলার মতো মানুষ অনেক আছে

কিন্তু গালিবের আছে কথা বলার আলাদা যোগ্যতা

গালিব বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতিতে কবিতা রচনার কারনে বিখ্যাত হয়েছেন।

গালিব তার ভক্তদের কথা রাখার কারণে সাধারণ মানুষের নিকট খুবই প্রিয়।

یہ مسائل تصوف، یہ ترا بیان غالب

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا۔[৪]

এতো সুফীদের কথা, এটাতো গালিব তোমারই বর্ণনা

আমরা তোমাকে ওলী মনে করতাম যদি তুমি মদ পান না করতে।

গালিবের কাব্যের ও রচনাবলীর পৃথিবীতে যত সমালোচক আছেন যারা গালিবের কবিতা নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক সমালোচনা করেছেন। তবে তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, গালিবের উর্দু কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো পরিমাপ করে কথা বলা ও কবিতা রচনা করা। আর এ কথার স্বীকৃতি গালিব নিজেই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো পরিমাপ করে কথা বলার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর উত্তর দিয়েছেন গালিবের উর্দু কাব্য চর্চার সমালোচকগণ। তারা যেসব বক্তব্যকে পরিমাপ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো গালিবের কবিতার নতুনত্ব, যাতে ভাষা ব্যবহার বিধির সৌন্দর্য, বিশেষ কৌশল ও শব্দ সমূহের উত্তম ব্যবহার। এতো বিধিবিধান সর্বোত্তম ভাবে ব্যবহারেরর কারণেই গালিবের উর্দু কবিতাগুলীকে পরিমাপযুক্ত কাব্যসম্ভার বলা যায়।

গালিবের সমালোচককগন বর্ণনা করেন, গালিব অতি সাধারণ কথাকে তার কবিতার মধ্যে এমনভাবে বর্ণনা করেন যা সাধারণ মানুষ অতি সহজে বুঝতে পারে না। তবে অনেক চিন্তা ভাবনা করে বুঝার চেষ্টা করলে তারা অবশ্যই গালিবের কবিতার মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত হতে পারবে । আর যে জিনিস অনেক চেষ্টা সাধানার মাধ্যমে অর্জিত হয় সেটা

Dhaka University Institutional Repository

সবার কাছেই অনেক মূল্যবান মনে হয়। এটিই হলো মির্যা গালিবের পরিমাপমূলক কাব্যচর্চার নিদর্শন। এ সম্পর্কে গালিবের একটি কবিতা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

دا کر دئے ہیں شوق نے بند نقاب حسن

غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا[৫]

তোমার রূপ সৌন্দর্য পর্দায় বন্দি তাই আমি একটু বেশি আসক্ত

তুমি ছাড়া আমার দৃষ্টি আর অন্য কোথায়ও অবরুদ্ধ নয়।

আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে মির্যা গালিব একথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, বাহ্যিক ভাবে হয়তো বা প্রেমিকার রূপসৌন্দর্য্য দেখতে পারবো না। তবে তার এমন গুন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার কারণে আমার মন শুধুই তার কাছে যেতে চায়। এটিই হলো গালিবের আন্দাজে বয়ান বা পরিমাপ করে কবিতা বলার ধরণ। যার উপর ভিত্তি করে পুরো বিশ্বের কবি সাহিত্যকগণ গালিবের সামনে মস্তক অবনত করে। আর তারা গালিবকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করতেই অনেক আনন্দ পায়। এরকম আরো একটি নিম্নরূপ-

پاتا ہوں اسکے داد کچھ اپنے سخن کی ہیں

روح القدوس اگرچہ مرا ہم زبان نہیں۔[৬]

তার নিকট থেকে যা কিছু পাই, তার নিজেরও ভাষা আছে

জিবরাঈলের যদিও আছে ঐশীক ভাষাজ্ঞান ।

মির্যা গালিবের কবিতা ও পরিমাপের সবচেয়ে বড় পরিচয় দানকারী মরহুম খাজা হালী বলেন :

" مرزا کی طبیعت اسی قسم کی واقع ہوئی تھی کہ وہ عام راستے پر چلنے سے ہمیشہ کان بھول چڑھائے تھے۔ عامیانہ خیالات اور محاورات سے حتی الوسیع اجتناب کرتے تھے۔"[৭]

(মির্যা গালিবের অন্তকরণ আল্লাহ তায়ালা এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন যে, তিনি সর্বদা সাধারণ লোকদেরকে ঘৃণা করতেন। তাদের সাথে উঠাবসা থেকে বিরত থাকতেন। সাধারণ চিন্তাভাবনা ও প্রচলিত প্রথা থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন।)

*Dhaka University Institutional Repository*

নিম্নে আরো কিছু কবিতা পেশ করছি, যার মাধ্যমে মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় বর্ণিত ত উন্নত ধ্যান ধারণা ও পরিমাপ প্রমান করা সম্ভব হবে।

بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا

آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں کیا ہوتا

توفیق باندازئہ ہمت ہے ازل سے

آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا

لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگائو

جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔

آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد

مجھ سے مرے گنہ کا حساب اے خدا نہ مانگ[৮]

দুনিয়ার সব কাজ করা যেমনি অতি সহজ নয়,

তেমনি মানুষকেও প্রকৃত মানুষ হওয়া সহজ নয়।

দুনিয়াতে যখন কিছুই ছিলনা তখন আল্লাহতায়লা ছিলেন

আবার যখন কেউই দনিয়াতে থাকবে না, তখন আল্লাহ তায়ালাই থাকবেন।

প্রভূ যদি আমাকে অস্তিত্ব না দেন তাহলে আমার কী করার আছে

পরিমাপ করার ভাগ্য রূহ জগত থেকেই আমার ছিল,

আর চোখের মধ্যে তার ফোটা আছে যা গাওহার ছিল না।

দু:সাধ্য হলেও তা আমি বুঝতে পারবো,

Dhaka University Institutional Repository

যখন কিছু থাকবেই না তাহলে কেন ধোঁকা খাবো।

আফসোস এখন আমার পাপের কথা স্মরণ হচ্ছে,

মৃত্যুর পর হে! খোদা তুমি আমার হিসাব চেয়েওনা।

গালিবের কবিতা নতুনত্বের শিল্পে সমৃদ্ধ। তাঁর উর্দু কবিতা এরকম শিল্প সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি উর্দু কাব্যজগতে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আসিন হয়েছেন। আর এরকম ক্লাসিক ও জীবন্ত কর্মের ফলে উর্দু কবিতা ও ভাষা এক বিশেষ অলংকারে সজ্জিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গালিবের উর্দু কবিতার সকল সমালোচকগন একমত যে, গালিবের উর্দু কবিতায় নতুন নতুন শিল্পের কারণে উর্দু কাব্য ভাষার দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড: আব্দুর রহমান বিজনুরী বলেন,

" مرزا کے خیالات نے اپنے اظہار کے لئے خود الفاظ تیار کر لئے۔ الفاظ سازی کے فن میں مرزا اجتہاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ [৯]

(মির্যা গালিব নিজের চিন্তা চেতনা প্রকাশ করার জন্য নিজেই শব্দ সৃষ্টি করতেন। শব্দ তৈরির দিক থেকে মির্যা গালিবকে একজন সক্ষম মুজতাহিদ ও বলা যায়।)

এই নতুনত্বতার ও সৌখিণতার আনন্দেই গালিব তার উর্দু কবিতাগুলোতে নতুন নতুন তাশবিহ, উপমা , ও ঈঙ্গিত মূলক শব্দ তৈরি করার প্রতি অতি আগ্রহ প্রকাশ করতেন, এবং এরকম কবিতা সৃষ্টিতে গালিবের মন-মস্তিষ্কে আল্লাহ প্রদত্ব যে জ্ঞান ছিল, তার নমুনা অতি সহজেই তার উর্দু কবিতার প্রতিটি চরণে দেখা যায়। আর এ জন্যই শায়েখ মুহাম্মাদ আকরাম গালিবকে উপমা ও তাশবিহের বাদশা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ সম্পর্কে ড. লতিফ বলেন-

"ایک لفظی صنعت گر کی حیثیت سے غالب تمام اردو شاعری میں ایک بلند مرتبہ پر فائز نظر آتا ہے۔"[১০]

(শব্দ সৃষ্টি ও তা কাব্যে ব্যবহারের দিক দিয়ে মির্যা গালিব উর্দু কাব্যজগতে সবার চেয়ে উত্তম ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।)

উদাহরন স্বরূপ কয়েকটি কবিতা নিম্নে তুল ধরছি-

ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام

مہر گردوں ہے چراغ رہگذار بادے یاں

چھوڑا یہ نخشب کی طرح دست قضا نے

Dhaka University Institutional Repository

خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا[১১]

পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হওয়ার জন্য প্রস্তুত

ভাগ্যে দযা বা স্নেহ নেই কারন রাজপথের আলো নিভিয়ে গেছে।

মৃত্য পর্যন্ত আমি মদপান করা ত্যাগ করেছি,

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার সমকক্ষ কেউ হতে পারেনি

মির্যা গালিব উর্দু কবিতাকে এবং এর শিল্পগুণকে আরো সামাজিক করার জন্য ও পাঠকের কাছে রসালোভাবে উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতি সাধারন কথাকে মানুষের মনের চাহিদানুযায়ী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে এ ধরনের কিছু কবিতা পাঠ করছি-

بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا .

ساغر جم سے یہ مرا جام سفال اچھا ہے۔

بوئے گل، نالہ دم، دود چراغ محفل

جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا- [১২]

(পাত্র ভেঙ্গে গেলে বাজার থেকে আরো একটি নিয়ে আস

জামের পানি হতে আমার মাটিরপাত্র অনেক ভাল )

ফুলে সুঘ্রান, অন্তরের কান্না , সমাবেশের আলোক সজ্জা

তোমার সমাবেশ থেকে যা কিছু পাই, তা খুব কষ্টেই হয়।

নিম্নে মির্যা গিলিবের উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে এ সকল বৈচিত্র্যতা ও আর্টগুলী আলোচনা করা প্রয়াস পাবো ইনশায়াল্লাহ্ ।

## চিত্রকল্প

জার্মানি ভাষায় কাব্যচর্চায় এমন এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ এমন যে, হঠাৎ করেই তার পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি চিত্রকল্প হিসেবে প্রতিটি কবিতায় দৃশ্যয়িত হয়। আর এরকম চিত্রকল্প উর্দু কবিতায় প্রথম যুগ থেকেই কবিতার একটি অংশ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ হিসাবে যদি উর্দু কবিতার বিখ্যাত ও বাছাইকৃত কবিতাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করা হয় তাহলে তা একটি আকর্ষণীয় এ্যালবাম হিসাবে দেখা যাবে। কেননা উর্দু কবিতার প্রতিটি চরণে একাধিক চিত্রকল্প খুঁজে পাওয়া যায়। উর্দু ভাষার অন্য কবিদের বেলায় যদি এমন হয়। তাহলে উর্দু সাহিত্যের নন্দিত ও দার্শনিক মির্যা গালিবের কবিতায় চিত্রকল্প তার সমসাময়িক কবিদের চেয়ে আরো অনেক গুণ বেশি দৃশ্যয়িত হবে এটাই স্বাভাবিক। গালিবের উর্দু কবিতার প্রতিটি পংক্তিতেই অনেক চিত্রকল্প দেখা যায়। গালিবের দিওয়ানে এরকম চিত্রকল্প সম্বলিত উন্নত মানের অনেক কবিতা পাওয়া যায়। দিওয়ানে গালিবে এমন একটি কবিতা হলো-

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا[১৩]

(ছবি ফরিয়াদ করছে কার সৃষ্টির শোভা দেখে

সব ছবির শরীরেই তো কাগজের পোশাক)

উল্লিখিত কবিতার সারমর্ম হলো আগের যুগে ইরানে ভিক্ষুকেরা কাগজের পোষাক পরে রাজদরবারে উপস্থিত হতো, যাতে তাকে দূর থেকেই চিনতে পারা যায় এবং তার অভিযোগ অতিদ্রুত শোনা যায়। আর ছবির পোষাক সাধারণত কাগজেরই হয়ে থাকে। আর আরজ পেশ করার চিত্রটি দ্বারা এখানে আফসোস করে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আমার জীবন যদি এত তাড়াতাড়ি নি:শেষ হয়ে যায় তবে সৃষ্টিকর্তা কেনইবা আমাকে সৃষ্টি করলেন।

এ কবিরতাটি যখনই কোন পাঠক পাঠ করবেন অথবা কোন শ্রোতা কবিতাটি শ্রবণ করবেন, তখন তার নিকট ইরানের রাজদরবারের চিত্র এবং দরবারে এসে ভিক্ষুকদের অভিযোগ করার দৃশ্য সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে। যদি কবিতাটির আরো গভিরে গিয়ে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে আরো কিছু আধ্যাত্মিক মনোভাব জাগ্রত হবে। সেটি হলো বান্দাহ যেন তার প্রভুর নিকট বিনয়ের সাথে নিজের আরজি পেশ করছে।

এ ব্যাপারে আতিশ বলেন-

عمر تنگ ہو نہ ہو ناپیمانہ بنایا ہوتا۔[১৪]

(মানুষের জীবনের এতই ক্ষণস্থায়ী যে, মানুষ তার জীবনের সব ধরণের ন্যায় কর্ম শেষ করে যাইতে পারে না।)

*Dhaka University Institutional Repository*

হাস্যরস  মির্যা গলিবের কবিতার অন্যতম একটি অংশ। গালিব নিজেই নিজের প্রতিবিম্ব ও চিত্র  এমন ভাবে নির্মাণ করেন, যে তার কবিতা একবার পড়বে সে না হেঁসে পারবেনা। এমনি কিছু চিত্র  নিম্নের কবিতায় বিদ্যমান-

قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ در ہمدم

گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔[১৫]

খাচায়বন্দি ফুলবাগানের পাখিকে বলা হলো

তুমি কোন ভয় পেয়না, গত কালের বজ্রপাত

আমার বাসার উপর কেন পড়লো।

অর্থাৎ- একটি পাখি খাচার মধ্যে বন্দি আছে, শিকারি আরো একটি পাখি নিয়ে এসে সে খাচাতেই বন্দি করে রাখলো। প্রথম পাখিটি দ্বিতীয় পাখিকে জিজ্ঞেসা করল যে , হে আমার দোস্ত তুমিতো সরাসরি ফুল বাগান থকে মাত্রই আসলে, তুমি এখন আমাকে বলতে পারো ফুলবাগানের কী অবস্থা? আমার বাসা কি  অবস্থায় আছে? দ্বিতীয় পাখিটি কিছু কথা বলতে বলতে থেমে গেলো। কেননা তার বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছিল। হয়তোবা সে এ কথাই বলতে চাচ্ছিল যে, ভাই তোমার ফুলবাগান, তোমার বাসা কোথায় পাবে ? সবই তো বজ্রপাতের চরম আঘাতে জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গিয়েছে। প্রথম পাখিটি সব ঘটনা পুরোপুরি বুঝতে পারলো এবং আফসোস করে বলতে লাগলো হে! আমার ভাই তুমি তো ফুলবগান, আমার বাসা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সব অবস্থা বলতে বলতে হঠাৎ কেন থেমে গেলে আমি তা বুঝতে পেরেছি । আমার বাসা জ্বলে পুরে ছাই হয়ে গেলে তাতে আমার কোন আফসোস নেই এবং কোন চিন্তা ভাবনা ও নেই। আমার ভাগ্য তো এমন যে, আমাকে এই খাচাতেই বন্দি থাকার কথা ভাগ্যে লেখা ছিল। এই কবিতাটি পড়ার সাথে সাথেই পুরো একটি নাটকের দৃশ্য আমাদের চোখের সামানে দিবালোকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এটিই হলো গালিবের উর্দু কবিতার চিত্রকল্প। যা অন্যান্য কবিদের কবিতায় অতি বিরল। [১৬]

মির্যা গালিব তার কবিতাকে চিত্রায়িত করার জন্য তিনি তাঁর কবিতায় অনেক উপমা, রূপক কথাবার্তা ও  তাশবিহ ব্যবহার করেছেন ।  যেমন গালিব যখন তার প্রিয়ার শারিরিক গঠন, রূপ ও সৌন্দর্যকে মিহরে নিম রোজের সাথে তুলনা করতেন অথবা তাঁর নিজের কোন প্রিয় মানুষকে চৌদ্দ তারিখের চাঁদের সাথে তুলনা করতেন, তখন সবার চোখের

সামনে চন্দ্র-সূর্যের চিত্র ফুটে উঠত । রং, আলো, সৌন্দর্য গালিবের কবিতায় অনেক পাওয়া যায়। গালিব উর্দু কবিতাসমূহকে চিত্র কল্পে রূপদিতে চন্দ্র-সূর্য, ফুল-বাগান, পানি, পানির কনা, রক্তের বিন্দু উপমা হিসাবে ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। [১৭]

## সুর-সঙ্গীত ঃ

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় অনেক সুর ও সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায়। সুর ও সঙ্গীত ব্যবহার করার কারণেই গালিবের উর্দু কবিতা আরো বহু গুনে জীবন ফিরে পেয়েছে। তার মাত এতসুন্দর করে কবিতার তালে তালে ছন্দ, কাফিয়া, রদিফ, রং, ঢং সহকারে উর্দু কবিতা অন্য কেউ লিখতে পারেননি। গালিব বলেন, যদি কোন কবিতা এমন হয় যে পাঠক তাকে সুন্দরভাবে সুর দিয়ে পাঠই করতে পারেনা তবে তাকে তো কবিতাই বলা চলে না। আর এরকম সুর ও সঙ্গীতের তান ছাড়া গজল গাওয়াটাতো কল্পনা করাই যায় না। কবিতার প্রতিটি পংক্তির একই রকম ওজন এবং কাফিয়াহ ও রদিফ দ্বারা গজলের সুর সঙ্গীত, তান-ভান ইত্যাদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এই সুর ও সঙ্গীত গালিবের উর্দু গজলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও শিল্পগুন।

গালিব তার কবিতা জগৎকে সুর ও সঙ্গীত দিয়ে সাজাতে খুবই পছন্দ করতেন। তার কবিতা পাঠ না করলে সে সুর ও সঙ্গীত সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। গালিবের আর্থিক, মানসিক, ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু তার পরও সকল অবস্থাতেও তিনি উর্দু কবিতাসমূহকে যথাযথভাবে সুন্দর সুর ও সঙ্গীতায়ন দ্বারা সমৃদ্ধ করার প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজস্ব সুর ও সঙ্গিত দ্বারা তার উর্দু কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে জনাব মজনু গুরখুপরী বলেন।

" مرزا غالب کے لئے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے ان کے کلام میں جو آہنگ یا ترنم ہوتا ہے وہ لفظی یا سطحی نہیں ہوتا بلکہ بڑا نہ دار اور گمبھیر ہوتا ہے ۔ ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فکر و احساس کے ارتعاشات الفاظ کے موفی ارتعاشات میں سما کر ایک راگ پیدا کر رہے ہیں جو بلیغ بھی ہے اور طربناک بھی اور جو ہمارے دل و دماغ دونوں کے لیے راحٹ آفریں ہے۔"[১৮]

(মির্যা গালিবের জন্য কাব্য সঙ্গিত এবং সঙ্গিত কাব্য। তাঁর কবিতার মধ্যে যে ঢং অথবা তারান্নুম পাওয়া যায় সেটা শুধু শাব্দিক অথবা কবিতার লাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং তার কবিতায় এ বিষয়টি খুবই গভীরের এবং গুরুগম্ভিরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের এমন ধারণা হয় যে, গালিবের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতি, উন্নত ধ্যান ধারণার

মধ্য দিয়েই একটি রাগ সৃষ্টি করেন যা খুবই চমৎকার এবং যা আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দেয়। )
ড. ইবাদত বেরলভীর মতামত হলো

"غالب کے یہاں غضب کا ترنم، موسیقیت اور نغمگی اور اس کا سبب یہ ہے کہ غالب کے یہاں کی فکر ہی مترنم ہے۔"[১৯]

(গালিবের উর্দু কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো রাগন্বিত অবস্থায়ও তার গজলের সুরও সঙ্গীত সৃষ্টি হয়। এর কারণ এই যে, গালিবের চিন্তায় এক ধরণের সুর তখন ধ্বনিত হতো।)
উর্দু কবিতাতে সুর তান ও সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য গালিব ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত একটি প্রতিভার নাম। আল্লাহ নিজেই গালিবকে উর্দু কবিতায় সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য এক আলাদা যোগ্যতা দান করেছিলেন। যার বাস্তব দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে নিম্নবর্ণিত কবিতায়-

جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز

آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔[২০]

তুমি তো অতি সুন্দরী ও সুশ্রী রূপ ও মনভুলানো চেহারার অধিকারী,

মনে হয় যেন তুমি চৌদ্দ তারিখের চাঁদের আলোর অধিকারী

অতিসুন্দর তোমার চেহারা

তবে পর্দার অন্তরালে কেন সে সুন্দর চেহারা?

গজলের রদিফ ও কাফিয়া ছাড়াও এই কবিতাংশে তিনটি আভ্যন্তরীণ কাফিয়াহ ব্যবহার করা হয়েছে। সে গুলী হলে دل فروز বা মন থেকে পছন্দ করার মতো, نیم روز বা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের আলো, نظارہ سوز বা প্রদর্শনীয় রূপ লাবণ্য ইত্যাদি।

মির্যা গালিবের সকল উর্দু কবিতা ও গজল ছিল সুর ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। কোন কোন গজলে এই সুর ও সঙ্গীত ছিলো খুবই প্রবল। নিম্নের একটি কবিতা তুলে ধরা হল-

کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنج فغاں کیوں ہو

نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو[২১]

কাউকে মন দিয়ে তুমি বিলাপের কান্না কাঁদছ কেন?

যখন হৃদয়ে মায়া নেই তবে মুখে তা বলছো কেন?

Dhaka University Institutional Repository

## শব্দ চয়ন

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শব্দ চয়ন । উর্দু কবিতায় মির্যা গালিবের সঠিক স্থানে সঠিক শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সকল উর্দু কবিগনের চেয়ে এক ব্যতিক্রম নাম। অধিকাংশ উর্দু কবি সাহিত্যিকগন কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সঠিক মানের শব্দ নির্বাচন ও সঠিক স্থানে ব্যবহার করতে অক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মির্যা গালিব এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর শব্দ চয়ন ছিলো সবচেয়ে উন্নত। নিম্নে উর্দু কবিতায় গালিবের শব্দ চয়ন ও ব্যবহার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হলো।

যে কোন সাহিত্য প্রণয়ন ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ধাপ হলো সঠিক মাপে শব্দ চয়ন। আর দ্বিতীয় ধাপ হলো সে সকল শব্দসমূহকে যর্থাথ ভাবে সাজানো। বিশেষ করে কবিতার বেলায় এ দুটি বিষয় সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু কবিতার শব্দসমূহ সুবিন্যাস্ত করা খুবই জটিল একটি বিষয়। উর্দু কবিতায় শব্দ চয়ন ও শব্দগুলো সঠিকভাবে সুবিন্যাস্ত করা যে বেশ কঠিন সে সম্পর্কে কবি শামছুর রহমান ফারুকী বলেন-

" شاعری کی زبان بڑتوڑی مڑوڑی زبان ہوتی ہے ۔ شعر کاوزن ، قافیہ و ردیف کی پہلے سے متعین جگہ لفظوں کی فطری ترتیب کو برقرار رہنے دیتے ۔ شاعری میں بول چال کی زبان کو ہر جگہ اہم مانا گیا ہےاور ہر شاعری کی ہمیشہ یہ آرزی ہے کہ بول چال کی زبان میں لفظوں کی جو ترتیب ہوتی ہے کسی طرح اس کے شعروں میں وہی ترتیب قائم رہئے مگر یہ کام ہے بہت مشکل ۔ غالب جیسے مشکل گوئی بھی یہی کوشش رہتی ہے اور زبان پر مکمل گرفت ہونے کے سبب وہ اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔[২২]

(কবিতার ভাষা খুবই এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। কবিতার ওজন, কাফিয়াহ এবং রদিফ নিয়মানুযায়ী প্রথমাবস্থায় যে ভাবে নির্দিষ্ট স্থানে থাকার কথা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কবিতা সে নিয়ম মান্য করে না। কবিতায় সর্ব সাধারনের মুখের কথা ও ভাষাকে সবাবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। সকল কবির সর্বদা এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, কবিতায় সর্বসাধারনের মুখের ভাষা ও কথাকে ভাষা হিসেবে যেকোনভাবে কবিতার মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিৎ। কিন্তু এটি খুবই জটিল বিষয়। মির্যা গালিবও এরকম চেষ্টা করে ছিলেন। গালিবের উর্দু ভাষার উপর পুরোপুরি আয়ত্ত থাকার কারণে তিনি তার চেষ্টায় সকলকাম হয়েছিলেন।)

যার বর্ণনা নিম্নোক্ত কবিতাসমূহে দৃশ্যমান ।

یہ کہاکی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح

Dhaka University Institutional Repository

کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا

ہاں وہ نہیں وفا پرست جاؤ وہ بے وفا سہی

جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی

کیوں ترا راہ گزر یاد آیا

دیا دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے۔

ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے

موج خوں سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے

آستان یار سے اٹھ جائیں کیوں

اے ساکنان کوچۂ دلدار دیکھنا

تم کو کہیں جو غالب آشفہ سر ملے[২৩]

(এটি কেমন বন্ধুত্ব, বন্ধু হয়েছে উপদেশদাতা

যদি সে সমব্যাথী হতো দুঃখকে বুঝতো

সে কোন অঙ্গিকার পূরণ করে না, সে তো অকৃতজ্ঞ,

যার সুন্দর মন ও ধর্ম আছে তার গলিতে তুমি কেন যাও?

জীবনটা এভাবেই অতিবাহিত হবে,

কেন তুমি অতীত জীবন স্মরণ কর?

মন যদি দিয়ে থাকি তাকে, সেতো মানুষ কী আর বলব তারে

হয় যদি প্রতিদ্বন্দ্বী তবে হউক, সে তো পত্র বাহক, কী আর বলব তারে,

রক্তের ঢেউ মাথা থেকে কেনই বা ঝড়বে না,

Dhaka University Institutional Repository

বন্ধুর বাসভবন থেকে সরেই বা যাচ্ছ কেন?

হে গলি পথে বসবাস কারী ভালোভাবে দেখো

তোমাদের এমন কে আছে  যার কপাল গালিবের মতো বিভ্রান্ত)

## অর্থের দ্বৈততা

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আন্দাজে বয়ান এর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে ইবহাম বা অর্থেও দ্বৈততা।  মির্যা গালিব তার উর্দু কবিতাসমূহকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য তিনি এমন এমন শব্দ কবিতার মধ্যে ব্যবহার করেছেন যার একাধিক অর্থ রয়েছে। গালিবের এরকম শব্দ ব্যবহার তার কবিতাকে উর্দু ভাষার অন্যান্য কবিদেরকে বিস্মিত করে তুলেছে। আর এ রকম শব্দ নির্বাচন করা খুব কম সংখ্যক উর্দু কবিদের ভাগ্যে জুটেছে। এরূপ দ্বৈততাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করার কারণেই মির্যা গালিবের উর্দু কবিতা আলাদা প্রাণলাভ করেছে। নিম্নে এরকম অর্থ্যের দ্বৈততামূলক শব্দ সম্ভলিত কবিতা নিয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

অর্থের দ্বৈততাই গালিবের উর্দু কাব্য প্রতিভাকে এক ধাপ এগিয়ে পাঠক শ্রেণির কাছে খুবই আর্কষণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ইব্হাম বা অর্থের দ্বৈততা উর্দু কবিতা ও কাব্যকে প্রহেলিকা হিসাবে তৈরি করতে না পারলেও কবিতার সৌন্দর্য এ আকর্ষণ অনেকখানি বৃদ্ধি করেছেন। উর্দু গদ্য সাহিত্যের আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্য হলো ভাষাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুবিস্তারে বর্ণনা করা।  এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বক্তার মনের মধ্যে যেসব কৌতুহল ও উদ্দেশ্য থাকে তা শ্রোতাদের নিকটে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা।

মির্যা গালিব এসব নিয়ম কানুন থেকে একদম ব্যতিক্রম। তিনি তার উর্দু কবিতার মধ্যে এমন কিছু দ্বৈততাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছে যার একেকটির উদ্দেশ্য একেক রকম।

অন্যদিকে উর্দু কবিতা গদ্যের বিপরিত। কারণ কবিতার একটি শব্দের মধ্যে কয়েকটি উদ্দেশ্য উদ্ভাবিত হতে পারে। মির্যা গালিব এই কৌশলকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি তার উর্দু কবিতায় অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন যার একাধিক অর্থ ও একাধিক উদ্দেশ্য থাকতো। মির্যা গালিবের এরকম দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ গ্রহণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ইবাদত বেরলভী বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

" غالب کی شاعری میں ابہام کا رنگ خاصا گہرا ہے لیکن اس کا سبب مشکل پسند نہیں ہے ۔ یہ رنگ تو ان کے تجربے کی تہ در تہ کیفیت کو ظاہر کرتا ہے ۔ اس میں تو ان کے فکر کی گہرائی اپنے آپ کو رونما کرتی ہے ۔ اس کا منبع ان کے احساس کی شدت، جذبے کی پر پیچ کیفیت، ان کی شعور کی گہرائی اور فکر کی بلند پروازی ہے۔"[২৪]

("গালিবের কাব্যে দ্বৈত অর্থবোধক শব্দ খুবই নিবিড় ও গভীরভাবে ব্যবহারের বিশেষত্ব রয়েছে। তবে গালিবের এরকম দ্বৈতার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা নিছক কবিতাকে কঠিন করে উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হলো উর্দু কবিতাকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলা, যাতে পাঠক বেশি আনন্দ উপভোগ করতে পারে। দ্বৈতার্থবোধকতার এই রূপ ও ঢং গালিবের অভিজ্ঞতার গভীর ধ্যান ধারণাকে প্রকাশ করেছে। গালিবের ভাবনার গভীরতার মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজেকে আয়নার মতো দেখতে পেতেন। তার এরকম গভীর অভিজ্ঞতার মূল উৎস হলো তার কঠিন অনুভূতি। আবেগের গভীর অবস্থা, তার জ্ঞানের ও উপলব্ধির গভীরতা এবং উন্নত চিন্তার উৎকর্ষ")

**গালিব নিম্নোক্ত কবিতায় বলেন-**

زندگی اپنی جب اس مشکل سے گزری غالب

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔[২৫]

নিজের জীবন যখন এভাইে চলছে গালিব

সর্বদা আমি এটাই মনে করি যে, খোদা এটা নছিবে রেখেছে।

আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে স্পস্ট বুঝা যায় যে, মহান কবি মির্যা গালিব কোন উদ্দেশ্য বা কোন ব্যাপারে অভিযোগের সুরে এই উর্দু কবিতাখানা উপস্থাপন করেছেন। এখানে শুধু একটি মাত্র অর্থ উদ্দেশ্য নয় বরং তার এ্ই কবিতা দ্বারা কয়েকটি অর্থের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। মন মস্তিস্ক কখনো একদিকে যায় তো আবার অন্যদিকে চলে যায়। কবিতার মধ্যে দ্ব্যার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার কারণে একটি উদ্দেশ্য বা একটি অভিযোগ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাচ্ছে না। কখনো মনে হয় কবি তার প্রেমিকার অঙ্গিকার ভঙ্গের প্রতি অভিযোগ করেছে, আবার কখনো মনে হয কবি তাকে অপমান করার জন্য অভিযোগ পেশ করছে, আবার এটাও হতে পারে যে, কবি প্রেমিকার ছোট মনের পরিচয় দেওয়ার প্রতি অভিযোগ করেছেন। এই তিনটি উত্তরই সম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু এর সঠিক উত্তর খোঁজার জন্য মন বিভিন্ন দিকে ভ্রমণ করছে। এর আসল উদ্দেশ্য জানার জন্য অনেক চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

দিওয়ানে গালিবের মধ্যে এরকম অনেক কবিতা আছে যাতে দ্ব্যার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার কারণে মির্যা গালিবের উর্দু কবিতাসমূহ পাঠকদের কাছে খুব আকর্ষণীয় হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

## কল্পনার উপকরণঃ

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আন্দাজে বয়ান বা পরিমাপ করে কথা বলার অন্যতম আরো একটি উৎস হলো কল্পনার উপাদান। মির্যা গালিবের কবিতাগুলী এমন যে, তিনি যা ভাবেন, যা পরিকল্পনা করেন তার উপকরণও তিনি তার উর্দু কাব্যে নিয়োজিত রাখেন। যাতে পাঠকগণের চিন্তায় কোন বেগ পেতে না হয়। কিন্তু গালিব ব্যতীত অন্যান্য উর্দু কবি সাহিত্যিকগণের উর্দু কবিতায় এরকম কবিতা পাওয়া যায় না যাতে ভাবনার ও কল্পনার উপাদান বিদ্যমান থাকে। এ বিষয়টি গালিবের কবিতায় সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। এরকম ভাবনার উপকরণ তার কবিতায় থাকার কারণেই তার উর্দু কাব্য সব শ্রেণির মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। নিম্নে গালিবের এমন উর্দু কাব্যপ্রতিভা নিয়ে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

যদি কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশ করা না যায় তাহলে পাঠক ও শ্রোতার কাছে কোন ভাবেই গ্রহনযোগ্য হবে না। পরিমাপ করে কবিতাচর্চা করার পাশাপাশি যদি কবিতার মূল ভাব বা সারাংশ নিয়েও চিন্তা ভাবনা না করা হয় তাহলে কবিতার প্রকৃত রূপ ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট ভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়।

প্রফেসর আল আহমাদ সরুর বলেন-

" فکر سے فن کو آب و تاب ملتی ہے۔"[২৬]

(চিন্তার মাধ্যমে বিষয় বস্তুর প্রাণবন্ততা ও জীবনশক্তি বৃদ্ধি পায়। )

যে কাব্য অন্তরের চাহিদা ও খোরাক যোগাতেই ব্যর্থ হয় তাকে কোন কাব্য বলা যায় না। উর্দু কবিতার বিষয়বস্তুর ভাব ও সারর্মম এমন হবে যাতে দৌহিক ও মানসিক উভয়ের চাহিদা বা খোরাক উপস্থিত থাকবে।

রর্বাট ফরাস্ট বলেন, কবিতা বা কাব্যর গুণ হলো ইহা দৌহিক ও মানসিক আনন্দ থেকে শুরু করে একদম অন্তরদৃষ্টি পর্যন্ত ব্যাপ্তি থাকে। শুধু আকর্ষনীয় করে বর্ণনা করার মাধ্যমেই মনের আনন্দ উপভোগ করা যায় না। চিত্রকল্প প্রতিচ্ছবি, সঙ্গীত, গান ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছাতে পারেনা। বরং এগুলি হলো কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য স্থলে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু হাতিয়ার স্বরূপ। যদি কবিতার মূলভাব ও সারমর্ম গুরুত্বপূর্ণ হয়। অভিজ্ঞতা যদি অর্থপূর্ণ হয় তাহলে আনন্দ বিনোদন পাওয়া যায়। [২৭]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, মির্যা গালিব তাঁর উর্দু কাব্য দুনিয়াকে অনেক কিছুই দান করেছেন। তিনি যেমন উর্দু গজলকে খুবই চিন্তা ভাবনা করে রচনা করেছেন এবং পাঠকদের তার কবিতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন । মির্যা গালিবের কাছে উর্দু গজল, কবিতা, শ্লোক, খেলনার পাত্রের মতো । স্থানকাল পাত্রভেদে তিনি তা ব্যবহার করতেন। গালিব বলেন-

ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا[২৮]

(বিশেষ ভঙ্গিতে কবিতা পাঠের জন্য গালিব পৃথিবী ব্যাপি জ্ঞানের সাগর)

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই গালিবের উর্দু কাব্যের জন্য এক বিশেষ দান। আর এই বিশেষত্বই গালিবের জীবনে খেলার জাদুমনস্ক দান করেছে। তাইে প্রফেসর রশিদ আহমেদ সিদ্দিকী গালিবের দেওয়ানকে দিল্লির তাজমহলের সাথে তুলনা করেছেন। গালিবের দেওয়ান সম্রাট শাহজাহানের দানের মতোই।

## দুর্বোদ্ধতাঃ

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আরো একটি শিল্প হলো দুবোদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা। উর্দুভাষী কবি ও সাহিত্যিকগণ যারা গালিবের উর্দু কবিতা অধ্যয়ন ও গবেষনা করেছেন তারা সবাই একমত পোষন করেছেন যে, গালিব তার উর্দু কাব্যে অসংখ্য কঠিন থেকে কঠিন শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগ করেছেন এবং অনেক উর্দু কবি ও পাঠক অতি সহজেই তার কবিতা পাঠ করে কবিতার মূল বিষয় সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করতে পারেন না। এরকম দুর্বোদ্ধ শব্দ ব্যবহার করার সাহস উর্দু কবিদের মধ্যে এক মাত্র মির্যা গালিবই পেরেছেন। আর এজন্য মির্যা গালিব অনেক কবিদের কাছে হাসি ও সমালোচনার মুখোমুখিও হয়েছেন এবং এর জন্য তাকে অনেক জওাবদিহিও করতে হয়েছে। কখনো কখনো কঠিন তোপের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও মির্যা গালিব কখনো বিচলিত হন নি, বরং সেগুলিকে তিনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা বলেই মনে করতেন। মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় এরকম দুর্বোদ্ধ শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কবিতা পাঠ করে যদি আনন্দ না পাওয়া যায়, অন্তরাআত্মা যদি সুখ না পায় তবে তাকে কোন কবিতাই বলে যায় না, বরং তাকে অন্য কোন কিছু বলে। কোন কোন কবিতার শ্লে-াক এমন হয় যে, তা মন ও মগজকে প্রশান্তি না দিয়ে মনকে দু:শচিন্তায় ফেলে দেয়। মির্যা গালিবের প্রথম যুগের কবিতাসমূহের মধ্যে নৈপুণ্যতা ছিল। আবার তার উর্দু কবিতার অন্যান্য দিকসমূহ আমাদেরকে ধাঁধায় ফেলে দেয়। গালিব তার কবিতার অন্তরালে কি বলতে চান কীই বা তার উদ্দেশ্য এসব বিষয়ে পাঠক সমাজকে গোলকধাঁধায় নিপাতিত করেন। প্রফেসর মুহাম্মাদ মুজিব বলেন –

Dhaka University Institutional Repository

" غالب کے ابتدائی زمانے کے بہت سے شعر معنی آفرینی نہیں معمار آفرینی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ان کا شعری سفر وہیں رک جاتا تو شاید آج کوئی ان کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا۔ غالب پختہ تنقیدی شعور رکھتے تھے انہوں نے تو مشفی کے زمانے کا مشکل فارسی آمیز کیف کلام رد کر دیا۔ کچھ شعر بطور نمونہ باقی رہنے دیے۔"[২৯]

(গালিবের কাব্যের প্রথম যুগের কবিতাগুলী পাঠকদের কাছে তার সঠিক অর্থ স্পষ্টভাবে বোধগাম্য হয়নি বরং ভাবার্থ ও রূপক অর্থই বুঝা যেতো। যদি তার কবিতা জগতের পরিভ্রমণ সেভাবেই থেকে যেতো তাহলে আজ গালিবের নাম ও গালিবরে কবিতা সাধারন পাঠকের কাছে অজানাই থাকতো।)

মির্যা গালিব অতি সাধারণ বিষয়কে অনেক সময় খুব কঠিন করে বণর্না করতেন যা বুঝতে সাধারণ পাঠকদের অনেক কষ্ট হতো। সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

তিনি কখনো কখনো গালিব সাধারণ ও সহজ বিষয়কে ঈঙ্গিত ও রূপক অর্থের পর্দার অন্তরালে নিমজ্জিত করতেন। উদাহরনস্বরূপ নিম্নোক্ত কবিতাটি হলোঃ-

یک الف بیش نہیں صیقل آئینہ ہنوز

چاک کرتا ہوں میں جب سے کہ گریبا سمجھا

چھوڑا مہ نخشب کی طرح دست فضانے

خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔[৩০]

এক মুহুর্তেই আয়নাতে নিজের চেহারা দেখা যায়

আমি শুধু ঘুরে বেড়াই, বুঝতে পেরেছি যখন আমি গরিব

মৃতু পর্যন্ত আমি মদ পান করা ত্যাগ করেছি

সুর্যাস্ত পর্যন্ত তার সমকক্ষ কেউ হতে পারেনি

গালিব কখনো কখনো অতি সহজ শব্দ এমন কঠিনভাবে বর্ণনা করতেন যে, শ্রোতা ও পাঠকগন সঠিক অর্থ খুজতে গোলকধাঁধায় পড়ে যেতেন। পাঠকগন সম্মিলিতভাবে সাধনা করে অনেক কষ্টে সমাধানে পৌছতেন। নিম্নে এসর্ম্পকে উদাহরণ হিসাবে গালিবের কিছু কবিতা তুলে ধরছি।

قید میں یعقوب لی گونہ یوسف کی خبر

*Dhaka University Institutional Repository*

لیکن آنکھیں روزن دیوار زنداں ہو گئیں۔[৩১]

যদি ও ইয়াকুব লয়নি খবর,  তবু তার আকুলতা

ইউসূফ কারায় চোখ পেতে  রাখে আলোক ছিদ্র যথা

جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق

میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزاں ہو گئیں۔[৩২]

(আখিজল ধারা বইতে দাও গো বিরহে কালো রাতে

এ দু'টি উজ্বল বাতির আলোক জাগুক আমার সাথে।)

মির্যা গালিবের কাব্য কঠিন হওয়ার জন্য কয়েকটি কারন ছিলো। কারণগুলো নিয়ে নিম্নে আলোচনা করছি।

প্রথমতঃ তার কবিতার মধ্যে ফার্সি ভাষায় শব্দ থাকার কারণে তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে পাঠ করতে যেমন কঠিন হতো তার অর্থ বুঝতে আরো বেশি কঠিন মনে হতো উপলব্ধি করতে।  উদাহরন স্বরূপ একটি কবিতা নিম্নরূপঃ

شمار سبحہ مرغوب بت مشکل پسند آیا

تماشائے بہ یک کف بردن صد دل پسند آیا[৩৩]

(তাসবিহ পাঠ প্রতিমার সুন্দর্য  বর্ণনা সহজেই পছন্দ হয় না

কিন্তু হাতের তালুর জাদু দেখার তামাশা হাজার মন পছন্দ করে।)

উলিখিত দুটি পংতিতেই  آیا এর স্থানে যদি শুধু آمد বসানো যায় তাহলে কবিতাটি পুরোপুরিভাবে ফার্সী হয়ে যায়। আর এজন্যই গালিবের কবিতা খুব কঠিন।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় গালিব যখন কবিতা চর্চা শুরু করেন তখণ তার কাছে ফার্সী কবিদের কবিতা বেশী নজরে পড়ে। গালিব "বিদেল" এর কবিতাকে বেশি অনুসরণ করতেন, এবং তার মতো করেই রং, ঢং দিয়ে কবিতা লিখতেন। বিদেলের কবিতা বুঝতে অনেক কষ্টকর ছিলো, বিদেলের দেখাদেখি গালিবও সে রকমই কঠিন ভাষায় কবিতা রচনা করা শুরু করেন।

তৃতীয় কারণ হলো গালিব উর্দু কবিতা লিখতেন খুব উন্নত চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে। এত উন্নত ভাবনার মাধ্যমে কবিতা রচনা করার কারণে উর্দু কবিতার পাঠকগণ গালিবের কবিতা বুঝতে পারতো না। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালি পরামর্শ দেন যে, চিন্তা দর্শনকে সবর্দা আকলের নিয়ন্ত্রাদিন থাকা দরকার।

মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন আযাদ, আবে হায়াতের মধ্যে মির্যা গালিবে কবিতার কাঠিন্য ও অতিমাত্রা উচু চিন্তা-চেতনার কাব্য সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি লিখেছেন

" بعض بلند پرواز ایسے اوج پر جائیں گے آفتاب، تارا ہو جائے گا اور بعض ایسے اڑیں گے کہ اڑ ہی جائیں گے۔"[৩৪]

(কিছু উন্নতমানের ও উচ্চাঙ্গের কবিতা এমন জায়গায় গিয়ে পৌছিয়েছে যে, তা যেন সূর্য ও তারার মতো ধরা ছোয়ার বাইরে, আর কিছু এমন অন্তরালের জিনিস যা সবর্দা পর্দার অন্তরালেই থাকে")

তিনি অন্যত্র বলেন-

" اور ایک جگہ لکھتے ہیں : " اکثر شعرا ایسے اعلی درجۂ رفعت پر واقع ہوئے ہین ہمارے نارسا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔"[৩৫]

(অধিকাংশ কবিগণ এমন উচ্চস্থানে আরোহন করেছেন যে, আমাদের মতো দূর্বল মাথা সে স্থানে পৌছানো অসম্ভব।")

গালিবের সময়কার অনেক মানুষ ছিলেন যারা গালিবের কবিতা কঠিন হওয়ার অভিযোগ করেছেন। আর সেটা সেই সময় ছিলো যখন বাহাদুর শাহ জফর বাদশার উস্তাদ ছিলো কবি "যওক" যার সুনাম ও সুখ্যাতি অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্তি ছিল। "যওক" বাদশাহর উদ্দেশ্যে তোষামদমূলক কবিতা রচনা করতেন। এমতাবস্থায়, মির্যা গালিবের মতো এরকম কঠিনও পেছানো মনোভাব এবং দূর্বোদ্ধ বর্ণনাকে সহজভাবে মানুষের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার মতো লোক পাওয়াও ছিল দুস্কর। কিন্তু তাঁর অভিযোগ কারীর অভাব ছিল না। ঐ সময়ের এক কবি আগাজান ইশ্ক এর একটি বিখ্যাত কবিতা-

اگر اپنا کہا تم آپ سمجھے تو کیا سمجھے

Dhaka University Institutional Repository

مرا کہنے کا جب ہے اک کہے اور دوسرا سمجھے۔

کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے

مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے[৩৬]

যদি তুমি তোমার কথা তুমি নিজেই বুঝ, তাহলে আমরা কী বুঝবো,

মজাদার বলার মতো আছে, তুমি একটা বলে অন্যটা বুঝাও,

মীরের কবিতা বুঝা যায়, এবং মির্যার ভাষা বুঝা,

কিন্তু তোমার কথা তুমিই বুঝ অথবা খোদা বুঝে।

মির্যা গালিব নিজেও বুঝতে পারতেন এবং অনুভব করতে পারতেন যে, তাঁর কবিতাগুলো দুর্বোদ্ধ ও কঠিন। এজন্য মানুষ তাকে অসম্মান করে সেটাও সে বুঝতো। তাইতো গালিব উর্দু কবিতা ও গদ্যে দু'স্থানেই আফসোস করে বলেছেন; এমন কোন ব্যক্তিকে পেলামনা যে আমার কথাগুলী অন্যদের কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিবে। একটি রুবায়ী'তে তিনি অভিযোগ করেন-

مشکل ہے زبس کہ کلام میرا اے دل

سن سن کے جسے سخنوران کامل

آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش

گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل[৩৭]

আমার কথা কঠিন হে আমার মন

শুনেছি যাকে বলে পরিপূর্ণ শিল্প,

সহজ ভাষায় কবিতা, পাঠ করার অনুরোধ করছে

কিন্তু আমি শুধু কঠিন বলি।

এ কবিতা বর্ণনা করার মাধ্যমেই বুঝা যায় মানুষের অপমান ও অবজ্ঞা তাকে খুবই তিক্ততা করেছিল। কারণ লোকেরা গালিব কে অর্থহীন কবিতা রচনাকারী বলে গালি দিত। কিন্তু গালিব তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پروا

گر نہیں ہیں مرے اشعار میں معنی نہ سہی۔[৩৮]

গালি দেওয়া ও বদ দোয়ার আশা আমি করি না,

যদিও আমার কবিতাগুলি হয় অর্থহীন।

আসল ব্যাপার হলো গালিব দুর্বোদ্ধ কবি ছিলেন, এবং তিনি এমন.এমন কবিতা বর্ণনা করেছেন যার অর্থ বুঝে আসতো না। কিন্তু অনেক কবিতা তিনি অনেক সহজ ভাষায় লিখতেন। কোন কোন কবিতা এমনভাবে লিখতেন যেখানে তার ব্যক্তিগত জীবনের সকল দু:খ বেদনার কথা এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, মনে হয় দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের বেদনার ও কষ্টের কথাই তিনি বলছেন- অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের দু:খ-বেদনাকে তিনি নিজের মতো করে কবিতায় তুলে ধরেছেন। এমনি একখানা কবিতা নিম্নরুপ-

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔[৩৯]

গালিব যা বলেছে, সেগুলোকে ভালোভাবে উপলব্দি করা উচিৎ,

আমি বুঝতে পেরেছি একথাগুলি আমার অন্তরেও আছে।

পরিশেষে বলা যায়, দুনিয়ায় মির্য গালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী ভক্তবৃন্দের কোন অভাব ছিলনা। কিন্তু সকল বড় বড় কবি সাহিত্যিকদের একটি অভিযোগ থাকে যে, আমি এর চেয়েও বেশি পাওয়ার উপযুক্ত ছিলাম। মির্যা গালিবের প্রতি সবার সম্মান প্রদর্শন ও গালিবকে মান্য করার মতো লোকের অভাব ছিলনা, তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মির্যা গালিব যতটুকু কদর বা সম্মান পেয়েছেন তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তবে মির্যা গালিবের কবিতার প্রসিদ্ধি ও ব্যাপকতা তার মৃত্যুর পরেই বেশি হয়েছে। আর এ কথাটি মির্যা গালিব নিজেই জীবীত থাকাকালীন বলেছেন যে, আমার কবিতা সমূহের প্রতি মানুষের সম্মান, প্রচার প্রসার ও গুরুত্ব আমার মৃত্যুর পরেই বেশি হবে ।[৪০]

**কল্পনাস্ফুরণ**

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আরো একটি শিল্প হলো কল্পনাস্ফুরণ। । গালিবের উর্দু কবিতার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে হলে অনেক উচ্চ মাপের Thinking বা ভাবনা থাকা দরকার। কারণ কবিতা দেখা মাত্রই তার অর্থ বোধগম্য হওয়া ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার

Dhaka University Institutional Repository

মতো কবিতা মির্যা গালিব খুব কমই বলেছেন। গালিবের উর্দু কবিতা বুঝতে হলে থাকতে হবে বুদ্ধির গভীরতা। গালিব সর্বদা তার উর্দু কবিতার আসল উদ্দেশ্য উদঘাটন করার জন্য ভক্তদের গভীর সমুদ্রে নিপতিত করতেন। নিম্নে গালিবের উর্দু কবিতার এরকম শিল্প নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশায়াল্লাহ।

উর্দূ কবি ও সাহিত্যিক এবং উলামাগন বলেন কাব্য সম্ভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো চিন্তা কল্পনার স্ফুরণ। আর এই কল্পনার স্ফুরণ ছাড়া কাব্য চর্চা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যে কবির চিন্তা কল্পনার জগৎ যত বেশী শক্তিশালী হবে তার কবিতা অন্যদের থেকে তত বেশি উন্নত হবে।

গালিবকে যে জিনিসটি অন্য কবিদের থেকে আলাদা বুঝাতে সাহায্য করেছে তা হলো তার কল্পনার স্ফুরণ।

মির্যা গালিবের কল্পনার স্ফুরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উন্নততর গবেষনার জগতে পরিভ্রমণ করা। মির্যা গালিবের কাছে এমন শক্তি ছিল যে, তিনি বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে মুহুর্তের মধ্যেই একত্র করতে পারতেন। যে কবির কবিতার এরকম শক্তি যত বেশি থাকবে তার কবিতা তত বেশি আকর্ষনীয় হবে।

আমরা যদি কোন একটি বিষয় কে লক্ষ করি তাহলে আমাদের চোখের দৃষ্টি ঐ একটি মাত্র বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। উর্দূ সাহিত্যের মহান কবি মির্যা গালিবের অন্তর দৃষ্টি এক জায়গাতে স্থির থাকে না, কোথায় কোথায় যে, তার দৃষ্টি ছোটাছোটি করে তা কেবলমাত্র তিনিই বুঝতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি ফুল যেটাকে দেখে কবির অনেক সময় তার প্রিয়ার সুন্দরী চেহারার কথা মনে পরে, কখনো এ ফুলটি আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আবার কখনো জীবনের আফসোস ও ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে দেয়, এ রকমভাবে নতুন নতুন বিষয়কে জানার জন্য নতুন নতুন পন্থার দরজা খুলে যায়। [৪১]

মির্যা গালিবের ছাত্র-মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী লিখেন, কল্পনাশীল হওয়া ছাড়া কোন কবিই উঁচুমানের কবি হতে পারেনা। কল্পনাশীল উর্দু কবি অনেকেই আছেন এবং তারা কল্পনাস্ফুরণকে অনেক গুরুত্বও দেন। তবে সে চিন্তাভাবনা অবশ্যই আকলের অধীন ও অনুসারী হতে হবে। সে কল্পনাস্ফুরণ যেন লাগামহীন ভাবে এতো উঁচুতে গিয়ে না ওঠে যা আকাশের শীর্ষে গিয়ে ভ্রমণ করার পথ খুঁজে পায়। তবে সে সকল কবিতা জনসাধারণের কাছে অর্থহীন হয়ে থাকে। আর মির্যা গালিবের বেলায় সেরকমই হয়েছিল। মির্যা গালিবের এমন একটি কবিতা নিম্নরূপ-

بدگمانی نے نہ چاہا اسے سرگرم خرام
رخ پہ ہر قطرہ عرق دیدۂ حیراں سمجھا۔[৪২]

কুদৃষ্টি লালনকারী চালাকী করে দ্রুত পথ চলে,
কপালের প্রতিটি ঘামের ফোটা দু:শ্চিন্তাই প্রদর্শন করে।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রাতিরিক্ত চিন্তা পাঠককে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে গালিব বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তার প্রিয়া এতোই দুর্বল যে, গতি থেমে যাওয়াতে তার চেহারায় ঘাম ঝরছে। চেহারায় অস্থিরতার ছাপ দেখা যাচ্ছে। এখানে ঘামের ফোটাকে চোখের মণির সাথে তুলনা করা হয়েছে। ইহা দ্বারা এই কু-ধারনা হলো যে, অসংখ্য চোখ চেহারার উপর ঝুলানো আছে। এরকম বুঝতে হলে খুবই উচ্চমনের চিন্তা বা কল্পনাশীল হতে হবে। এতে কোন প্রশান্তি লাভ করা যায় না, মগজ ব্যথিত হয়। অনেক চেষ্টা সাধনার পরে কবিতার উদ্দেশ্য হয়তো বুঝা যায় তবে তাতে অনেক ঘাম ঝড়াতে হয়। অনেক ঝামেলা পোহানোর পরই উদ্দেশ্য রপ্ত করা যায়।

মির্যা গালিবের কবিতাতেই তার চিন্তা কল্পনার চিত্র কল্প খুজে পাওয়া যায়। তিনি জীবন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার পর সেগুলী মানুষের সামনে বর্ণনা করতেন। যাতে কোথায় দু:খ দুর্দশার কথা কোথাও বদনসিব ও হতাশার কথা আবার কোথাও বা আল্লাহ তায়ালার রহমাতের কথা, মনের কষ্টের কথা, অবর্ননীয় দু:খ কষ্টের কথা বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, গভীর কল্পনার সাথে তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। [৪৩]

নিম্নে দিওয়ানে গালিবের একটি কবিতা তুলে দেওয়া হল-

قید حیات وبند غم دونوں اصل میں ایک ہیں

موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔[৪৪]

জীবনের খাচা এবং দু:খ কষ্ট আসলে দুটি সমান ,

মৃত্যুর পূর্বে মানুষ কীভাবে চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তিপাবে।

মানুষের জীবন তথা এই দুনিয়া এবং দুনিয়ায় বাঁচতে হলে, চলতে হলে সকল দু:খ জ্বালা সব কিছুই মানুষকে সইতে হবে। এই জালা ও কষ্ট এবং ব্যর্থতার হাত থেকে কোন মানুষই মৃত্যুর পূর্বে মুক্তি পাবে না।

গালিবের অধিকাংশ কবিতাসমূহে নিজের জীবনের চিত্র কে অত্যন্ত অলংকারের সাথে বর্ণনা করেছেন। এবং অনেক সহজ শব্দের মধ্যে গভীর অর্থবোধক শব্দ লুকায়িত রাখেন। যেমন সমুদ্রের গভীর তলদেশে পানির নিচে মণি মুক্তা লুকায়িত থাকে তার কবিতার প্রতিটি শব্দের মধ্যে লুকানো থাকে তার গভীর চিন্তা কল্পনারস্ফুরণ, এবং এমন এমন কবিতা বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে অনেক উচ্চমাপের কল্পনাস্ফুরণ বিদ্যমান। [৪৫]

এ সম্পর্কে দিওয়ানে গালিবের একটি কবিতা নিম্ন রূপ-

نیند اس کی ہے دماغ اس کی راتیں اس کی ہے

تیری زلفیں جسکے بازو پر پریشاں ہو گئیں۔[৪৬]

ঘুমটি তার স্বপন্ তার এই রাত ও তারই

Dhaka University Institutional Repository

তার কেশের সৌন্দর্য যার উপর পড়বে সে অস্তির হয়ে উঠবে

এখানে মির্যা গালিবের ভক্তদের উদ্দেশ্য বক্তব্য হলো গালিবের উর্দু কবিতাতে উচ্চ মাপের কল্পনার থাকা সত্ত্বেও গালিরে দিওয়ানে এমন অনেক কবিতা আছে যা মির্যা গালিবকে উর্দু কবিদের মধ্য হতে অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দান করেছে শুধুমাত্র এই উচ্চাংঙ্গের কল্পনাস্ফুরণ থাকার কারণে।

মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী ইয়াদগারে গালিবের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। তার এই উচ্চ মাপের কল্পনা দর্শনের কারিশমাই মির্যা গালিবের মাটির পাত্রকে পারস্যের এক প্রখ্যাত নৃপতি, অর্থাৎ তিনি এমন একটি পানপাত্র তৈরি করেছিলেন যাতে পৃথিবীর সব কিছুর আবস্থা প্রতক্ষ করা যেতে গালিবের মাটি পাত্রটি তার চেয়ে উন্নত পানপাত্র এর মর্যাদা লাভ করেছিলেন। [৪৭]

নিম্নে গালিবের দিওয়ান থেকে এরকম একটি কবিতা বর্ণনা করছে্

بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گئے

ساغر جام سے مرا جام سفال اچھا۔[৪৮]

পাত্র ভেঙ্গে গেলে বাজার থেকে
আরো একটি নিয়ে আসে
জামের পাত্র থেকেও আমার মাটির পত্র ভালো।

মির্যা গালিব এভাবে বিভিন্ন ধরণের জিনিসকে একত্রে বর্ণনা করতে সক্ষম ছিলেন। এটি তার উর্দু কবিতার আরো একটি শক্তি যার মাধ্যমে গালিবের উর্দু কবিতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। যেমন ফুলের সুঘ্রান, মনের নালা, বাতির আলো ইত্যাদি বিষয়গুলোকে তিনি একটিমাত্র কবিতার মধ্যে আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেছেন।

নিম্নে গালিবের কবিতাটি বর্ণনা করা হলো

بوئے گل، نالہ دم، دور چراغ محفل

جو تری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔[৪৯]

ফুলের সু-ঘ্রান, অন্তরের কান্না, সমাবেশের আলো
তোমার সমাবেশ বা পৃথিবীতে যা পাই তা কষ্টেই পাই

## চিত্তাকর্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আরো একটি আর্ট বা শিল্পরূপ হলো دل نشینی বা চিত্তাকর্ষণ। গালিবের উর্দু কবিতা পাঠ করলে, উর্দু গজল শ্রবণ করলে তা হৃদয়ের গভীরে আনন্দের হিল্লোলে বইয়ে দেয়। যা উর্দু সাহিত্যের অন্য কোন কবির কবিতায় পাওয়া যায় না। গালিবের কবিতা ও গজলের মন মাতানো সুরে অতি বৃদ্ধ ও মৃতপ্রায় হৃদয়ও পূর্ণ যৌবনের শক্তিতে পুনরুজ্জীবীত হয়ে আনন্দে নেচে ওঠে। নিম্নে মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার এমনকিছু শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার শিল্পরূপ " دل نشینی" বা চিত্তাকর্ষণকে উর্দু কবিতার সমালোচকগণ অতি আবেগ ও পরিকল্পনা এ দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচকগণ বলেন, মির্যা গালিবের হৃদয়ের গভীরে Intellectual thinking বা পান্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা এবং কাব্যিক কল্পনা এ দুটি সৌন্দর্য উপস্থিত ছিলো। যা তিনি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে তার উর্দু কবিতায় প্রকাশ করেছেন। আর এ কারণেই তার উর্দু কবিতা ও গজল পাঠকের হৃদয়কে পরশ পাথরের ছোঁয়া দিয়ে অতি সহজেই তাদের মনের মণিকোঠায় স্থান দখল করে। গালিবের চিন্তা - চেতনার মাধ্যমে তার কবিতার মধ্যে গভীরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং কল্পনা জগতের মাধ্যমে কাব্যিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। গালিব সব সময় তার তার জ্ঞানগর্ব আলোচনাকে কাব্যিক ভঙ্গিমায় পেশ করেছেন। এ কারণেই তার উর্দু কবিতাগুলীর মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। মির্যা গালিব বলেন, যদি কোন চিন্তা -চেতনাকে কাব্যিক বর্ণনাভঙ্গিতে উপস্থাপন না করা যায় তাহলে তাকে কবিতা বলা যায় না বরং তাকে তখন বলা যাবে ছোট্ট কোন ঘটনা বা ছোট্ট কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা।

মির্যা গালিবের বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে আল্লামা ইকবাল নিম্নোক্ত কবিতাটি বর্ণনা করেন।

حق اگر سوزے ندارد حکمت است

شعر می گردد چو سوز از دل گرفت۔[৫০]

সত্য কথা যদি মনের দু:খ দুর না করে
তাতেও হিকমত আছে
মনের যত দু:খ আছে কবিতা পাঠে তা দুর হয়েছে।

আল্লামা ইকবাল বলতে চান, মানুষের মনে যখন দু:খ-কষ্ট থাকে, যার কারণে সে শোঁকে আর্তনাদ করতে থাকে। তখন হাজারো মিষ্টবাণী বা গল্প শুনিয়ে তার মনের জ্বালা দুর করা যায় না। এরূপ দু:খ-বেদনা শুধু কবিতা ও সঙ্গীতের দ্বারা দুর করা যায়। আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে মির্যা গালিবের এই দার্শনিক ও পণ্ডিত্যপূর্ণ মনোভাব ও চিন্তা-চেতনা তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা গালিব তাঁর দার্শনিকপূর্ণ চিন্তা ও পান্ডিত্যপূর্ণ কথামালা অতি সহজে সমগ্র শ্রোতা ও পাঠকদের হৃদয়ে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। নিজের সম্পর্কে শ্রোতাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে রাখার জন্য অসংখ্য উর্দু কবিতা উপহার দিয়েছেন।
গালিব নিজেই নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করে শুনিয়েছেন।

حسن فروغ شمع سخن دور ہے اسدؔ
پہلئے دل گداختہ پیدا کرئے گوئی۔[৫১]

সুন্দর ও উজ্জ্বল জীবন, সূর্যের মতো
আলোকিত বাণী অনেক দূরে হে আসাদ,
সর্বাজ্ঞে নিজের মনকে সত্য ও ন্যায়ের
পথে দ্রুবিভূত করাই আসল কথা।

মির্জা গালিব উল্লেখিত কবিতার মাধ্যমে একথা বলতে চাচ্ছেন যে, জীবনের সুখ-শান্তি আনন্দ-বিনোদন পাওয়ার আগে মানুষকে প্রকৃত মানুষ হতে হবে। নিজের মন ও চিন্তাকে সর্বপ্রথম অন্যের কল্যাণে নিয়োগ করতে হবে। তাহলেই কেবল মানুষেরা প্রকৃত মানুষ হতে সক্ষম হবে।

সারকথা এই যে, যদি কবিতার মধ্যে আপন কলা কৌশল, চিন্তা ভাবনা, আবেগ অনুভূতি ও রং বৈচিত্র সম্পৃক্ত না থাকে তবে সে সকল কবিতা নিজের মান ও মর্যাদা ধরে রেখে দেশ ও জাতির জন্য কোন কল্যাণ করতে পারে না। তা অরক্ষিত ও অগচ্ছিত ভাবে পড়ে থাকে। আর যদি কোন কবিতার মধ্যে আবেগ অনুভূতি ও চিন্তা ভাবনা এ দুটি সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে তাহলে তা শ্রোতা ও পাঠকদের মন আকর্ষণ করে। [৫২]

নিম্নে এরকম আকর্ষণীয় ও আবেগ অনুভূতি মিশ্রিত গালিবের কিছু কবিতা তুলে ধরা হলো-

ہے تجلی تیری سامان وجود

ذرہ ہے پر تو خورشید نہیں۔[৫৩]

হে প্রভূ আছে তোমার আলোক ও সাজ সজ্জা,

আরো আছে অস্তিত্ব তোমার,

নেই বিন্দু মাত্র সংশয় যদি না থাকে তবে সূর্যের আলো।

غم ہستی کا اسد کس سے ہو مرگ علاج

Dhaka University Institutional Repository

شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک[৫৪]

(জীবন জ্বালার হয় উপশম, আসাদ আসে মরণ যদি

প্রদীপ কে তো জ্বলতে-ই হয় সকাল আসার আগ অবধী)

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

درد کا حد سے گذرنا ہے دوا ہو جانا[৫৫]

আনন্দের বিন্দু বিন্দু ফোটা কখনো সাগরে বিলিন হয়ে যায়
সীমাহিন কষ্টকে সহ্য করাই কষ্টের মহাঔষধ।

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے

مرے تبخانہ میں تو کعبہ میں گاڑ دو برہمن کو۔[৫৬]

প্রভূকে মহা শক্তিধর মেনে প্রভূভক্ত থাকাই আসল ঈমানের পরিচয়,
আমার বন্দেগীর চৌকি আমি কাবাঘরে রেখেছি ব্রাহ্মণকে ছেড়ে তাই।

আলোচ্য কবিতাগুলির মাধ্যমে মহান কবি মির্যা গালিব তাঁর আন্তরিক আবেগ-অনুভূতি ও গভীর চিন্তা ভাবনার পরোক্ষ মনোভাব ও প্রত্যক্ষ চিত্র দ্বারা তার কবিতার পাঠকগণ ও শ্রোতাগণকে নিজের প্রতি ও তার উর্দু কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। কারণ উপরিউক্ত প্রতিটি কবিতাংশে তার গভীর চিন্তা চেতনায় আবেগ অনুভূতি ও চিত্রাকর্ষণে ভরপুর।

প্রথম কবিতাংশে গালিব প্রভূকে ও তার প্রিয়াকে সকল রূপ সজ্জায় সজ্জিত দেবতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি প্রভূকে উদ্দেশ্য করে প্রশংসা করে বলেন হে প্রভূ! আপনিই তো চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকামণ্ডলিকে স্বীয় আলো দান করেছেন। যদি কোন সময় কোন কারণে এগুলী ধ্বংস হয় এবং পৃথিবী আলো বিহীন থাকে তাহলে আপনার বিন্দুমাত্র সমস্যা হবে না। কবি এখানে তার আন্তরিকতা ও আবেগ নিংড়ানো অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয়য় কবিতাংশে কবি আরো High thought উচ্চাঙ্গের চিন্তা-ভাবনা, আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। বাহ্যিক ও শারীরীক যত বড় কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিই হোক না কেন পৃথিবীতে অনেক আগ থেকেই তার আরোগ্য বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বা মনের ভিতরগত কোন রোগ হলে তা জাগতিক কোন ঔষধ দ্বারা দুর করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না। বরং তার জন্য দরকার হলো তার প্রিয় মানুষ বা প্রিয়তমাকে কাছে পাওয়া। কারণ তিনিতো তার কারণেই মানুষিকভাবে ভীষণ অসুস্থ। আর মানুষের তৈরি আলো তখনই প্রয়োজন হয় যখন প্রকৃতির আলো নিভে যায়। সূর্যের আলো যখন থাকে না তখন রাত হয়, আর তখন প্রদীপের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু প্রভাতে যখন সূর্য তার কিরণ দিতে শুরু করে তখন আর প্রদীপের আলোর দরকার হয় না। এ সবই গালিবের মনের গভীর চিন্তা ভাবনা ও চিত্রাকর্ষণ।

তৃতীয় কবিতাংশে কবি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যারা দুনিয়াতে এক সময় অনেক সুখ-শান্তি পেয়ে প্রভূকে ভুলে গিয়ে বিলাসিতায় মত্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাদের কর্মের কারণে সে সুখ ও আনন্দ স্থায়ী থাকে না, সে আনন্দ ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু ফোটার মতো সাগরের পানির সাথে মিশে যায়। তাই মহান কবি মির্যা গালিব মানুষকে উপদেশ দেন যে, দু:খ ও কষ্টকে সহ্য করাই দু:খ কষ্টের মহাঔষধ। মহান আল্লাহ মানুষকে যে অবস্থাতেই রাখেন তাতে সন্তুষ্ট থাকাই সফলতা ও স্বার্থকতা। মির্যা গালিব এখানেও তার আবেগ অনুভূতি ও মনের গভীর চিন্তা-চেতনা ছুড়ে দিয়েছেন ভক্তদের উদ্দেশ্যে । আর এ কারণে তার ভক্তগণ তার উর্দু কবিতার প্রতি এতো বেশি আকৃষ্ট থাকেন যা অন্য আর কারো বেলায় দেখা যায়না।

চর্তুর্থ কবিতাংশে মহান কবি মির্যা গালিব তার সর্বোচ্চ ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি তুলে ধরেছেন। মির্যা গালিব মনে করেন শুধু মুখে মুখে প্রভূকে মানার কথা বললেই প্রভূভক্ত হওয়া যায়না। বরং সকল ক্ষেত্রে প্রভূর প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা প্রদর্শন ও প্রভূর বিধানকে মেনে নিয়ে বন্দেগী করাই আসল ঈমানদারের পরিচয়। তাই গালিব বর্ণনা করেন আমি সকল ব্রাহ্মণ, প্রতিমা ও ভূতকে দূরে ছুড়ে আমার বন্দেগীর চৌকিকে বা বিছানাকে কাবা ঘরের পার্শ্বে স্থাপন করতে আশাবাদ ব্যক্ত করেছি। এরকম আবেগ অনুভূতি জড়ানো ও আনুগত্যপ্রিয় থাকার কারণেই সবাই তার কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় কবি হিসেবে মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়তে সক্ষম হয়েছেন।

## সংক্ষিপ্তকরণ

মির্যা গালিব ছিলেন একজন মহাজ্ঞানী কাব্যপ্রতিভা। উর্দু কবিতা জগতে গালিবের মতো এমন মহান কবি আর কখনো নজরে পড়ে না। গালিব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক মোটকথা গজলের সকল বিষয়ের উপর কলম ধরেছিলেন । তিনি তার কবিতাকে সমগ্র পৃথিবীর সৃষ্টিকুল দিয়ে সাজিয়েছেন। এজন্য মির্যা গালিবের কবিতায় রয়েছে আলাদা একটি আর্ট বা শিল্প। তার কবিতায় ঐসকল মহামনীষী স্থান পেয়েছেন যারা নিজেদের সৃজনশীলতার গুণে পৃথিবীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে নিজেদের নাম লিখেছিলেন। গালিবের উর্দু কবিতার এমনি একটি আর্ট বা শিল্প হলো ইযাজ বা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করন। এ ক্ষেত্রে বাক্য অনেক ছোট হলেও এর অর্থ হয় ব্যাপক। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

Dhaka University Institutional Repository

মির্যা আসাদুল্লাহ্ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার উল্লেখযোগ্য একটি আর্ট বা শিল্প হলো সংক্ষিপ্ত করণ। তিনি সব সময় ছোট বাক্য ব্যবহার করতেন, কিন্তু তার অর্থ হতো ব্যাপক। তিনি তার একটিমাত্র কবিতার মধ্যে পুরো পৃথিবীর সৃষ্টি ও সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করতেন। তিনি এমন ভাবে কবিতা রচনা করতেন যেন পুরা আটলান্টিক মহাসাগরের পানি একটি গ্লাসেই বিদ্যমান। তার কবিতায় বাক্য এতোই সংক্ষিপ্ত হতো যে, তিনি একটিমাত্র বাক্যে তার সকল বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরতেন। গালিবের বেশির ভাগ কবিতাই এত সংক্ষিপ্ত যে তিনি দুটি পংক্তির মধ্যে সারা পৃথিবীর ইতিহাস তুলে ধরতেন। এ কারণেই সবাই গালিবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং আফসোস করে বলতেন হে গালিব, তোমার জন্মতেই স্বাদ পেল উর্দু কাব্য দুনিয়া, আনন্দ পেল এ ধরার সমগ্র মানবকুল, প্রশান্তি অনুভব করলো সকল সৃষ্টিকুল। এটিই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আর্ট বা শিল্প। এরকম সংক্ষিপ্ত বর্ণনাভঙ্গির শিল্প উর্দু কবিতায় গালিব ব্যতীত অন্য কোন কবির শিল্পকর্মে পরিলক্ষিত হয়নি । [৫৭]

মির্যা গালিব বলেন-

گنجینۂ معنی کا طلسم اس کو سمجھئے

جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آوئے[৫৮]

অর্থের ভান্ডারের ম্যাজিক তাকেই বুঝায়
যে শব্দ দৃশ্যায়িত হয় গালিবের কবিতায়

উল্লেখিত কবিতার প্রথম পংতিতে শব্দের گنجینۂ অর্থ ভান্ডার বা খনি। আর তা হলো শব্দার্থের খনি। মির্যা গালিব তার উর্দু কবিতাসমূহে এমন এমন শব্দ ভান্ডার সৃষ্টি করেছেন এবং তা এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যা ভান্ডারের মতো। তার কবিতায় যেসমস্ত শব্দ ব্যবহার হতে দেখা যায়, তার অর্থ ব্যাপক। এক্ষেত্রে তার পণ্ডিত্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করার যোগ্যতা উর্দু সাহিত্যের কবিদের মধ্যে মির্যা গালিবই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিসত্ত্বা। গালিবের মতো এতো পাণ্ডিত্বপূর্ন উর্দু কবিতা আর অন্য কোন কবির কবিতায় দৃশ্যমান হয় না। আর এ জন্যই মির্যা গালিবের কবিতা সকল পাঠক ও শ্রোতাদেও কাছে এককভাবে সমাদৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে গালিবের কিছু কবিতা পেশ করা হল-

غالب ترا احوال سنا دیں گے ہم ان کو

وہ سن کے بلا لیں یہ اجارہ نہیں کرتے۔[৫৯]

হে গালিব তোমার অবস্থা আমরা তাকে শুনিয়ে দিব

Dhaka University Institutional Repository

সে শুনে বলবে এটা ধার করে আনা হয়নি।

تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم
میرا سلام کہیو اگر نامہ بر ملے۔[৬০]
হে সহচর, তোমার সাথে আমার কোন কথা নেই
আমার সালাম পাঠিয়ে দিয়ো যদি পত্রবাহক যায়।

کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز
کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔[৬১]

(হে প্রিয় মন কিভাবে তুমি মূর্তি পুজা করতে পারো।
হে প্রিয় মন আমার মনে কি ঈমান নেই। )

مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام
ساقی مے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔[৬২]
(আমার কাছে কখন যে এসেছিল বন্ধুর বাড়ির দাওয়াত,
প্রিয়তমা মদের সাথে কিছু মিশিয়েছে সে দিন। )

প্রথম কবিতাংশে মির্যা গালিব احوال শব্দটি ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থ বুঝিয়েছেন। احوال মানে অবস্থা এখানে গালিব তার ভক্ত, শ্রোতা, পাঠক ও সর্বসাধারণের কাছে তার জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। তার জীবনের প্রতিটি স্তর যথা শৈশবকাল, তার জন্ম, পড়া লেখার হাতে খড়ির অবস্থা, ফার্সী কবি থেকে উর্দু ভাষার কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ, তারঁ বিবাহিত জীবনের বর্ণনা, অর্থাভাবের কারণে জীবনের হতাশা, মাসিক পেনশন পাওয়ার জন্য রাজদরবার পর্যন্ত তদবির করা, বন্ধুদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিয়ে সময়মত পরিশোধ করতে অক্ষমতার কারণে আদালতে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। মোটকথা মির্যা গালিব উল্লিখিত কবিতাংশের মাধ্যমে তার জীবনের সকল সুখ-দু:খ, ঘাত-প্রতিঘাত তথা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল অবস্থা তার প্রিয় পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। এভাবে এক কথায় পুরো জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করাই মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আর্ট বা শিল্প।

*Dhaka University Institutional Repository*

দ্বিতীয় কবিতাংশে মির্যা গালিব তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে অভিমান ও অভিযোগের শুরে বলেছেন হে আমার সহচর তোমার সাথে আমি এখন আর কোন কথাই বলবো না। আমার সকল অভিযোগ ও দাবি দাওয়া, তোমার বিরহে আমার জীবনের শুন্যতা, মনের সকল দু:খ জ্বালা পত্রে লিখে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। পত্রবাহক পত্র নিয়ে তোমার নিকট পৌছা মাত্রই আমার বিরহের বেদনা ও মনের গভীরের কান্না তুমি শুনতে পাবে। আর তখনই তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমাকে কত বেশি ভালোবাসি এবং তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে কতইনা আগ্রহী । তুমি আমার কাছে না আসলেও আমার শুধু এতটুকু অনুরোধ রইল যে, পত্রবাহক তোমার কাছে পৌছালে তুমি আমার সালাম গ্রহণ করিও। মির্যা গালিব এখানে সংক্ষিপ্ত কবিতাংশের মাধ্যমে দীর্ঘ এক প্রেম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যাতে এক ফিল্মের দৃশ্যপট উপস্থিত। মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ছিল যার মাধ্যমে তিনি ভক্তদেরকে সহজেই তার কাছে টানতে পারতেন।

**তৃতীয় কবিতাংশের** মাধ্যমে মির্যা গালিব সমগ্র দুনিয়ার উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি উপদেশ তুলে ধরেছেন। মির্যা গালিব বলতে যাচ্ছেন, হে ঈমানদার বান্দাগণ তোমরা কীভাবে সেই মহান প্রভূকে বাদ দিয়ে মানব নির্মিত মাটির পুতুলের পূজা করছো। অথচ তুমি মুখে স্বীকার করেছো যে তুমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো। হে মানবসকল, তুমি কি তোমার পরিচয় ভুলে গিয়েছো? তুমি যে ঈমানদার তাও কি তুমি ভুলে গিয়েছো? তুমি যে পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা এক মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছো। সেই পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে কিভাবে মানুষের তৈরী পুতুলের কাছে নিজের পবিত্র ঈমান বির্সজন দিচ্ছো। মির্যা গালিব তার এই সংক্ষিপ্ত কবিতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের সত্য, ন্যায় ও ঈমানের প্রতি জাগ্রত থাকার উপদেশ প্রদান করেছেন। এটাই মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আসল আর্ট বা শিল্প । যা অন্যান্য কবির কবিতায় অনুপস্থিত।

**চতুর্থ কবিতাংশে** মির্যা গালিব তার পিয়তমার সাথে মিলনের পুরোনো কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলতে চান আগেতো আমি আমার প্রিয়তমার দাওয়াতে তার বাড়ী যাইতাম তার সাথে কত আনন্দে মেতে উঠতাম, কত রাত এভাবেই কাটিয়ে দিতাম আমার প্রিয়তমা তার আদরের পরশ দিয়ে আমাকে আগলে রাখতো। আমার প্রিয়া আমাকে পাবার আশায় খাবার শেষে আমাকে একান্তভাবে শরবত পরিবেশন করতো। তাতে কিইবা মিশিয়ে দিতো যে, আমি সে শরবত পান করার পর প্রিয়ার প্রেমে নিমগ্ন হয়ে যেতাম। কিন্তু সেই প্রিয়া আজ আমাকে ভুলে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। আমার প্রিয়া আগের মতো এখন আর আমাকে খাবার খেতে দাওয়াত দেয় না। এখানে গালিব এক লাইনের উর্দু কবিতার মাধ্যমে তার জীবনে ঘটে যাওয়া সম্পূর্ণ কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এভাবেই তিনি আলোচ্য কবিতাগুলো বর্ণনা করার মাধ্যমে তার উর্দু কবিতার আর্টকে মানুষের হৃদয়ের সাথে গভীরভাবে জুড়ে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## উপমাঃ

উর্দু সাহিত্যের মহানকবি মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার অন্যতম শিল্প হলো তামসিল বা উপমা। বক্তা যখন তার হৃদয় নিংড়ানো ও আবেগপূর্ণ বক্তব্য উপমা সহযোগে পেশ করেন শ্রোতাগণ তখন তা গভীর আগ্রহে শ্রবণ করে থাকেন। বক্তা যত বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান হন তার উপমা তত উন্নতমানের ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। বক্তব্য যতই নিগুঢ় ও দুরুহ হোক না কেন তার সাথে যখন উপমার সংযোগ ঘটে তখন তার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রোতাগণ খুব সহজে বুঝতে সক্ষম হন। এ বিষয়টি কবিতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় কবিতার বিষয়বস্তু সকল শ্রেণির মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু সেটা যদি উপমার সাথে প্রকাশ করা হয় তবে তা সবার কাছেই বোধগম্য হয়। মহান কবি মির্যা গালিব ছিলেন এ ক্ষেত্রে খুবই পারদর্শি । এক্ষেত্রে তার পারদর্শিতার কিছু ঝলক আমরা এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাবো।

তামসিল সর্ম্পকে মির্যা গালিব তার কবিতায় বলে-

حسن و عشق پاک کا شرم و حیا در کار نیست

پیش مردم شمع در بر می کند پروانہ را۔[৬৩]

সৌন্দর্য এবং প্রেম এ পবিত্র দু'য়ের শরম করার প্রয়োজন নেই,
মানুষের কাছে বাতির আলো প্রজাপতির আলোয় ন্যায়।

মির্যা গালিব আরো বলেন-

ہو اجب حسن کم، خط ہر غدا سادہ آتا ہے

کہ بعد از صاف مے ساغر میں درد بادہ آتا ہے[৬৪]

মানুষের সৌন্দর্য কম থাকলে চেহারায় মলিন ও ভদ্রতার চিহ্ন থাকে,
মদের পাত্র পরিস্কার করার পরেও পাত্র থেকে মদের গন্ধ আসে।

প্রথম কবিতাংশে মানুষের রূপসৌন্দর্য ও সৃষ্টিজীবের প্রতি ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। এ দুইটি জিনিসই পবিত্র। সৌন্দর্য প্রকাশ করা এবং প্রেম-ভালোবাসা প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন মানুষ লজ্জাবোধ করেনা। তবে মানুষের কাছে রাতের জোনাকির মত মিটিমিটি আলো প্রদীপের আলোর মতোই মনে হয়। এখানে মানুষের জীবনকে "হুসন'(সৌন্দর্য) ও 'ইশ্ক' (ভালোবাসা)'র সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটাই গালিবের কবিতার উপমার রং।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় কবিতাংশে _মির্যা গালিব বলেন, মানুষের রূপসৌন্দর্য কম থাকলে তার মধ্যে কোন অহংকার থাকে না বরং তার মধ্যে বিনয় ও নম্রতার চিহ্ন দৃশ্যমান হয়। কারণ মানুষ হলো আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের কোন ঘাটতি আল্লাহ তায়ালা রাখেন নি। কিন্তু মানুষ তার এই পবিত্র জীবনকে বিভিন্ন কুকর্মের মাধ্যমে কলুষিত করে। অপরদিকে মদ একটি অপবিত্র জিনিস যা পান করা ইসলামে হারাম ঘোষণা করেছে। মদ এমন দুর্গন্ধ যে, তাকে যে পাত্রে রাখা হোক না কেন সে পাত্র দুর্গন্ধ হয়ে যায়। এখানে মানুষের কুকর্মকে মদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উপরি উল্লিখিত কবিতা দ্বয়ের মাধ্যমে গালিব তার কবিতায় উপমার সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়োগ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

## সর্বব্যাপী:

উর্দু সাহিত্যের মহাকবি মির্যা গালিবের উর্দু কবিতায় অনেক শিল্প আছে। কিন্তু তার উর্দু কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো আফাকিয়াত বা সর্বব্যাপী। গালিবের উর্দু কবিতার এমন সর্বব্যাপী আর্ট বা শিল্পরূপের কারণেই তিনি দুনিয়ার সকল স্তরের মানুষের কাছে চির অমর হয়ে আছেন। গালিব এরকম আর্ট সমৃদ্ধ উর্দু কবিতা লেখার কারণে সকল যুগে দুনিয়ার মানুষের কাছে উর্দু সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিচিতিলাভ করেন। মির্যা গালিব ছিলেন সমগ্র দুনিয়ার গণমানুষের কবি। তিনি কোন নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ঠ যুগ, নির্দিষ্ট এলাকা, নির্দিষ্ট কোন দেশের কবি ছিলেন না। বরং গালিব ছিলেন সকল সময়ের, সকল স্থানের, সকল যুগের, সকল মানুষের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। তিনি তার উর্দু কবিতার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল শ্রেণির, সকল যুগ ও স্থানের মানুষের জীবনের দু:খ দূদর্শা, হতাশা, কর্মপরিধি, কর্মপরিণতি এমনভাবে শিল্পির তুলিতে চিত্রায়িত করেছেন, যে মানুষ তার কবিতাকে নিজেদের জীবনের আয়না হিসেবে গ্রহণ করেছে। গালিব কাব্য চর্চার মাধ্যমে মানুষের স্বভাব ও চরিত্রকে এমন ভাবে চিত্রায়িত করতেন যা পাঠ করলে সকল শ্রোতা মনে করতো যে এখানে তার মনের কথা ও তার হৃদয়ের লুকায়িত ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণে গালিবের গজল সারা বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে।

গালিবের উর্দু কবিতা ছিলো স্থান, কাল, দেশ, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় নিংড়ানো অতিসত্য ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ উর্দু কবিতা। কিন্তু গালিব ব্যতীত উর্দু ভাষার অন্যান্য কবিগণ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর সীমাবদ্ধ থাকতেন। [৬৫]
মির্যা গালিবের দিওয়ান থেকে একটি উর্দু কবিতা নিম্নরূপঃ-

غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج

شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک [৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

জীবন জ্বালার হয় উপশম, আসাদ আসে মরণ যদি

প্রদীপ কে তো জ্বলতে-ই হয় সকাল আসার আগ অবধী

মহাকবি মির্যা গালিব আলোচ্য কবিতার মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার মানুষের কাছে এ সংবাদ পৌছে দিতে চান যে, মানুষ যতদিন এ দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে ততদিন সে কষ্ট থেকে মুক্তিপাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষের জীবন হলো প্রদীপের আলোর মতো। প্রদীপের আলো যেমন সারারাত জ্বলতে থাকে, সুবহে সাদিক হওয়ার পর আবার নিভে যায়। মানুষের জীবনও তাই, মানুষকে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে বিভিন্ন দু:খ কষ্টের আগুনে দগ্ধ হতে হবে। মৃত্যু ছাড়া মানুষের জীবনের কোন মুক্তি নাই। এ বিষয়টি মানব জীবন ধ্রুব সত্য ও বাস্তব ঘটনা।

আর এ বাস্তব ও সত্য ঘটনাটি সকল যুগের এবং সকল দেশের মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য এক্ষেত্রে কারো কোন দ্বিমত নেই। এ কবিতাটি যে সময়ে বলা হয়েছিল সে সময়ের মানুষের মনে যেরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল শতাব্দিকাল পরেও ঠিক সেরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। এ কবিতাটি দিল্লিতে বসে বলা হয়েছে এটি যেমন দিল্লির মানুষের মনে প্রভাব ফেলতে পারে তেমনি মুম্বাই, মাদ্রাজ বরং বিশ্বব্যাপী যত মানুষ এ কবিতাটি পাঠ করবে প্রত্যেকের মনে এর প্রভাব পড়বে। গালিব বলেন, শুধু তাই নয় বরং যারা উর্দু পড়তে পাড়ে না, তারাও যদি এ কবিতার অনুবাদ একবার শুনতে পায় তাহলে তারাও নির্দ্বিধায় আপন মন থেকে আহ! আহ! শব্দ উচ্চারণ করতে থাকবে। মির্যা গালিব বুঝাতে চাচ্ছেন যে এ কবিতাটি নির্দিষ্ট কোন সময় বা স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ কবিতাটি সকল যুগ ও স্থানের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।[৬৭]

জীবনটা হলো রোদের ছায়ার মতো। এরকম বাস্তবতা যখন কোন কবির জীবনে সংঘটিত হয়, তখন কবি সে কথাগুলীকে পূর্ণ সত্যতার সাথে, অনেক আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। যে এই কবিতাটি পাঠ করবে সে বুঝতে পারবে যে, এ বিষয়গুলী কবির নিজের জীবনে ঘটেছিলো। আর এটার নামই হলো আফাকিয়াত বা সর্বব্যাপী। মির্যা গালিব তার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বিচক্ষণতার সাথে তাঁর উর্দু কবিতার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর উর্দু কবিতাসমূহকে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে সীমাবদ্ধ হওয়া থেকে সর্বদাই মুক্ত রেখেছেন। এ কারণেই গালিব বিশ্বজুড়ে নিজের সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। [৬৮]

নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলোঃ-

ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیو ہو

ہائے اس زور پشیماں کا پشیماں ہونا۔[৬৯]

Dhaka University Institutional Repository

তুমি যার বন্ধু হয়ে গেলে আকাশ
আবার তার শত্রু হতে চায় কেন?
আফসোস! লজ্জাজনক! কাজটি খুবই লজ্জাজনক!

মির্যা গালিব আলোচ্য পংক্তিদ্বয় দ্বারা এটাই বুঝাতে চান যে, যখন কোন ভালো বন্ধু কোন শত্রুর কাছে দায়বদ্ধ থাকে তখন সে সময় সেই শত্রুটি ভাল মানুষটির উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। ভালো বন্ধুকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে তাকে একেবারে অন্তিম সজ্জায় পৌঁছিয়ে দেয়। ভালো বন্ধুটি যখন শত্রুর নিপীড়ন সহ্য করতে অক্ষম হয়, তখন তার মুখ দিয়ে প্রথম পংক্তিটি উচ্চারিত হয়।

আর যখন কোন মানুষ কাউকে অনেক কষ্ট দেয় বা শত্রুতা করে কাউকে বিপদে ফেলে, কিন্তু অনেক দিন পর যখন সে নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য তার মনে ভীষণ অপমানবোধ জাগ্রত হয়। নিজের খারাপ চরিত্রটি মানুষের কাছে প্রকাশ হোক এটি যখন কামনা করেনা এবং হাজার আফসোস করার পরও যখন তার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অক্ষম হয়। যাকে অত্যাচার করেছে তাকে খুঁজে না পাওয়া যায় এবং তার কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা যায় তখন সেই হতভাগা পাপীর মুখ থেকে নিজ ইচ্ছায় দ্বিতীয় পংক্তিটি উচ্চারিত হয়। আর ও পংক্তি দুটি সব সময় প্রবাদ বাক্য হিসাবে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

উপরিউল্লিখিত পংক্তি দু'টির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা পৃথিবীর সর্বব্যাপীই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ ঘটনাগুলী শুধুমাত্র একটি যুগ, একটি দেশ, একটি এলাকায় সংঘটিত হয়েছে, এছাড়া অন্য কোথাও সংগঠিত হয় নি এমন কথা কারো কাছেই শোনা যাবে না। বরং প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা হল এই যে, এ জাতীয় ঘটনা সারা পৃথিবীতে অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর এটিই হলো মহান কবি মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আফাকিয়াতের বা সর্বব্যাপী কাব্যের দলিল। মির্যা গালিব এ সকল বাস্তব ঘটনাবলী অত্যন্ত আকষর্ণীয়ভাবে তাঁর উর্দু কবিতায় বর্ণনা করেছেন।

আরো কিছু কবিতা নিম্নে বর্ণিত হলো-

رات دن گردش میں ہیں سات آسماں

ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔[৭০]

সাত স্তবক আসমান দিবা-রাত্রি চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে
তাতে কিছু না কিছু সৃষ্টি হয়, কিংবর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার কারণ নেই।

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہو گئیں
خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔[৭১]

*Dhaka University Institutional Repository*

সবাই বলে রং বেরংগের ফুল দেখতে কত সুন্দর,
মাটির যত পুষ্টিজ্ঞান ও সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে ফুল কলিতে।

প্রথম কবিতাংশে বলা হয়েছে সাত স্তবক আকাশ দিবানিশি নিজ কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় থাকে। যে আকাশ সর্বদা নিজ আদেশ পালনে ব্যস্ত থাকে। সূর্য পৃথিবীর চারপার্শ্বে পরিভ্রমণরত থাকে। এই পরিভ্রমণের ফলে দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস, বছর, কত কিছুই না ঘটে যায়। সব কিছুই সাধারণ নিয়মানুসারে নিজস্ব গতিতে চলতে থাকে, তাতে পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকুল হতাশায় কখনো কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয় না।

সাত আসমান বা সূর্যের এ প্রদক্ষিণ, দিবা রাত্রির পরিবর্তন, মানুষের জন্ম মৃত্যু এসব রহস্য শুধু একটি স্থানে বা দেশে, একটি সময়ে সংঘটিত হয়নি। এটি চিরকাল সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিরাজমান ছিল, আছে ও থাকবে। এ কথাগুলী মির্যা গালিব তার উর্দু কবিতায় নিপুণভাবে অলংকিত করেছেন। এটি হলো গালিবের কবিতার আফাকিয়াত বা সর্বব্যাপী।

দ্বিতীয় কবিতাংশ মির্যা গালিব মাটির গুণাগুণ, মাটির সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। সে গুনাগুন ও সৌর্ন্দয আল্লাহ তায়ালা রং বেরংয়ের ফুল ও ফলের মধ্যে প্রকাশিত করেছেন তার বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এ মাটি, মাটির সৌন্দর্য ও পুষ্টিজ্ঞান, ফুলের বৈচিত্র্য পৃথিবীর সবখানে সর্বকালেই ছিলো এবং এখনো আছে। এগুলী কোন বিশেষ সময় বা বিশেষ স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ বিষয়গুলী গালিব তাঁর উর্দু কবিতায় নিখুঁতভাবে শিল্পায়িত করেছেন। এ সবই গালিবের উর্দু কবিতার আফাকিয়াতের দলিল। মির্যা গালিব উর্দু কবিতা রচনা করেছেন সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মানুষের কল্যাণের জন্য। তাঁর কবিতার পরিধি ছিলো সর্বব্যাপী। আর সেই আর্ট বা শিল্পরূপ দিয়েছেন তাঁর উর্দু কবিতার প্রতিটি পংক্তিকে । [৭২]

## রূপক

মহান কবি মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতার আর্ট বা শিল্পরূপের মধ্যে আরো একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হলো রূপকতা। তিনি ছিলেন প্রকৃত আর্টিস্ট বা শিল্পোমনা কবি। তাই তিনি তার উর্দু কবিতাগুলীতে এমন এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন যার সঠিক অর্থ ও ভাব বুঝতে হলে অনেক ঘাম ঝড়াতে হয় এবং অনেক মাধ্যম খুঁজতে হয়। কারণ সে শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ভাব লুকায়িত থাকে। এটি হলো উর্দু সাহিত্যের মহাকবি মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের একক ও স্বতন্ত্র সৃষ্টি। মির্যা গালিব তার গজলে রময বা রূপক ব্যবহার যে ঝলক দেখিয়েছেন, তা উর্দু ভাষার অন্যান্য কবিদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নি। নিম্নে গালিবের উর্দু কবিতায় রমযিয়াহ বা রূপক অর্থবোধক সৃষ্টি বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হল।

রমযিয়াহ ঐ প্রকার কিনায়াকে বলে যার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে হলে অনেক মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। রমযিয়ার অর্থ গোপন থাকে বিধায় এর সঠিক অর্থ পর্যন্ত পৌছাইতে শরীরের অনেক ঘাম ঝড়াতে হয়। অতি সহজে শব্দের অর্থ ও কবিতার মূলভাব বুঝা দুশকর হয়। [৭৩]

নিম্নে রূপক অর্থবোধক একটি উর্দু কবিতা মির্যা গালিবের দিওয়ান থেকে নিম্নে বর্ণিত হলো

کوئی ویرانی سی ویرانی ہے

دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔[৭৪]

নির্জন ঘর শুধু নির্জন বাড়ী
মরু প্রান্তর ও বনজঙ্গল দেখে নিজ ঘরের কথা মনে পরে।

উপরিউক্ত কবিতায় একটি বিস্তৃর্ণ মরুভূমির কথা বলা হয়েছে। চারোদিকে শুধু বালুময় মাঠ ধু ধু করছে, কিছু দুরত্বে বড় বড় বন জঙ্গল, এ এক ভয়ংকর দৃশ্য। এই জনমানবহীন বিস্তৃর্ণ মরুভূমি দেখে কবির মনে অনেক ভয়-ভীতি জাগ্রত হয়েছে। তাই তিনি সে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সাহায্যকারী তালাশ করছিলেন এবং বলছিলেন কে আছো আমাকে এ ভয়ের হাত থেকে এবং জনমানবহীন নির্জন মরুভূমি থেকে রক্ষা করবে। ভয় পাওয়া এবং ভয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ বিষয়টি সহজ ভাবে বর্ণনা না করে বিষয়টিকে কিনায়া বা রূপক অর্থে জটিলভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটিই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার অন্যতম আর্ট বা শিল্পরূপ।
এ প্রসঙ্গে গালিবের আরো একটি উর্দু কবিতা লক্ষ্য করা যাক।

دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے

آخر اس درد کی دوا کیا ہے[৭৫]

আমার এ অবুঝ মন জানে না তোমার কি অসুখ হয়েছে?
শেষ পর্যন্ত এ অসুখের ঔষধ কী আছে তা জানি না।

মহান কবি মির্যা গালিব আলোচ্য কবিতাংশের মাধ্যমে এ সত্য ও বাস্তব ঘটনাটি প্রকাশ করতে চান যে, প্রেম এমনি এক সুধা, এটি এমনি এক রোগ যার কোন ঔষধ নেই। প্রেম হলো ঔষধ বিহীন একটি রোগ। এ রোগের ঔষধ হলো মাশুককে কাছে পাওয়া এবং প্রিয়ার কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া। কিন্তু এ সহজ কথাটি মির্যা গালিব প্রশ্নবোধক শব্দে পর্দার অন্তরালে ছুড়ে দিয়েছেন। মির্যা গালিব তার মনের মধ্যকার লুকায়িত ভাবকে

প্রশ্নবোধক শব্দের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন। এটিই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার রূপক অর্থবোধক একটি আর্ট বা শিল্পরূপ।
গালিবের উর্দু কবিতার সমালোচকদের কয়েকটি মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো। মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার সবচেয়ে বড় সমালোচক ড: শওকত সবজত্তয়ারি গালিবের রূপক অর্থবোধক কবিতা সম্পর্কে লিখেন।

" غالب کا کلام سرتا پا رمزیت کے لباس میں جلوہ گر ہوا ہے اور یہ ان کے آرٹ کا وہ پہلو ہے جس کے نظر انداز کر دینے سے ان کے ندرت فکر کے جملہ محساسن ملیامیٹ ہو جاتے ہیں۔"[৭৬]

(মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার দিওয়ান রূপক অর্থের পোষাক পরিধান করে চমৎকার ভাবে পাঠকদের সামনে প্রদর্শিত হয়েছে। আর এটি তার কবিতার শিল্পরূপের সেই বৈশিষ্ট্য যাকে জনসম্মুখে প্রদর্শন করার কারণে গালিবের অন্যান্য সকল উন্নত চিন্তা-চেতনা ও সৌন্দর্য্য ধূলামলিন হয়ে গিয়েছে। )

ড: ইউসূফ হোসাইন খাঁ লিখেনঃ-

" غالب کی غزلیں کنایوں سے بھری پڑی ہیں ۔ پھر یہ کنائے محض کنائے نہیں ہیں بلکہ لطیف شعری میں سموئے ہوتے ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہو گا کہ غالب کے کلام کا بیشتر حصہ زمز و کنایہ کی کیفیت میں رچا ہوا ہے۔"[৭৭]

( মির্যা গালিবের গজল সমূহ "কিনায়াতে ভরপুর"। আর এ কিনায়া অতি সাধারণ কোন কিনায়া নয় বরং এটি সৌন্দর্যবোধক কাব্যের ধাঁচে নির্মিত কিনায়াহ বা রূপক অর্থ। আর এ কথা বলাও যুক্তিযুক্ত যে, গালিবের অধিকাংশ কবিতাই রমযিয়াহ এবং কিনায়াহ এর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। )

ড: ইবাদত বিরলভী লিখেন

" غالب کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے ان تمام متنوع موضوعات کو غزل کے سانچہ میں ڈھالا ہے ۔ مشاہدۂ حق کی گفتگو انہوں نے "بادہ ساغر" میں اور بازو غمزہ کی گفتگو "دشنہ و خنجر" میں کی ہے۔[৭৮]

(গালিবের উর্দু কবিতায় তার মহত্ব গৌরব হলো তিনি সকল প্রকার বিষয়কে গজলের ফরমুলায় বর্ণনা করেছেন। ন্যায় বিচারক ও পর্যবেক্ষকদের জ্ঞানগর্ব কথাবার্তাকে মদের পানপাত্রের সাথে এবং প্রেম ও ছলচাতুরিপূর্ণ কথাবার্তাকে ছোড়া ও খঞ্জরের সাথে তুলনা করেছেন।)

মির্যা গালিব বলেন, রমযিয়াত ও ইমায়িয়্যাত (রূপক ও ঈঙ্গিত) হলো উর্দু গজলের আসল ভিত্তি। রমযিয়াত ও ইমাযিয়্যাত ছাড়া কোন প্রকারের গজলই সামনে অগ্রসর হতে পারে না। উর্দু গজলের মধ্যে যদি রমযিয়াত এবং ইমায়িয়্যাত না থাকে তাহলে গজলের

*Dhaka University Institutional Repository*

মধ্যে অর্থগত দিক থেকে কোন প্রকার উন্নতির আশা করা যায় না । বাহ্যিক দৃষ্টিতেও কোন আকর্ষণ প্রকাশ পায়না।

এ সম্পর্কে গালিবের দুটি উর্দু কবিতা নিম্ন রূপঃ

ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر[৭৯]

সত্য ও বিচক্ষণমূলক, জ্ঞানগর্ব পর্যালোচনা যতই হোক না কেন
এগুলী মদ্য পান ও পানপাত্রের সুধাছাড়া অপূর্ণ থাকে।

مقصد ہے باز و غمزہ و لے گفتگو میں کام
چلتا نہیں ہے دشنہ و خنجر کہے بغیر[৮০]

যদি উদ্দেশ্য থাকে আনন্দ ফুর্তিতে সকল কর্ম সম্পাদন করা
পরিপূর্ণ হয় না সে আনন্দ ফুর্তিও খঞ্জর ছাড়া।

আলোচ্য কবিতাদ্বয়ের মাধ্যমে মির্যা গালিব বলতে চান, বড় বড় জ্ঞানী ও বিচক্ষণ মনিষীগণ যারা অনেক কাব্য ও সাহিত্য চর্চার আসর করেছেন তারা সবাই শরাবের অমিয় সুধা আচ্ছাদন করেছেন। শরাবপান বিহীন কেউ বড় কবি হতে পারেননি। তারা জীবনের কোন না কোন সময় একবার হলেও মদ্যপানে মশগুল ছিলেন। এমনি গালিবের বেলায়ও ঘটেছিল। আর প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা, নাচ-গান, আনন্দ ফুর্তি উপভোগ করতে হলে এবং এর পরিপূর্ণ মজা পেতে হলে অবশ্যই ঢাল, তলোয়ার, ছোড়া, খঞ্জরের প্রয়োজন হয়। কারণ বাদ্যযন্ত্র ও মদ ছাড়া নাচ গানের আসর জমে না। গজলে এসব মর্মবাণী শ্রোতা ও পাঠকদের ভালোভাবে বুঝাতে গালিব رمزیت ও اما ئیت এর আশ্রয় নিয়েছেন।
মির্যা গালিব বলেন -

دوست غم خواری میں میری سعی فرمائینگے کیا؟

زخم کے بڑھنے فلک ناخن بڑھ آینگے کیا؟[৮১]

বন্ধু আমার কষ্টের সময় নিষ্ফল শ্রম দিল
ক্ষত চিহ্ন ভালো হওয়ার পর নখ কী আর বড় হবে?

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য উর্দু কবিতাংশে মির্যা গালিব বলেছেন, এক লোকের নখে আচর লেগেছে। লোকটি আচরের কারণে ক্ষতস্থানের ব্যাথায় অসহনীর চিৎকার করছিল। তার বন্ধু এসে দেখতে পেল তার প্রিয় বন্ধুর অনেক কষ্ট হচ্ছে। তাই সে মনে মনে ভাবলো হয়তোবা সে ক্ষতস্থান পরিস্কার করে ঔষধ লাগাতে পারছেনা। তাই সে বন্ধু নখটি কেটে ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিল। বন্ধু ভাবছিলেন, আমার বন্ধুর আসার কারণে হয়তো আমার কষ্ট একটু হলেও লাঘব হবে। কিন্তু বন্ধুর এরকম আচরণের ফলে আমার কষ্টতো কমলোইনা বরং আরো বৃদ্ধি পেল। এ কারণে প্রথম বন্ধু বলেন, আমার হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলার কারণে আমার সারা জীবন দু:খ আরো বেড়ে যাবে। আমার ক্ষতচিহ্ন হয়তো একদিন ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু আমার আঙ্গুল তো আর আগের মতো বৃদ্ধি পাবে না। বন্ধুর ধারণা ছিল আমি ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে পারছিলাম না। কিন্তু এখনতো আমার আঙ্গুলটি নেই তাহলে আমি কীভাবে সারাজীবন ক্ষতচিহ্নসহ অন্যান্য পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিবো। অতএব, বন্ধু আমার কোন উপকার না করে আমাকে জীবনের তরে দু:খের সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। মির্যা গালিব এই সহজ কথাটি রমযিয়াহ বা রূপক অর্থের পর্দায় ছুড়ে দিয়ে তার উদ্দেশ্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। এটিই মহাকবি গালিবের এক বিশেষ আর্ট বা শিল্প।

এক কবিতায় গালিব বলেন-

آئینہ دیکھ اپنا سامنے لے کے رہ گئے

صاحب کو دل نہ دینے میں کتنا غرور تھا۔[৮২]

আয়নার সামনে মুখ রেখে তোমার সৌন্দর্য দেখ,
প্রেমিককে মন না দিয়ে কতইনা প্রতারণা করছো।

মির্যা গালিব উপরোক্ত কবিতায় তার প্রেমিকাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আমার প্রেমিকা, তুমি আমার সাথে অনেক মান অভিমান করেছো। তুমি আমাকে অনেক ধোকা দিয়েছো। তুমি নিজেকে শুধু শুধু লজ্জার চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছো। তোমার সুন্দর দেহের সৌন্দর্য্যকে উপহার দাওনি। তুমি আমার প্রতি কখনো আশেক হওনি। তুমি যখন নিজেকে অসুন্দর বলে তোমার কাছে আমাকে টেনে নাওনি। কিন্তু এখন তুমি নিজের রূপ ও সৌন্দর্য আয়নায় দেখতে পেয়েছো। এখন নিজেই নিজের সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছো। তোমার মান অভিমান কত সহজেই এখন ভেঙ্গে চুরমাড় হয়ে গিয়েছে। প্রেমিকের অভিমানের এ কথাটি মির্যা গালিব তার উর্দু কবিতায় সহজভাবে না বলে রমযিয়াহ বা রূপক ও কিনায়াহ অর্থের অন্তরালে বর্ণনা করেছেন।

গালিব বলেন -

ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا

بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔[৮৩]

(আমি শুধু এখন অপরূপ প্রিয়ার কথা স্মরণ করি

পরিশেষে অন্তরের লালনকৃত প্রিয়াই আমার শত্রু হল।)

মির্যা গালিব আলোচ্য কবিতাংশে এক অপরূপ প্রিয়ার সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। আর তার সৌন্দর্যের ব্যাপারে অনেক রঙ্গিন বর্ণনা তুলে ধরেছেন। গালিব বলেন সে রমণী এতোই সুন্দর দেহ -মনের অধিকারী ছিলো যে, আমি তাকে মনের গভীর থেকে অনেক ভালোবাসতাম কিন্তু সে এখন আমার চরম শত্রু হয়ে গিয়েছে। কারণ সে অন্যকে দেহ মন ও রূপ সৌন্দর্য বিলিয়ে দিয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। তাই এখন আমি এই চরম শত্রুর নাম ও তার কথা অন্য কারো মুখেই শুনতে চাইনা। সুন্দরী রমণীর মন পান না গালিব। সে জন্য এ কথাটিকে সহজ শব্দে প্রকাশ না করে রমযিয়াহ বা রূপক অর্থে এখানে বর্ণনা করেছেন। এটিই হলো মির্যা গালিবের উর্দু কবিতার আর্ট বা শিল্প। [৮৪]
গালিব বলেন,

ہے خبر گرم ان کے آنے کی

آج ہی گھر میں بوریانہ ہوا[৮৫]

গরম খবর আছে সম্মানীত মেহমানের আগমন হবে,
আজ থেকে বিছানাপত্র মাদুর বিহীন হবে।

আলোচ্য কবিতাংশে মির্যা গালিব বলেন, বিয়ের সময় যখন নতুন বর ও মেহমানদের আগমন ঘটে তার অনেক আগ থেকে পুরোগ্রাম আনন্দ ও খুশির হিল্লোলে মুখরিত হয়। বিশেষ করে বিয়ের দিনের কথা উল্লেখ করেই বলা হয়েছে যে আজকে শুভ সংবাদ আছে। নতুন বর আসবে তাই পুরানো সব তালপাতার মাদুর ও বিছানা ফেলে দিয়ে নতুন খাট পালংঙ্কে বিছানা সজ্জিত করা হবে।
আনন্দের এই সংবাদকে মির্যা গালিব রময়িয়াহ বা রূপক অর্থে বর্ণনা করেছেন। এটি গালিবের উর্দু কবিতার একটি অন্যতম আর্ট ।
গালিব বলেন-

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے

کوئی بتلائو کہ ہم بتلائیں کیا[৮৬]

জিজ্ঞাসা করা হলো গালিব কে
কেউ তোমরা বলে এখন কী বলব।

গালিবের কাছে এসে এক লোক জিজ্ঞাসা করছে, সারাজীবন তো মির্যা গালিবের অনেক সুনাম ও সুখ্যাতি শুনে এসেছি আপনি কি বলতে পারেন গালিব কোন সেই ব্যক্তি? এ প্রশ্ন শুনে গালিব ভক্তদের উদ্দেশ্য বলছেন, আমি আর কি বলবো তোমরাই না হয় লোকটির

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নের উত্তর বলে দাও। গালিব বলতে চান লোকটি কত বেওয়াকুফ যে, সে আমার কাছেই জানতে চায়। গালিব সরাসরি নিজের পরিচয়টা না দিয়ে অন্যের মাধ্যমে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এটিই গালিবের কবিতার ইমাযিয়্যাত।
অন্যত্র গালিব বলেন-

موت کا ایک دن معین ہے
نیند کیوں رات بھر نہیں آتی [৮৭]
মৃত্যুর সুনিদির্ষ্ট তারিখ লেখা আছে,
রাতভর নিদ্রা না আসার কী কারণ আছে?

মির্যা গালিব আলোচ্য কবিতাংশ দ্বারা এ কথাই বুঝাতে চান যে, প্রতিটি মানুষের জন্য মৃত্যুর তারিখ মহান আল্লাহ তায়ালা রুহের জগতেই ঠিক করে রেখেছেন। মৃত্যু একদিন হবেই। কিন্তু বাস্তব ও নির্ধারিত একটি সত্য বিষয়কে নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা করে রাতভর ঘুম কামাই করার কোন মানেই হয় না। এটি নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আসল কথা হলো এই যে, অনর্থক দুশ্চিন্তা না করে মানুষ হিসাবে ও সৃষ্টির সেরাজীব হিসাবে প্রভূর বিধানাবলী সঠিক ভাবে পালনের মাধ্যমেই রয়েছে প্রকৃত স্বার্থকতা। মহাকবি গালিব মানুষের এ দায়িত্বকে সহজভাবে না বলে রূপক অর্থের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন।

**উপসংহার**

পরিশেষে বলা যায় যে, মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের উর্দু কবিতা নানা রকম শিল্পের সমাহারে পরিপূর্ণ। তার কবিতার ভাব, ভাষা, শব্দ চয়ন, উদ্দেশ্য সব কিছুতেই রয়েছে শৈল্পিক রূপের চমৎকার রূপায়ন। এর ফলে গালিবের কবিতা হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সকল কবির কবিতার চেয়ে ভিন্নতর ও স্বতন্ত্র। এজন্য তিনি উর্দু কবিদের মাঝে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

## তথ্যসূত্র

১। নুরুল হাসান নকবী, *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ:৪৯

২। প্রাগুক্ত, পৃ:৫০

৩। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ২৮

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১

৫। ইউসুফ সেলিম চিশতী, *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১০২

৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৭। মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী, *ইয়াদগারে গালিব*, পৃ:১২১

৮। কালিদাস গুপ্তা রেজা, *দেওয়ানে গালিব কামেল*, পৃষ্টা-২১৭ ও ২৯৩

Dhaka University Institutional Repository

৯। ইউসুফ সেলিম চিশতী, *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১০৪

১০। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

১১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

১২। কালিদাস গুপ্তা রেজা, *দেওয়ানে গালিব কামেল*, পৃষ্টা-২২৩

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১৪। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৯২

১৫। *দেওয়ানে গালিব কামেল*, পৃষ্টা-৩৩১

১৬। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৯৪

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

২১। *দেওয়ানে গালিব কামেল*, পৃষ্টা-১৯২

২২। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৯৬

২৩। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ২৮

২৪। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৯৮

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৩০। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১৮

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ০৪

৩৪। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৮১

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩৯। প্রফেসর নজির আহমেদ, *গালিব নামাহ*' গালিব ইন্সটিউটিউট, আইওয়ানে গালিব মারগ নয়া দিল্লী, জানুয়ারী সন ১৯৯০ পৃঃ ৪৬

৪০। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃ: ৮১

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

*Dhaka University Institutional Repository*

৪৩। ড. আব্দুল রশিদ খাঁ, *যখিরায়ে উর্দু* , আল হায়েত প্রিন্ট-২০০২ পৃ: ৩৫৭

৪৪। দেওয়ানে গালিব, পৃ. **৪৭**

৪৫ । *যখিরায়ে উর্দু* , পৃ: ৩৫৮

**৪৬**। দেওয়ানে গালিব, পৃ. ৫৮

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৪৮। *দেওয়ানে গালিব কামেল*, পৃষ্টা-২২৩

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৫০। *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১২২

৫১। দেওয়ানে গালিব, পৃ. ৯০

৫২। *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১২৩

৫৩। দেওয়ানে গালিব, পৃ. ৩৮

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৩

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ, ২১

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ, ৫২

৫৭। *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১১৩

৫৮। দেওয়ানে গালিব, পৃ. ৭৩

৫৯। প্রাগুক্ত , পৃ. ৫৯

৬০ । প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৭

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৯

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৯

৬৩। খুরশিদুল ইসলাম, *গালিব এবতেদায়ী দাওর*, আঞ্জুমানে তারাক্কিয়ে উর্দু, দিল্লি ১৯৭১, পৃ. ১৩১

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৬৫। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃঃ ৮৮

৬৬। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ৩২

৬৭। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃঃ ৮৮

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

৬৯। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ৫৫

৭০। *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৫

৭১। *প্রাগুক্ত* , পৃ. ৫৫

৭২। *গালিব শায়ের ও মাকতুব নেগার*, পৃঃ ৯০

৭৩। *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১১১

৭৪। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১৭

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৭৬। ফালসাফায়ে কালামে গালিব, পৃ. ২৩৬

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৬

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৬

*Dhaka University Institutional Repository*

৭৯। *গালিবের উর্দু গজল*, পৃ. ৬৯

৮০। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১৭

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

৮২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৮৪। আগা মুহাম্মদ বাকের , *শরহে বওয়ানে গালিব*, চৌধুরী প্রিন্টার্স দিল্লী, তারিখ বিহীন পৃ. ১১৬

৮৫। *দেওয়ানে গালিব*, পৃ. ১৪

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৮৭। *শরহে দিওয়ানে গালিব*, পৃ. ১১৩

.

*Dhaka University Institutional Repository*

# চতুর্থ অধ্যায়

## মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের সমকালীন উর্দু কবি-সাহিত্যিক

মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের সমকালীন অনেক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। যারা গালিবের মতোই সমাজ সচেতন ছিলেন। তারা মানব সভ্যতার ও কল্যাণে নিরবে কাজ করেছেন। তারা মানব সভ্যতার উত্থানপতন সচক্ষে অবলোকন করেছেন মির্যা গালিবের আচার-আচরণের সাথে তাদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। গালিবের সমাজ সংস্করণ মন-মানসিকতার কর্ম উদ্দিপনার সাথে তাদের সবারই ঐক্যমত পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক এমন মন-মানসিকতার অধিকারী যে সকল কবিগণ ছিলেন তারা হলেন- শেখ ইমাম বখ্শ নাসিখ, খাজা হায়দার আলী আতিশ, মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী, মুমিন খান মুমিন, মীর আনিস, বাহাদুর শাহ জাফর, মির্যা সালামত আলী দবীর, ইনশায়াল্লাহ খাঁ ইনশাহ, মাসহাফী, মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁন জওক, দয়া সংকর নাসিম, আমীর মীনাই ও দাগ দেহলভী প্রমুখ। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এদের সম্পর্কে আলোচনা হল।

## ইমাম বখ্শ নাসিখ ও খাজা হায়দার আলী আতিশ

দিল্লির মুঘল সম্রাজ্যের হুকুমতের সূর্য যখন একদম অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল এবং দিল্লির নামি দামি রাজা বাদশাদের অধঃপতন হলো তখন দিল্লিতে আধুনিক ও যুগোপযোগী কোন কালচার ও সাহাহিত্যলোচনার কোন সুযোগ ছিলোনা বলে ভাল ভাল কবি সাহিত্যিকগণ দিল্লি ছেড়ে ভারতের রাজ্য লাক্ষ্ণৌতে গিয়ে আশ্রয় তালাশ করে। দিল্লির এই দুর্বলতা লাক্ষ্ণৌর নবাবগণ সাদরে গ্রহণ করে কাব্যিক রস আচ্ছাদনের প্রতি খুবই আগ্রহ প্রদর্শন করেন। লুফে নেন নবাবগণ কৃষ্টি কালচার ও কাব্যের অমিয় সুধা আর পরিতৃপ্তি করেন তৃষ্ণানার্ত প্রাণকে। শুরুতে লাখনোর কৃষ্টি-কালচার দেহলবীর ভাবধারায় গড়িয়ে উঠলেও পরবর্তীতে যখন লাখনোর নব্যসমাজ সাহিত্যের রস আহরণে ব্যস্ত হয়ে নিজস্ব গতিতে জেগে উঠলে তখন তাদের মধ্যে লাখনোর স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও লাখনীয় ভাবধারা প্রকাশ পায়। যাদের মাধ্যমে লাখনোতে উর্দু সাহিত্যের নিজস্ব ভাব-ভঙ্গীমা ও নিজস্ব সভ্যতা প্রদর্শিত হয় এবং যাদের হাত ধরে লাখনুয়ী উর্দু সাহিত্যে ও উর্দু কাব্যধারা নতুনত্বের ডঙ্কা বেজে উঠে। তখনকার লাখনোর খ্যাতনামা উর্দু কবি হলেন শেখ ইমাম বখ্শ নাসিখ ও খাজা হায়দার আলী আতিশ।[১]

Dhaka University Institutional Repository

# শেখ ইমাম বখ্‌শ নাসিখ

শেখ ইমাম বখ্‌শ নাসিখ উর্দু সাহিত্য ও কাব্য জগতের একজন খ্যাতিমান প্রাণপুরুষ। তিনি লাখনোয়ী উর্দু কাব্যধারার সর্বপ্রথম ও প্রধান কবিদের অন্যতম। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি উর্দু কাব্য ও সাহিত্যকে দেহলবী ভাবধারা থেকে বের করে লাখনুয়ী ভাবধারায় সুসজ্জিত করেন। তার আগে নিজস্ব ভাব বঙ্গিমায় উর্দু কাব্য চর্চা করার সৌভাগ্য আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইমাম বখ্‌শ নাসিখ লাহোরের অধিবাসী ও সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যবসায়ী খোদা বখ্‌শ এর পালকপুত্র ছিলেন। বাল্য কালেই তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তাঁর বাল্যকাল লাক্ষ্ণৌতেই অতিবাহিত হয়। লেখাপড়ার হাতেখড়ি লাক্ষ্ণৌতেই হয়। নাসিখ আসাধারণ মেধার অধিকারি ছিলেন। তিনি উর্দু ছাড়াও অন্যন্য ভাষা যেমন আরবী ও ফার্সীতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমদিকে তিনি একাকীই উর্দু কাব্যচর্চা শুরু করেন। নাসিখের উল্লেখ করার মতো তেমন কোন গুরু বা উস্তাদ ছিলোনা। তবে তার জীবন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে জানা তিনি প্রথমে মীর তাকি মীরের কাছে উর্দু কাব্য রস আচ্ছাদন করতে চাইলেন, কিন্তু মীর তাকী মীর নাসিখকে সাগরেদ হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। পরে নাসিখ তানহা মুসহফি নামক একজন কবির শিষ্য হয়ে উর্দু কাব্য সম্পর্কে ধারণা নেন।

ইমাম বখ্‌শ নাসিখ চির কুমার ছিলেন এবং নারী সংস্পর্শ ত্যাগ করেছিরেন। তিনি সুস্থ্য, সুঠাম দেহের অধিকারী একজন সুপুরুষ ছিলেন। তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন এবং প্রতিটি কাজ নিয়মনীতি মেনে করতেন। তিনি বেশ ভোজনপটুও ছিলেন। তবে তিনি দিনে মাত্র একবার খাইতেন। তাঁর অনেক অভাব অনটন ছিল কিন্তু তারপরও কখনো কারো কাছে নতজানু হয়ে কোন কিছুর প্রার্থী হতেন না। সকল কবিসাহিত্যকগণ রাজা বাদশাহদের তোষামোদ করে কাসিদা লিখে অনেক উপহার ও উপঢৌকন লাভ করলেও নাসিখ কখনো কোন বাদশাহর তোষামোদ করে কাসিদা রচনা করতেন না। তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনের অধিকারী ও স্বাধীনচেতা মানুষ ও কবি। তিনি সদাসর্বদা কাব্য চর্চায় মগ্ন থাকতেন। শিষ্য ও ভক্তরা তাঁর বাড়ীতে কাব্য আসর দ্বারা সারাক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রাখতেন। নাসিখ রাত্রিকালীন সময়েও কাব্য সাধনায় মশগুল থাকতেন, এবং তাতেই কবির মনে সুখ জাগতো।[২]

নাসিখ খুবই রসিক ও আমোদ-প্রমোদ সম্পন্ন কবি ছিলেন। তাঁর রসিক ও খোলামনের কারণেই তার ভক্ত ও শিষ্যগণ তাকে অনেক উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন। এর সুবাদেই নাসিখ খুব স্বাচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেন। তিনি কখনো কাহারো অধীনে কোন চাকুরী ও তোষামোদ এর কাজ করেননি। নাসিখের কাব্যপ্রতিভা ও

Dhaka University Institutional Repository

সুনাম সুখ্যাতি অতি তাড়াতাড়ি সর্বমহলে ছড়িয়ে পরে এবং তার এমন সুখ্যাতি তৎকালীন নবাব গাজীউদ্দীন হায়দারেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। নবাব তাকে রাজ দরবারের সভা কবির পদ অলঙ্কিত করার প্রস্তাব দেন। কিন্তু নাসিখ তা প্রত্যাখ্যান করেন। মালিকুশ শুয়ারা বা রাজসভার কবির পদ গ্রহণ না করার কারণে নবাব তার প্রতি রাগান্বিত হন। নবাবের আক্রোশ থেকে বাঁচার জন্যে নাসিখ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে ১৮৩১ সনে এলাহাবাদে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন। কিন্তু হায়দারাবাদের আসফিয়া সাম্রাজ্যের নবাব দেওয়ান সাহিত্যিক ও কবি প্রেমিক রাজা চন্দুলাল ১২ হাজার টাকা নজরানা বা অগ্রীম পাঠাইয়া তাকে তার দরবারের সভা কবি পদে যোগদান করার সাদর নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু নাসিখ এ আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। নবাব গাজীউদ্দিনের মুত্যুর পর দেশপ্রেমিক কবি নাসিখ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতপর হাকীম মাহদীর কু দৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য কবি নাসিখ লাক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে বেনারস কানপুর, পাটনা ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ান। নাসিখ নবাব গাজিউদ্দীন হায়দারের দেওয়া খেতাবকে নবাব দেওয়ান এবং কবি প্রেমিক রাজা চান্দু লালের পক্ষ থেকে দেওয়া নজরানা ও সভাকবির পদে যোগদান করাকে যে ভাবে প্রত্যাখ্যান ও অবজ্ঞা করেছেন, তাতে বুঝা যায় তিনি প্রকৃত পক্ষেই একজন বিদ্রোহী কবি। তাঁর সাহিত্যে ও কর্মেও বিদ্রোহের এই প্রতিছবি অংকিত হয়েছে। আধুনিক এ সামাজে আজ যদি নাসিখ বেঁচে থাকতেন তাহলে আমরা তাকে কবি নজরুল ইসলামের মতো বিদ্রোহীর কবির ভূমিকায় দেখতে পেতাম। তবে নাসিখ উর্দু ভাষার প্রচলিত দোষ-ত্রুটির সংস্কারে ও সংশোধনে যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাকেও জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে এক প্রকার বিদ্রোহই বলা যেতে পারে। প্রথমত তিনি লাক্ষ্ণোতে প্রচলিত 'রেখতী' রীতির তুচ্ছতাকে পরিহার করে সাহিত্যে সুস্থ চিন্তাভাবনার বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন, অন্যদিকে উর্দু কবিতায় ছন্দ ও শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলছিল, তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। কবিতায় শব্দ ব্যবহারের ব্যাপারেও তিনি কঠোর নিয়ম জারি করেছিলেন। নাসিখের রীতিতে প্রসংগের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন শব্দ কবিতায় ব্যবহার করা নিষেধ ছিল। [৩]

ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাসিখের সংস্কারগুলো নিস্বরূপঃ-

১। যে উর্দু ভাষাকে আগে 'রেখতা' বলা হতো, নাসিখ তাকে উর্দু বলে অভিহিত করলেন। সারা হিন্দুস্থানেই রেখতার নাম পরিবর্তিত হয়ে উর্দু ভাষায় পরিণত হলো।

২। যে গজলকে আগে 'রেখতী' বলা হতো, নাসিখ তাকে গজল বলেই অভিহিত করেন। সকলেই তাঁর দেওয়া নামটিই সাদরে গ্রহণ করেন।

৩। রাদীফ ও কাফিয়ার ভিত্তি বিশুদ্ধ ক্রিয়াপদের উপর স্থাপিত হলো। ইতোপূর্বে কোন কবি এ ব্যাপরে আন্তরিকতা দেখান নাই। তাঁর এই সংস্কার সকল কবিগণ কর্তৃক গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪। নাসিখের আগে আরবী ফারসী ও হিন্দী শব্দের পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ নির্ধারণে যে নৈরাজ্য চলছিল, নাসিখ তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন। লোকেরাও এ সম্পর্কে অধিক সচেতন ও যত্নবান হয়ে উঠেন।

৫। গজল ইতোপূর্বে শুধু প্রেম-কাহিনীর বাহন ছিল। কিন্তু নাসিখ এখন থেকে গজলকে সকল প্রসংগেরই বাহন করে ফেলেন। এ সংস্কারটি সাথে সাথে সমাদৃত হল। এইসব সংস্কার ছাড়াও নাসিখ কাব্যে ব্যবহৃত অনেক শব্দ অপ্রচলিত বলে পরিত্যাগ করেন। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। শব্দের এই সংস্কারও সকল কবিদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। [৪]

ইমাম বখ্শ নাসিখ তাঁর জীবনে মোট তিনটি দিওয়ান লিখে উর্দুভাষা সাহিত্যকে বহুগুনে সমৃদ্ধ করেছিলেন। প্রথমটি ১৮১৬ সালে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির নাম 'দফতরে পেরেশান' এ গ্রন্থটিতে গজল ছাড়াও রুবাঈ, ও কাতায়ে তারীখ (তারিখ বা সন প্রকাশক শ্লোক) প্রভৃতি লিপিবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় দিওয়ান ১৮৩১ সালে ও তৃতীয় দিওয়ান ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। নাসিখ সুনাম ও সুখ্যাতি মূলত: তাঁর গজলের ভিতর নিহিত ছিল। [৫]

ইমাম বখ্শ নাসিখ তাঁর কাব্যধারায় অসংখ্য আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং যথাসম্ভব হিন্দি শব্দাবলী পরিত্যাগ করার চেষ্টা কচ্ছেন। এমন পরিকল্পনা মাফিক উর্দু কাব্য চর্চার কারণেই তাঁর উর্দু কবিতাসমূহ অধিক রসালো ও শ্রুতিমধুর হয়েছে। নাসিখ তাঁর উর্দু কবিতাকে ফার্সীর নিয়মনীতি ও ধারানুযায়ী রূপক ও সাদৃশ্যের সাথে তাল মিলিয়ে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা যেন বন্য ফুলের সঙ্গে বিলাতী ফুলের রূপ ও সাজে সজ্জিত হয়ে ধরা পড়েছে। নাসিখের কবিতার এমন এক উপমা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

غیر کوثر کو کسی دریا کا میں سباح نہیں

بیشۂ شیر خدا بن کہیں سیاح نہیں

ظلم طول شب فرقت کے تطاول نے کیا

دادرس کوئی بجز خالق الاصباح نہیں [৬]

(কাওসার নদী ছাড়া আমি

আর কোথাও সন্তরণ করবনা,

খোদার বীর ছাড়া আর

কোথাও আমি ভ্রমণ করবনা

বিরহের দীর্ঘ রাত্রির যাতনা

আমাকে দগ্ধ করেছে,

প্রকৃত প্রভূ ছাড়া আর কারো কাছে

এ কষ্ট হতে পরিত্রাণ চাইনা।)

ইমাম বখ্শ নাসিখ তাঁর কয়েকজন প্রিয় ও দক্ষ শিষ্যদের নিয়ে একটি কাব্য বোর্ড বা কবিগোষ্ঠি তৈরি করেছিলেন। এ বোর্ড এর যারা সদস্য ছিলেন তারা হলেন– উয়াজির, বরক, রশ্ক, বহর, মুনীর, মিহর, নাদির, আবাদ এবং ত্বাহির।

ইমাম বখ্শ নাসিখ আপন ভূমিতে ফিরে এসে ১২৫৪ হিজরীতে মুত্যুবরণ করেন।

তিনটি কারণে নাসিখের উর্দু কাব্যে খ্যাতি অর্জিত হয়েছে।

১। নানা ছন্দে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে গজল, কবিতা লেখা

২। উর্দুতে নতুন একটি কাব্য-ধারা বা পদ্ধতির সৃষ্টি করা।

৩। একটি কবি প্রেক্ষাপট গড়ে তোলা।

মির্যা গালিব যেমন জিদ্দাত পছন্দী বা সকল ক্ষেত্রে নতুনত্বকে বেশি প্রাধান্য দিতেন, নতুনত্বকে ভালোবাসতেন। ঠিক তেমনি নাসিখও নতুনত্বকে ভালোবাসতেন। নতুনত্ব হলো নাসিখের কাব্যের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাসিদা ও গজল উভয়ের মধ্যেই নতুন নতুন সুর ও নতুন নতুন শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ তুলে ধরা হলো নাসিখের দিওয়ান থেকে–

راستی کا نام بھی اس شہر میں سنتے نہیں

کیوں نہ ہو سب لکھنو کے کوچہ و بازار کج[৭]

*Dhaka University Institutional Repository*

(সরলতার নামটিও এ-শহরে (লাক্ষ্মৌতে) শোনা যায় না,

লাক্ষ্মৌর সব গলি ও বাজার আঁকা হবে না কেন?)

নাসিখের কবিতা বিশেষ করে তার উর্দু গজল ছিলো নতুনত্বের প্রতীক। তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তিতেই নতুনত্বের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়, যার প্রমাণ মিলে তাঁর নিম্নোক্ত কবিতায়–

سب زمینیں ہیں نئی بتیس ہیں اے یار نئی

روزیاں ریختہ کی اٹھتی ہے دیوار نئی

نہیں ممکن نئی ساری غزل ہوں سخ

باتیں دو چار پرانی ہیں تو دو چار نئی [৮]

সব ছন্দই নতুন, বন্ধু, শ্লোকগুলোও নতুন,

প্রত্যহ এখানে রেখতার নতুন নতুন প্রাচীর গাঁথা হচ্ছে।

তবে এটি তো সম্ভব নয় যে, সকল গজলই নতুন হবে,

দু'একটি বাক্য পুরানো হবে, দু'একটি হবে নতুন।

ইমাম বখ্শ নাসিখ প্রেমের বেলায়ও মির্যা গালিবের ন্যায় একজন রসিকলাল ও প্রেমিককবি ছিলেন। তাঁর উর্দু গজলে প্রচুর প্রেম-কাহিনী রয়েছে। তিনি প্রেম করেছেন এবং প্রেমে তাঁর বিচ্ছেদ-বিরহও ঘটেছে। প্রেমের ক্ষেত্রে তিনি বিরহী ছিলেন, সে বিরহের ডঙ্কা বেজে উঠেছে তার কবিতায়–

شب فرقت میں شمع کا کیا ذکر

زندگانی کا چراغ بھی گل ہے۔

خود ہے فصل بہار ہوش روا

بندہ مست ساغر گل ہے۔ [৯]

*Dhaka University Institutional Repository*

(বিচ্ছেদের রাত্রিতে প্রদীপের কথা কি বলবো!

জীবন-প্রদীপই সেখানে নির্বাপিত।

বসন্ত-ঋতু আপনিই সংজ্ঞা-আকর্ষণকারী,

দাস গোলাপের পাত্র হাতে নিয়ে সংজ্ঞাহারা হয়েছে।)

ইমাম বখ্স নাসিম প্রিয়ার প্রতি এতোই দুর্বল ছিলেন যে, প্রিয়ার রূপ-সৌন্দর্য, শারীরিক গঠন-অবয়ব সব কিছুই অভিজ্ঞ শিল্পির ন্যায় অংকন করেছেন মনের তুলি দিয়ে। যা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর উর্দু গজলে–

عشق جب کامل ہوا عین حسن

آگ میں پڑ جائے جو شی آگ ہے۔[১০]

(প্রেম যখন পরিপূর্ণতা লাভ করলো

তখন সৌন্দর্য সরাসরি অগ্নিতে আত্মসমর্পণ করলো,

অবশ্য সে নিজেও অগ্নি বৈ আর কিছু নয়।)

সর্বশেষ গজলে কবি প্রিয়ার দু'টি রূপকল্প সম্পূর্ণ গড়ে উঠার আগেই পরস্পরের সংগে সম্পৃক্ত হয়ে একাকার হয়ে গেলো এবং এক তীর্যক ভঙ্গীতে উপমান উপমেয়কে শক্তিশালী করলো। এই বর্ণনাভঙ্গী পরবর্তিকালে তার সমসাময়িক কবি মির্যা গালিবের মাঝেও স্বার্থকভাবে ধরা পড়েছিল।

ইমাম বখ্শ নাসিখ ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লাক্ষ্মৌ রীতির প্রবর্তক। দিল্লির কবিদের আগমনের কারণে লাক্ষ্মৌর সংস্কৃতি যখন দেহলভী ধারায় চলছিল, ঠিক তখনই নাসিখের উর্দু কবিতার শুভাগমন ঘটে লাক্ষ্মৌর সংস্কৃতিতে এক মহান কাণ্ডারি হিসাবে। তিনি ছিলেন সমাজ সচেতন এক প্রাণপুরুষ। তিনি অদম্য পরিশ্রমী ও সাহসী ছিলেন। সারাটি জীবন তিনি সমাজ সংস্কার ও কাব্য চর্চার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেন। তার মতো এতো মুক্তমনা, পর-উপকারী ব্যক্তি ও কবি সমাজে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি আত্মকেন্দ্রীক না হয়ে হয়েছেন দেশপ্রেমী, এমন ইতিহাস বিরল।

## তথ্যসূত্র

*Dhaka University Institutional Repository*

১। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, সাধনা প্রেস, কলকাতা জানুয়ারি ১৯৬২ পৃষ্ঠা-১২৮।

১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৯

৩। মানির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ডিসেম্ব১৯৬৮ পৃঃ ১২৯

৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩০

৫। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৩১

৬। হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা-৩০

৭। মানির উদ্দীন ইউসুফ, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১৩২

৮। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩২

৯। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩২

১০। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩২

.

Dhaka University Institutional Repository

খাজা হায়দার আলী আতিশ উর্দু সাহিত্য ও কাব্যধারার একজন সুপরিচিত কবি ও দিকপাল ছিলেন। তিনি লাখনৌবী কাব্য জগতের সফল ও স্বার্থক কবি হিসাবে খ্যাত। আতিশকে লাখনৌবী কাব্য ধারার যুগ শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও সংস্কারক বলা হয়। কারণ তিনিই একমাত্র উর্দু কবি যিনি উর্দু কাব্যকে দেহলভী ভাবধারা থেকে মুক্ত করে স্থানীয় লাখনৌবী ভাব ধারায় রূপ দেন। আতিশ অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় উর্দু কাব্যচর্চা করেন। তিনি অত্যন্ত রসালো ভাষায় মানুষের মনের ভাবগুলী কাব্যে স্থান দিয়েছেন। তিনি মির্যা গালিবের সময়কার একজন খ্যাতিমান উর্দু কবি। তাঁর কাব্যের রস মাধুর্যের ও প্রগাঢ় অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটার কারণে তাঁর স্থান কবি মীর ও গালিবের পরেই ধরা হয়। উর্দু কাব্য সাধনায় তিনি কবি হাফিজ সিরাজির একজন যোগ্য উত্তরসুরী হিসাবে সবার কাছে পরিচিত। কারণ তিনি কবিতায় হাফিজ সিরাজির মতই সহজ-সরল ও সাবলিল ভাষায় উর্দু কবিতা লিখতেন।[১]

খাজা হায়দার আলী আতিশ দিল্লিতে ১৭৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেণ। তাঁর প্রকৃত নাম খাজা হায়দার আলী, আতিশ তাঁর কবি নাম এবং এ নামেই সে বেশি পরিচিত। তিনি নবাব শুজাউদ্দৌলার শাসনকালে দিল্লি ছেড়ে ফয়জাবাদ আসেন এবং ফয়জাবাদের মুঘলপুরে তাঁর পিতাসহ বসবাস করতে থাকেন। মূলত আতিশের পূর্ব পুরুষগণ ইরাকের বাগদাদ নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ বাগদাদ থেকে দিল্লিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম খাজা আলী বখশ।

বাল্য কাল থেকেই আতিশের জীবনে দুঃখ কষ্টের ঘোর ছায়া নেমে আসে। কারণ আতিশের ছোট বেলাতেই তার পিতা খাজা আলী বখশ ইন্তেকাল করেন। পিতৃহারা এ বালকের জীবন স্তব্দ হয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর কারণে এ কবিবরের শিক্ষাজীবনের শুরুতেই বাঁধার প্রাচীর দন্ডায়মান হয়। কিন্তু তা কবিবরের কাব্যপ্রতিভা ও কাব্যচর্চায় অধীর আগ্রহের কাছে পরাজিত হয়ে ভেঙ্গে যায়। আর সে সময়ই অতিশের পরিচয় ঘটে মির্যা মুহাম্মদ তকী খান তকীর সঙ্গে। তকী খানের সঙ্গলাভে ধন্য হয়ে তারই হাত ধরে আতিশ চলে আসেন লাখনৌতে। লাখনৌতে বিখ্যাত কবি মুসহফীর নিকট উর্দু কাব্য চর্চায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবেই ক্রমে ক্রমে আতিশ একজন প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় ও ঐকান্তিক আগ্রহরে সাথে শিক্ষা জীবনের অধ্যায় পরিপূর্ণভাবে সমাপ্ত করেন। একাডেমিক শিক্ষার সাথে সাথেই যুদ্ধ ও সৈনিকের শিক্ষার প্রতিও তার যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি সেনা সদস্যদের সাহচর্য গ্রহণ করতে বেশি পছন্দ করতেন। সৈনিকদের কাছ থেকে তিনি অশ্বারোহণ, অসি চালনা প্রভৃতি বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও অভিজাত্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। দামি পোষাক পরতেন এবং সৌখিন সমাজের লোকদের সাথে উঠা-বসা করতেন অনেক প্রভাবশালী মহলের সাথে যাতায়াত করতেন।

প্রাথমিক জীবন তিনি খুব দাপটের সাথে কাটিয়েছেন। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও সাদামাটা জীবনযাপন করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণে নিমগ্ন হন। তিনি সে সময়ে সমাজের কাছে সুফী দরবেশ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবিবর খাজা হায়দার আলী আতিশ ১৮২৩ সালে লাখনৌতে মৃত্যুবরণ করেন।

খাজা হায়দার আলী আতিশ ছোট বেলা থেকেই উর্দু কাব্যচর্চার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দেন, উর্দু কবিতার মধ্যে তিনি মির্যা গালিবের ন্যায় গজলের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেন। উর্দু গজল ছাড়া জীবনের শেষ সময়ে তিনি অন্য কিছু লিখেন নাই। এজন্য আতিশকে উর্দু 'গজল গাওয়া' কবি হিসাবেই পুরো বিশ্ববাসী জানে। লাখনৌর বিখ্যাত কবি গোলাম হামদানী মুসহাফী ছিলেন কবিবর আতিশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু। কবিবর মুসহকীর নিকট দিক্ষা লাভের কারণেই আতিশের গজল উর্দু কবিতার জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানেই আতিশ উর্দু দুনিয়ায় প্রধান গজল কবি হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত মর্যাদা লাভ করেন। [২]

আতিশের কবি নাম অনুযায়ী তাঁর কাব্যও ছিল খুব সতেজ ও উদ্দীপ্ত। উর্দু কাব্য-জগতে মীর ও গালিবের পরেই আতিশের স্থান। কারণ আতিশ অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি সর্বদা কথ্য ভাষায় কবিতাচর্চা করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তাঁর প্রতিটি শব্দ ও পংক্তি রসমাধুর্যে ভরপুর ছিল। অতি সহজ সরল ভাষায় রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা এবং মানুষের মনে নৈসর্গের বিনোদন সৃষ্টি করা আতিশের কবিতার অন্যতম শিল্পগুণ যা গালিবের উর্দু গজলের সাথে অনেকাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি উর্দু গজলের মধ্যে গুরুগম্ভির শব্দ ব্যবহার না করে নাটকের সংলাপের উপযোগী ও সর্বজনজ্ঞাত শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর কবিতার মাধুর্য ও সঙ্গীতময়তা আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক। তিনি কবিতায় নানাবিধ আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার না করে জনসাধারণের মৌখিক ভাষাকে স্থান দিয়েছেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি কোন নৈপুণ্য বা পান্ডিত্য জাহির করার মোটেই পক্ষপাতি ছিলেন না। আতিশ তার গজলে সাধারণ কথ্যভাষা ব্যবহার করে রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এক্ষেত্রে আতিশ তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসিন ছিলেন। [৩]

কবিবর আতিশ উর্দু কবিতা ও গজল রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক আইন কানুনের ধার ধারতেন না। তিনি ছিলেন সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার পক্ষে। তিনি আদিকালের প্রচলিত কাব্যরীতির অন্ধ অনুকরণ কখনো করেননি। তিনি গজল লিখতেন নিজের মতো করে আপন চিন্তা-গবেষণার আলোকে। তিনি গজল লেখার ক্ষেত্রে নতুন কোন নিয়ম প্রবর্তন না করলেও সমসাময়িক কবিগণের কবিতার মধ্যে যে কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হয় আতিশের গজল সে কৃত্রিমতা বিবর্জিত। এ কারণে আতিশের কাব্য সম্বন্ধে কোন কোন পাণ্ডিত সমালোচনা করেন যে, আতিশের কবিতায় কোন পাণ্ডিত্য নেই। কিন্তু সবার মনে রাখা দরকার যে, কাব্য কখনও পাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করেনা। রসব্যঞ্জনাই কাব্যের মূলভিত্তি।

সমালোচনা যারা করেন তারা সর্বদা খুঁত ধরেই থাকেন। মানুষের পিছে তারা লেগেই থাকেন, এমনটাই ঘটেছে উর্দু গজলের কবি আতিশের বেলায়। দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, আতিশ কবিতায় অনেক সময় আরবি-ফারসি শব্দের বিকৃতরূপ ব্যবহার করেছেন। একে সমালোচকগণ তাঁর পাণ্ডিত্যের নূন্যতা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এই অভিযোগের প্রতিউত্তরে বলা যায় যে, আতিশ কাব্যে পাণ্ডিত্য দেখানোর পরিবর্তে সহজ-সরল ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এজন্যই সাধারণ মানুষ মনেরভাব প্রকাশের জন্য যেভাবে আরবি-ফারসি শব্দ উচ্চারণ করেছে ঠিক সেই উচ্চারণভঙ্গিকেই তিনি তার কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তিনি কখনো এই শব্দগুলোর খাঁটি রূপের প্রতি লক্ষ করেননি। তাই তাঁর কবিতা সহজ, সরস এবং স্বাভাবিক হয়েছে। [৪]

কবিবর আতিশ ছিলেন তাঁর সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গজল কবি। তাঁর গজল উত্তম শব্দশৈলি, রাকিব-রাদিফের সর্বোত্তম ব্যবহার, ভাষাগত সহজবোধ্যতা ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ । তবে কেউ কেউ মনে করেন তাঁর কবিতার সকল উপমা-উদাহরণ, রূপক এবং অন্যান্য অলঙ্কার অতিরঞ্জিত। তাঁর গজল ও কবিতায় আছে প্রেমকাহিনী, আছে বিরহের যাতনা, প্রিয়াকে কাছে না পাওয়ার বেদনা। প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বিবাহের শুরু গাহিয়া উঠেছেন–

اے صنم! جس نے تجھے چاند کی صورت دی ہے

اسی اللہ نے مجھے کو بھی مہرت دی ہے

فرقت یار میں رو رو کے بھر گرتوں ہوں

زندگانی مجھے کیا دی ہے مصیبت دی ہے [৫]

(হে প্রিয়া ! যে তোমার চাদের মতো চেহারা দিয়েছে

সেই আল্লাহ আমায় ভালোবাসার মন দিয়েছে

বন্ধুর বিরহে কেঁদে কেঁদে দিন করেছি পার

জীবন আমায় কী দিয়েছে, শুধুই দুঃখ দিয়েছে।)

আতিশের সাথে যারা প্রেম করেছে তারা তাঁর সাথে প্রতারণা করেছেন তারা আতিশের মনে প্রেমের আগুন দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তা নির্বাপিত করে নাই। কবিবর মির্যা গালিবের মতোই প্রেমে বিরহী হয়েছেন, যার নমুনা মেলে আতিশের কবিতায়।

*Dhaka University Institutional Repository*

আতিশ বলেন -

چاندنی میں جب تجھے یاد اے مہ تاباں کیا

رات بھر اختار شماری نے مجھے حیران کیا

قامت موزوں تصور میں قیامت ہو گیا

چشم کی گردش نے کار فتنۂ دوران کیا۔

یاد ابرو وذقن میں اڑ گئی آنکھوں کی نیند

گہ کنواں جھانکا کبھی تلوار کو عریاں کیا

شام سے ڈھونڈھتا کیا زنجیر پھانسی کے لئے

صبح تک میں نے خیال گیسوئے پیچاں کیا۔[৬]

(হে চন্দ্রমুখী, জোৎস্নারাতে তোমার কথা মনে পড়লো

রাতভর আমার নক্ষত্র গণনায় কেটে গেলো,

তোমার সুঠাম দেহের কল্পনা করতেই মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি হলো,

আমার চোখের অস্থির দৃষ্টি অর্থহীন হয়ে গেলো।

তোমার ভ্রু ও গালের টোল যখন মনে পড়লো

আমার চোখের ঘুম তখন উড়ে গেলো,

কখনো কূপে দৃষ্টি দিলাম, তখন তরবারি কোষমুক্ত করলাম।

সন্ধ্যা হতে ফাঁসির দড়ি খুঁজতে থাকলাম,

ভোর বেলায় পর্যন্ত তোমার কুঞ্চিত কেশদামের কথা মনে করলাম।)

মানবকুলের প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে আতিশের কবিতায়। মানবমনের গভীর আবেগটুকু যেমনি ধরা পড়েছে তেমনি ফুটেছে চাহুনী, হাত-পায়ের সৌন্দর্য ইত্যাদি। কবিবর প্রিয়ার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার কেশের বর্ণনা তুলে ধরেছেন এক কবিতায়।

Dhaka University Institutional Repository

কবি বলেন-

جو دیکھے تیری زنجیر زلف کا عالم

اسیر ہونے کے آزادار زو کرتے[৭]

(যে দেখবে তোমার কেশদামের সৌন্দর্য

সে তোমার প্রেমে বন্দী হয়ে যাবে)

আতিশ সহজ সরল ও সাদা মনের মানুষ ছিলেন। তিনি সাধারণ ভারতবাসীর মতো মহল্লায়ে-মালী-খানের সরাইখানার একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে বসবাস করতেন। পার্থিব জগতের আভিজাত্য, ধন-সম্পদের প্রতি তাঁর সামান্য মোহ ছিল না। তিনি যেমন ছিলেন লোভ লালসার ঊর্ধ্বে, তেমনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়। দুনিয়ার কোন ধনাঢ্য, রাজা-বাদশার কাছে কখনো তোষামোদ করেন নাই। তিনি কখনো কারো কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান নাই এবং কারো দয়ার প্রত্যাশাও তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। জ্ঞানগরিমার দিকে তাঁর ঝোক প্রবণতা ছিল। তিনি অর্থসম্পদ কিংবা দুনিয়ার প্রভাবশালীদের কোন তোয়াক্কাই করেননি। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, যাদের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি আছে, সারা দুনিয়া তাদের বিপক্ষে গেলেও তাদের সামান্য ক্ষতি করতে পারবে না। কবিবর আতিশের এমন দৃঢ়বিশ্বাস ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিম্নবর্নিত কবিতার মধ্যে-

طبل و علم ہے پس ہمارے نہ ملک و مال

ہم سے خلاف ہو کے کریگا زمانہ کیا[৮]

রাজ্য ও অর্থকড়ি নেই, তবে আছে মোদের বাদ ও জ্ঞান

শত্রুতা করে কিছুই করতে পারে নাই যুগের অবান্তর ধ্যান ও জ্ঞান।)

কবিবর আতিশ অতি সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন। বিশেষ করে তার শেষ জীবন খুবই সাদা-মাটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হওয়া সত্ত্বেও কখনো তার থেকে সামান্য অহংকার প্রকাশ পায় নাই। তাঁর সাদা মনের ও নিরহংকারের পরিচয় পাওয়া যায় এ কবিতা দু'টিতে–

*Dhaka University Institutional Repository*

تارے گنتے گنتے شب کو صبح کر دیتا ہو میں

نیند اڑا دیتا ہے اک رشک قمر کا انتظار

ٹکٹکی بندوائے رکھتا ہے ہمیشہ سوئے در

مردم دیدہ کو اس نور نظر کا انتظار۔[৯]

(তারকা গুনতে গুনতে রাত্রিকে আমি ভোর করে দেই,

চন্দ্রকে পরাভরকারী এক সুন্দরের অপেক্ষায়

চোখের ঘুম দূর করে দেই

সে আমার দৃষ্টিকে দ্বারের প্রতি নির্নিমেষ করে রাখে,

চোখের পুতুলী সেই জ্যোতির্ময় রূপের প্রতীক্ষায় নিরত থাকে।)

আতিশ ধর্মীয় ভাবগম্ভির সুফীসাধক ও দরবেশ প্রকৃতির একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর অন্তরে সুফীতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিলো। তিনি সর্বদা খোদা-প্রেমের আশেক থাকতেন। নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন মহান প্রভূকে পাওয়ার আশায়। সাধকগণ তখনই সত্য ও সুন্দরের প্রতি উম্মুখ থাকেন, যখন আত্মসাধনা অন্তরে গভীরে প্রবল থাকে। আল্লাহকে পাওয়ার মধ্যে আত্মসাধনার পরিতৃপ্ত ঘটে। আতিশ তাঁর অনেক কবিতায় সুফীসাধক মনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

আতিশ বলেন-

خیال تن پرستی چھوڑ فکر حق پرستی کر

نشان رہتا نہیں ہے، نام زہر جاتا ہے انسان کا۔[১০]

(অঙ্গসজ্জার চিন্তা পরিহার কর

সত্য সাধনার চিন্তায় আত্মনিয়োগ কর,

কারণ প্রার্থীব জগতে মানুষের চিহ্নও বাকী থাকে না,

থাকে শুধু তাঁর সুখ্যাতি, তার নাম ও কীর্তি জ্ঞান।)

*Dhaka University Institutional Repository*

আতিশ ছিলেন সুফীসাধক মানুষ। তিনি সর্বদা ইবাদত-বন্দেগী ও খোদা প্রেমেই মশগুল থাকতেন। তাঁর চরিত্রটি মির্যা গালিবের সুফী দর্শনের সাথে একদম মিলে যায়। তিনি আত্মশুদ্ধি ও আত্মদর্শনে উন্মুখ থাকতেন। তাঁর এ সুফী দর্শনের মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে তার নিম্নোক্ত কবিতায়–

فریب حسن سے گبر و مسلماں کا چلن بگڑا

خدا کی یاد بھولا شیخ، بت سے برہمن بگڑا

قبائی گل کو بھاڑا جب مرا گل پیرہن بگڑا

بن آئے نہ کچھ غنچے سے جو وہ غنچہ دہن بگڑا

تکلف کیا جو کھوئی جان شیرین پھوڑ کر سر کو

جو غیرت تھی تو پھر خسرو سے ہوتا کوہکن بگڑا۔[১১]

(সৌন্দর্যের মোহে অগ্নুৎপাসক ও মুসলমান উভয়েরই চলত বিকৃত হলেন

শেখ আল্লাহর কথা ভুলে গেল, ব্রাহ্মনত্ত প্রতিমার প্রতি রুষ্ট হলো।

গোলাপের কিশলয় অঞ্চল ছিড়ে ফেললাম, যখন আমার সুন্দর পোষাক নষ্ট হলো,

পুষ্পগুচ্ছ কোন কাজে লাগলো না, যখন ফুলকলির ন্যায় সুন্দরী আমার প্রতি রুষ্ট হলো,

শীরীকে হারানোর দুঃখ নেই, যখন সে স্বীয়মস্তক বিদির্ণ করলো

যদি ঈর্ষাই তার মনে থাকতো, তবে সেই গিরি কর্তনকারী

(অর্থাৎ ফরহাদ) খসরুর প্রতি অবশ্যই রুষ্ট হতো।)

কবিবর আতিশ সুফীসাধক ছিলেন এবং দরবেশী জিন্দেগী অতিবাহিত করেছেন। তবে তিনি কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, বৈরাগ্যবাদ তিনি কখনই সমর্থন করেন নাই। তিনি মনে করেন, মনে সাহস থাকলে আর কাঠোর পরিশ্রম করে কার্যসম্পাদন করলে শত কঠিন

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়কে সাধ্য করা যায়। তাই তিনি যুবকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন, যাতে তারা কাজে মন দেয়। তারা যদি বুকে সাহস নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে তাহলে অবশ্যই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবে। কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সারা বিশ্বব্যাপী যত ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস রচিত হয়েছে তা যুবকদের হাতেই রচিত হয়েছে। বিষাক্ত সাপকে দেখে সবাই ভয় পায়, এ কথা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি যদি সাহস করে কেউ সে সাপ মারতে পারে তবে তা হতে অবশ্যই গুপ্তধন সংগ্রহ করা যাবে। একথাটির উপস্থিতি দেখা যায় আতিশের নিম্নবর্ণিত উর্দু কবিতায়–

تم ہمت سے جوانمرد اگر کر لیتا ہے

سانپ کو مار کے گنجینائے گھر لیتا ہے۔[১২]

(যুবকেরা সাহস করে যদি কাজ করতে পারে

সাপ মের গুপ্তধন লাভ করতে পারে)

কবিবর আদিশ ছিলেন বাস্তববাদী ও কৃত্রিমতা বর্জনকারী। তিনি প্রকৃতি সমাজ ও দেশের মানুষের কল্যাণে অকৃত্রিম ছিলেন। তাঁর কবিতার মাধ্যমেই সে কথার পরিচয় পাওয়া যায়–

আতিশ বলেন-

ہو گیا سلسلۂ مہر و محبت برہم

نازنین مہول گئے ناز و ادا میرے بعد

رنگ رخسار گل و لالہ دگر گوں ہو گا

ندر ہے گی نہ گلستاں کی مہو وا میرے بعد[১৩]

(হৃদয়ের উষ্ণতা ও প্রেমের পরম্পরা তাদের নিয়ম কানুন ছেড়ে দিয়েছে।

সুন্দরী প্রিয়তমা তার সৌন্দর্য ও সুরুচিপূর্ণ

আচরণ আমার পরে বিস্মিত হয়েছে।

গোলাপ ও লালার গণ্ডদেশের লালিমা বিপর্যস্ত হয়েছে,

Dhaka University Institutional Repository

ফুল বনের এই হাওয়া আমার পর আর থাকবে না।)

কবিবর আতিশ উর্দু কবিতার ক্ষেত্রে গজল ছাড়া আর কিছুই লিখেন নাই। তাঁর উর্দু গজলের দুইটি দিওয়ান প্রকাশিত হয়। তার মধ্য হতে একটি দিওয়ান তাঁর জীবিত কালে ১৮৪৫ সালে লাখনৌতেই প্রকাশিত হয়। আর দ্বিতীয়টি তার মৃত্যুর পরে ১৮৫১ সালে তার পরম সুহৃদ ও শিষ্য মীর দুস্ত আলী খলীল আতিশের প্রথম কাব্যেরই একটি বর্ধিতরূপ হিসাবে প্রনয়ন করেন যা ১৮৫১ সালে লাখনৌতেই প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় দেওয়ানটি কবিবর আতিশের বাছাইকৃত উন্নতমানে এবং শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতাসমূহ একাধিকবার পরিমার্জন, সংশোধন এবং সংস্কার করে প্রকাশ করা হয়েছে। এজন্যই তার উর্দু গজল বিশ্বব্যাপি খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে।[১৪]

কবি আতিশ এবং নাসিখ দু'জনেই এক সমসাময়িক কবি ছিলেন। তবে তাদের জীবন প্রবাহ যেমন ছিল ব্যতিক্রম ও ভিন্ন ধারার তেমনি তাদের কাব্য ধারাও ছিলো বৈশাদৃস্যপূর্ণ। কারণ কবিবর আতিশ কবিতা লিখতেন অলঙ্কার বিহীন। তার কবিতায় তেমন পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করা যায়না। কিন্তু তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তি ব্যঞ্জনার রস টপকাইত যা কবিতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যে কবিতায় রসাত্মক কথা থাকেনা সে কবিতা শ্রবণ ও পাঠে পাঠক মনে আনন্দ ও সুখ পায়না। আর নাসিখের উর্দু কবিতা ছিল অলঙ্কার দ্বারা আবৃত ও সুসজ্জিত এবং যাতে ছিলো পাণ্ডিত্যে ভরপুর। এ কারণে প্রথম যুগে আতিশের কবিতা ও তার নাম জশ নাসিখের তুলনায় নিস্প্রভ হলেও পরবর্তী যুগে আতিশ নাসিখের তুলনায় অনেক বেশি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার উর্দু গজল ও কবিতা গোটা দুনিয়ায় আলোচনার শীর্ষস্থান হিসাবে খ্যাতি পায়। মির্যা গালিব এক চিঠিতে আতিশের ভুয়শি প্রশংসা করেন এবং আতিশের উর্দু কবিতাকে নাসিখের কবিতার চাইতে অধিক প্রভাবশালী সমুন্নত বলে মন্তব্য করেন।

আতিশ ও নাসিখের কাব্যধারা ভিন্নতার কারণে আতিশগোষ্ঠি ও নাসিখগোষ্ঠি নামে দুইটি মতাদর্শ সৃষ্টি হয় এবং দুই গোষ্ঠির মধ্যে কিছুটা বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। তবে এই বাক-বিতণ্ডা তাদের মাঝে কখনো সংঘর্ষ বা শত্রুতার কারণ সৃষ্টি করে নাই। তাদের বাক-বিতান্ডার কিছু নমুনা ও উদাহরণ নিম্নরূপ-

নাসিখ লিখেছেন,

ایک جاہل کہارہاہے میرے دیوان کاجواب

بو مسیلم نے کہاتھاجیسے قرآن کاجواب[১৫]

(আবু মুসলিম যেমন কোরানের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলো

তেমনি এক অজ্ঞান আমার দীওয়ানের সমালোচনা করেছে।)

*Dhaka University Institutional Repository*

আতিশ গোষ্ঠি নাসিখ গোষ্ঠির অভিযোগের উত্তরে বললেন,

کیوں نہ دہر مومن اس ملحد کے دیوان کا جواب

جس نے دیوان اپنا ٹھرایا ہوئے قرآن کا جواب۔[১৬]

(যে তার দেওয়ানকে কুরআনের সমতুল্য মনে করে,

সেই মুলহিদের দীওয়ানের উত্তর কেন মোমিনগন দেয়না। )

উক্ত উদাহরনের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম আতিশ ও নাসিখের উভয়ের দুটি ভক্ত গোষ্ঠি ছিলেন। তারা কাব্য চর্চার মাধ্যমে বাক-বিতাণ্ডা করেছে। তবে তারা দুজনেই লাখনৌবী কাব্য ধারাকে সমন্বিত ও অলংকৃত করেছেন। তাদের মধ্যে কার্ব চর্চার ব্যাপারে প্রতিযোগীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও কোন প্রকার প্রতিহিংসা ছিলনা। একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য কোন প্রকার সুযোগ নেননি ও বিদ্রুপাত্মক কোন কবিতাও লিখেননি। কবিবর আতিশ সবর্দা নাসিখকে সমমানের চোখেই দেখতেন এবং নাসিখের পাণ্ডিত্যময় কাব্য চর্চার ভুয়শি প্রশংসা করেছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে আতিশ কবি নাসিখকে এতোই সম্মান করতেন যে, নাসিখের মৃত্যুর পর তিনি কাব্য চর্চা ও কবিতা লেখা একদম ছেড়ে দেন এই বলে, যে আমার কবিতা এখন আর কে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে ও বুঝতে পারবে? [১৭]

লাখনৌবি কবিবরের মধ্যে কবিবর আতিশই সবচেয়ে বেশি উদ্যমি ছিলেন। তার উর্দু গজলের সর্বাঙ্গে আবেগ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত আতিশ শুধু লাখনৌ রীতিরই প্রবক্তা নন, তিনি সারা বিশ্ব ব্যাপী উর্দু সাহিত্যেরই একজন শ্রেষ্ঠ দিশারী ছিলেন।

**তথ্যসূত্রঃ**

১। মানির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৩৫

২। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃষ্ঠা-১৩৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩৪

৪। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩৪

*Dhaka University Institutional Repository*

৫। সায়্যিদ মরতুজা হোসাইন, *ইনতেখাবে আতিশ*, কিতাব মঞ্জিল, লাহোর, তারিখবিহীন, পৃ : ৮৬।

৬। মানির উদ্দীন ইউসুফ, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১৩৫।

৭। প্রাগুক্ত, : ৮৩।

৮। প্রফেসর আসাদুল হক শায়দায়ী, *নয়ী আত্তর পুরানী সামা*, দি প্রিন্টিং লাইন পাটনা, ১৯৯৫, পৃ : ৩৫।

৯। মানির উদ্দীন ইউসুফ, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ: ১৩৭।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৩৭

১১। প্রাগুক্ত, পৃ : ৩৬

১২। *নয়ী আত্তর পুরানী সামা*, দি প্রিন্টিং লাইন পাটনা, ১৯৯৫ পৃঃ ৩৫।

১৩। প্রাগুক্ত , পৃ : ৩৬।

১৪। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১৩৪।

১৫। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩৭

১৬। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ১৩৪

১৭। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩৭

১৮। প্রাগুক্ত , পৃ : ১৩৭

## মীর বাবর আলী আনীস

সাধারণভাবে কোন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত প্রশংসাসূচক কবিতাকে মরসিয়া বা শোকগাঁথা বলে। তবে ইসলামি সাহিত্যবিশারদগণ ও ঐতিহাসিকগণ মরসিয়া বলতে কারবালা প্রান্তরে শহীদ ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাকেই বুঝান। উর্দু মরসিয়া কাব্যের আলোচনা করলেই যে বিদগ্ধ কবির নাম সবার সামনে উদ্ভাসিত হয় তিনি হলেন মীর বাবর আলী আনীস। তিনি হলেন উর্দু মরসিয়া কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জ্বল তারকা। কিছু গযল, কাসীদা, রুবাঈ প্রভৃতি রচনা করলেও তাঁর মূল অঙ্গন হলো উর্দু মরসিয়া। মীর বাবর আলী আনীস মরসিয়া কাব্য চর্চার মাধ্যমেই উর্দু সাহিত্যের জগতে অমর হয়ে আছেন। [১]

উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া কাব্যের সূচনা হয় দাক্ষিনাত্যের উর্দু কবিগণের মাধ্যমে। মীর আমানী, মীর আসিমী, মীর আল-আলী দরখশান সিকান্দার, সবর, কাদির, গমান ও নাদীম হলেন দাক্ষিনাত্যের উল্লেখযোগ্য মরসিয়া কবি। মীর তাকী মীর ও সওদা মরসিয়া বা শোকগাঁথা লিখেছেন, কিন্তু তাদের এই সকল কবিতার বিশেষত্ব কিছুই নেই। তাদের কবিতা মরসিয়া হিসাবে কোন খ্যাতি অর্জন করতে পারে নাই। সওদার পূর্ব পর্যন্ত মরসিয়া চার পংক্তি বিশিষ্ট ছন্দে প্রচলিত ছিলো। সওদাই একমাত্র কবি যার হাত ধরে উর্দু মরসিয়া ছয় পংক্তি ছন্দে প্রবর্তিত হয় এবং উর্দু মরসিয়া নতুন রূপে সুসজ্জিত হয়। এরপর দু'জন বিখ্যাত মরসিয়াকার জমীর ও খলীক তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে মরসিয়া চর্চা করতে থাকেন। তাদের এই কাব্যিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে উর্দু মরসিয়া কাব্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। আর তাদের উত্তর সাধকরূপে লাক্ষ্ণৌর কৃতি সন্তান মীর আনীস উর্দু মরসিয়া কাব্যে আবির্ভূত হন আপন মহিমায়।

মীর আনিসের পূর্ণনাম মীর বাবর আলী আনীস। আনীস হলো তার কাব্যিক উপাধি। পিতার নাম মীর মুস্তফা হোসেন খালিক। আনীস ১৮০২ সালে ফায়জাবাদের অন্তর্গত গোলাববাড়ী মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। নওয়াব আসাফুদ্দৌলা লাক্ষ্ণৌ অধিকার করলে পরে মীর আনীসও লাখনোতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। মীর আনিসের পূর্বপুরুষগণ বহু বছরব্যাপী উর্দু ভাষা সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য শ্রম ব্যয় করেছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যদের ঘরোয়ানা ভাষাকেই উর্দু মুয়া'ল্লার ভাষা হিসাবে সর্বযুগেই স্বীকৃত ছিল।

মীর বাবর আলী আনীস প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন মৌলভী হায়দার আলীর নিকট হতে এবং বাল্যকালেই কাব্যিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নিজ পিতার কাছে থেকে। তাঁর পিতা মীর মুস্তফা হোসেন খালিক একজন বিখ্যাত মরসিয়া কবি ছিলেন। যিনি জমীরের সমসাময়িক কবি ছিলেন। মীর বাবর আলী আনীসও নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মরসিয়া কাব্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং পিতার জীবিত কালেই একজন শক্তিমান কবি হিসাবে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। জমীর এ খালিকের তিরোধানে মির্জা দবীর ও মীর আনীস তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রতিযোগিতা করে উর্দু কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে উর্দু কাব্যের বিশেষ করে উর্দু মরসিয়ার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। [২]

মীর বাবর আনীস পিতার কাছ থেকে বাল্যশিক্ষা শেষ করে ফয়জাবাদ থেকে লাক্ষনৌ চলে আসেন। এখানে সে খুব দ্রুত একজন বিখ্যাত কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া এখানে এসে তিনি ব্যায়াম চর্চা, অশ্বারোহণ, ও সৈন্যচালনার কলাকৌশল রপ্ত করার

Dhaka University Institutional Repository

সুবাদে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন রনকৌশলের চিত্র সাফল্যের সাথে তাঁর কবিতায় চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে যেমন আর্ট ও সৌন্দর্য ছিলো তেমনি মানুষের সাথে তার ব্যবহাওে ক্ষেত্রেও সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে কখনোই ছোট করে দেখতেন না, বরং নিজেকে অনেক উঁচু মানের ধনাঢ্য ও রাজা-বাদশার মতোই শক্তি ও সামর্থবান মনে করতেন। তবে তাঁর মধ্যে কখনো কোন প্রকার আত্মম্ভরিতা লক্ষ করা যায়নি। কেউ যদি তার কাব্যের রস আচ্ছাদন করে খুশি হয়ে তাকে কোন হাদিয়া বা উপঢৌকন দিতেন তা তিনি সাদরে খুশিমনে গ্রহণ করতেন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম বাদশাদের খুবই পছন্দ করতেন এবং সর্বদা ধর্ম মেনে চলতেন এ কারণেই মুসলিম বাদশাহীর ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত তিনি লাক্ষনৌ হতে অন্য কোথাও গমন করেননি। তবে পরবর্তিতে নবাব কাসিম আলী খানের জোড় অনুরোধে তিনি ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সালে দুইবার পাটনায় গমন করেন এবং পাটনা থেকে লাক্ষনৌতে ফেরার পথে বারানসীতেও কিছুদিন বসবাস করেন। ১৮৬১ সালে নবাব থুরজঙ্গের অনুরোধক্রমে হায়দারাবাদেও গমন করেন। সেখানে থাকাবস্থায় তিনি মুগ্ধচিত্তে ও মধুরস্বরে তার বাক্যগাঁথা পাঠ করে মানুষদেরকে শোনাতেন, তার কাব্যগাঁথা শ্রবণ করার জন্য আশপাশের লোকেরা পঙ্গপালের মতো এসে জড়ো হতেন। এরপর তিনি সেখান থেকে এলাহাবাদ চলে আসেন। জীবনের বাকী সময়টুকু তিনি এলাহাবাদেই কাটিয়ে দেন। এখানকার মানুষও তার সুমধুর কাব্যগাঁথা শোনার জন্য ভীর জমাতেন। তিনি কাব্য আবৃতি করে তাদের শুনিয়ে আত্মতৃপ্ত করতেন। উর্দু মরসিয়া কাব্যের এই উজ্জ্বল তারকা ও যুগ শ্রেষ্ঠ অমর শিল্পি মীর বাবর আলী আনীস ১৮৭৪ সালে এলাহবাদেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সবার মাঝে শোঁকের ছায়া নেমে আসে।

মীর বাবর আলী আনীস উর্দু কাব্য চর্চায় যে অমিয় শক্তির অধিকারী ছিলেন সে কবিত্ব শক্তি তিনি তাঁর বংশ-ঐতিহ্যরূপে লাভ করেছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর কবিত্বের স্ফুরণ হয়। মীর আনিস প্রথম জীবনে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি হাজীনের নামানুসারে কবি নাম হাজীন গ্রহণ করেন। পরে যখন কবিবর ইমাম বখশ্ নাসিখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কবি নাসিখ তাকে হাজীন কবি নাম পরিবর্তন করে আনীস গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। এই কবিনাম পরিবর্তন করেই ক্রমে ক্রমে তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [৩]

মীর বাবর আলী আনীস অসংখ্য কবিতা ও মরসিয়া, কিতা ও রুবায়ী লিখেছেন। এবং এর মাধ্যমে উর্দু কাব্যকে নতুন নতুন শব্দ ও উপমা উপহার দিয়েছেন। তিনি অল্প সংখ্যক গজল ও কাসীদাও লিখেছেন। উর্দু সাহিত্য বিশারদগণ বলেন, মীর আনীস মরসিয়াসহ মোট আড়াই লক্ষ কবিতা লিখেছেন, যা নওল কিশোর প্রেস থেকে পাঁচটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নিজামী প্রেস মীর আনিসের বাল্যকাল, যৌবনকাল এবং বৃদ্ধকাল এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক পৃথকভাবে তাঁর সকল কবিতাবলী প্রকাশ করেছে। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী তাঁর বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত আছে। [৪]

*Dhaka University Institutional Repository*

যুগশ্রেষ্ঠ মরসিয়া কবি মীর বাবর আলী আনীস ছিলেন মরসিয়া কাব্যের সুদক্ষ শিল্পী। ভাষার উপর ছিলো তাঁর সীমাহীন দক্ষতা, তাঁর কবিতায় বিভিন্ন উপমার প্রয়োগ, নতুন নতুন শব্দের চয়ন, কল্পনার রূপায়ন, আবেগের স্ফুরণ, সর্বক্ষেত্রে সহজ, সাবলীল ও স্বতস্ফূর্ততার প্রকাশ ঘটেছে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর বর্ণনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় হতে পেরেছিল। কারবালার কাহিনির প্রধান রস করুণ রস। আর সেই করুণ রস ও কাহিনীর নিখুত বর্ণনা সূচনা হয়েছে মীর বাবর আলী আনীসের কাব্যে। ইমাম হুসাইন পরিবারের প্রায় ৬০ জন সদস্য নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন কিন্তু শুধু কন্যা সুগরাকে অসুস্থতার কারণে সঙ্গে নেওয়া হবে না। সুগরা যাত্রার লক্ষণ দেখে বুঝতে পেরেছে, কোন দূর দেশে যাওয়ার প্রস্তুতি হচ্ছে, অথচ তাকে সঙ্গে নেয়া হবে না। তাই সে করুণ ও মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকেন পিতা ইমাম হুসাইন (রা,) এর দিকে বিদায়ের শেষ বেলার সেই করুণ মুহূর্তটি এভাবে দৃশ্যায়িত হয়েছে মীর আনীসের মরসিয়াতে।

মীর আনীস বলেন-

شبیر کا منہ تکنے لگی بانوے مغموم

صغرا کے لئے رونے لگیں زینب کلثوم

بیٹی سے یہ فرمانے لگے شیر مظلوم

پردہ رہا اب کیا خود ہو گیا معلوم

تم چھٹی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغرا

ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں صغرا۔[৫]

(শাববীরের (হুসাইনের) মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যথিতা মহিলা

সুগরার জন্য যয়নব ও কুলসুম কাঁদতে লাগলেন

অত্যাচারিত ইমাম কন্যাকে বললেন

গোপনীয়তার কিছু নেই তুমি নিজেই বুঝতে পারছো

তুমি রয়ে যাচ্ছ বলে তোমার জন্য সবাই কাঁদছে সুগরা,

আজ থেকে আমি দেশত্যাগী, আজ থেকে আমি দেশত্যাগী হলাম সুগরা।)

*Dhaka University Institutional Repository*

কন্যা সুগরা কিছুতেই বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবেনা, এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সুগরা মিনতি করে বলছে, যাত্রার অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমাকে নিয়ে ভাববার কিছু নেই, আমি কাউকে কোনরূপ বিরক্ত করবোনা। রুগ্ন হলেও আমি কারো পরিচর্যার মুখোপেক্ষী হব না, তার পরও আমাকে সফরসঙ্গী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হোক। এ করুণ কাহিনীটি ধরা পড়েছে মীর আনিসের ভাষায়–

صغرا نے کہا کھانے سے خود مجھے انکار

پانی جو کہیں راہ میں مانگوں تو گنہگار

کچھ بھوگ کا شکوہ نہیں کرنے کی یہ بیمار

تبرید فقط آب کا ہے شربت دیدار

گرمی میں بھی راحت سے گزار جائے گی بابا

آئے گی پسینہ تپ اتر جائے گی بابا

وہ بات نہ ہو گی جو بے چین ہو مادر

ہر صبح میں پی لونگی دوا آپ بنا کر

دن بھر مری گودی میں رہینگی علی اصغر

لونڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دختر

میں یہ نہیں کھتی کہ عماری میں بیٹھا دو

بابا مجھے فقہ کی سواری میں بیٹھا دو۔[৬]

(সুগরা বললেন, খাবার অভিরুচি আমার এমনিতেই নেই,

পথে যদি পানি প্রার্থনা করি সে হবে আমার জন্য পাপ

ক্ষুধার জন্য এই রুগ্না এতটুকু শেকায়েত করবে না

Dhaka University Institutional Repository

শুধু আপনার দর্শনের পিপাসিত আমি।

বাবা, গ্রীষ্মের আতিশয্যও আমার জন্য সুখের হবে,

গা থেকে ঘাম বেরুলে জ্বর আপনিই ছেড়ে যাবে।

মা বিচলিত হবেন এমন কোন কারণই ঘটবে না,

প্রতিদিন সকালে নিজের ওষুধ আমি নিজেই তৈরি করে খেয়ে নিব।

আলী আছগর (হুসাইনের শিশু পুত্র) আমার কোলে কোলেই থাকবে,

আমাকে কন্যা না ভেবে সকীনার (হুসাইনের চার বছরের কন্যা) বাদী বলে গণ্য করুন।

আমি পাল্কিতে করে যাওয়ার কথা বলছিনা বাবা,

আমাকে ফিজ্জার (জৈনকাবাঁদী) বাহনেই বসিয়ে দিন।)

প্রকৃতির বর্ণনা মীর আনীসের কাব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। যেমন তাঁর মরসিয়া কাব্যে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের স্বর্গীয় আভা, মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতেজ ও অন্ধকার রাতের বিষন্নতা, কিংবা সন্ধ্যাবায়ু ও চাঁদনী রাতের স্নিগ্ধতা তাঁর কবিতায় একদম জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। রাতের আঁধার কেটে ভোরের সূর্য ওঠার চিত্র তুলে ধরেছেন কবি এভাবে–

خورشید نے جو رخ سے اٹھائی نقاب شب

در کھل گیا سحر کا ہوا بند باب شب

انجم کی فرد فرد سے لے کر حساب شب

دفتر کشائے صبح نے الٹی کتاب شب [৭]

(সূর্য যখন রাত্রির ঘোমটা মুখ থেকে

উন্মোচিত হলো রাত্রির দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল

আর খুলে পড়লো ভোরের বাতায়ন

তখন নক্ষত্রের একটি একটি করে হিসাব নিয়ে

নিশাবসান রাত্রির গ্রন্থটি উল্টিয়ে রেখে দিল। )

ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাঁর সফর সঙ্গীদের সাথে নিয়ে তপ্ত মরুভূমির পথ অতিক্রম করছেন। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতেজের ভয়াবহতা ও অসহনীয় মুহূর্তটি চিত্রায়িত হয়েছে মীর আনীসের কবিতায়– যা নিম্নরূপ ঃ

وہ لُون وہ آفتاب کی جدت و تاب و تب

کالا رنگ دھوپ سے دن مثال شب

خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب

خیمے جو تھے جابوں کے پہنے سب کے سب۔[৮]

(কী সেই লু হাওয়া, সূর্যের কী তাপ ও ঔজ্জ্বল্য !

রৌদ্রের রং যেন অমাবস্যার ঘোর কৃষ্ণতা।)

স্বয়ং আলকামার (কারবালার নিকটস্থ এক স্রোতস্বিনী) ওষ্ঠধর শুষ্ক,

ফোরাতের পানি সূর্যের তৃষ্ণতা জিহবার সামনে একেবারেই উন্মুক্ত)

ইমাম হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর সংগীদল কারবালা প্রান্তরে এসে থেমেছেন। তারা একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেললেন, কারণ কারবালার অতি নিকটেই ফোরাত নদী। তারা ঊষার মরুভূমির মধে একটি বিশ্রামের স্থান খুঁজে নিয়েছেন। সেই দৃশ্যটি কবি মীর আনিস কবিতায় ফুটে উঠেছে এভাবে–

اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا ناخدا

جس نے سوار تھے، وہ ہوئے سب پیادہ پا۔

حضرت نے مسکرا کے یہ بھر ایک سے کہا

دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر، کیا فضا[৯]

(উম্মতের কাণ্ডারী 'এ' বলে অশ্ব থেকে অবতরণ করলেন,

সঙ্গে সঙ্গে সবাই নামলো তাদের বাহন থেকে।

মৃদুহাসি দেখা দিল ইমামের ওষ্ঠাধরে,

তিনি বললেন, দেখ কি সুন্দর অববাহিকা, কী সুন্দর স্রোতস্বিনী!)

সঙ্গীদল এতো সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য দেখে আবেগে বলে উঠলো এখানেই শিবির ফেলতে হবে, অন্যরাও সবাই খুশী। তাদের এতো আনন্দ দেখে ইমাম হুসাইন (রাঃ) আবার একটু হাসলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার তার চেখে অশ্রু ভরে এলো– কারণ তিনি জানেন এতো আনন্দের পরেই নিমিষ কালো দুঃখের ছায়া নেমে আসবে। এমনি চিত্রটি ধরা পরেছে কবির কলমে–

بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سربلند

کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند

کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند

بس یاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند[১০]

(উন্নত শির শাহিনশাহ্ সজল কণ্ঠে বললেন,

কেন জানিনা এ প্রান্তর সবারই মনঃপুত হয়েছে।

সঙ্গীদের মধ্যে একজন মৃদু হেসে নিবেদন করলেন,

হে মহান অধিপতি, এখানে তো

আপনা আপনি চোখে নিদ্রাকর্ষণ হয়।)

মীর আনিস ছিলেন বাস্তববাদী একজন কবি। তিনি বাল্যকাল থেকেই যুদ্ধের জ্ঞান ও কলাকৌশল রপ্ত করেছিলেন। সে কারণেই তিনি যুদ্ধের নানা বর্ণনাভঙ্গীকে অলংকারিক ঢংয়ে বর্ণনা করেছেন। এর সাথে সাথে প্রকৃত ও সত্য ঘটনাবলীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে মীর আনীসের কবিতায়–

মীর আনীস বলেন-

Dhaka University Institutional Repository

نکلی جو ران میں تیغ حسینی غلاف سے

اڑنے لگے شرر دم خار شگاف سے

بجلی بڑھی چمک کے جو دشت مصاف سے

صاف آتی الامان کی صدا کوہ قاف سے[১১]

(বনভূমিতে হুসাইনের (রাঃ)-এর তরবারি কোষোন্মুক্ত হলো
তখন কঠিন প্রস্তর থেকে আগুনের হলকা নির্গত হতে লাগল
রণাঙ্গনের সৈন্যসারি থেকে যখন বিদ্যুৎ চমক বাড়তে লাগল
তখন ককেসাস পর্বত থেকে "রক্ষা করো" ধ্বনি উঠতে লাগল)

কারবালার যুদ্ধের ময়দানে ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর অশ্বের গতি, তরবারি চালনার অবস্থা আনীসের মরসিয়ায় সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবিত্ব শক্তির এমন সাক্ষাৎ আনীসের কাব্যকে আরো জীবন্ত করে তুলেছে। কবির ভাষায় অশ্বের গতির উদাহরণ–

بجلی کبھی بنا، کبھی رہوار بن گیا

آیا عرق تو ابر گہربار بن گیا

گہ قطب، گاہ گنبد و دار بن بن گیا

نقطہ کبھی بنا، کبھی پرکار بن گیا

حیران تھے اس کے گشت پہ لوگ اس ہجوم کے

تھوڑی سی جا میں پھرتا تھا کیا جھوم جھوم کے[১২]

*Dhaka University Institutional Repository*

(কখনো সে (অশ্ব) বিদুৎ পরিণত হয়েছে, কখনো অশ্বে,
(তার গা থেকে) ঘর্ম যখন নির্গত হলো তখন প্রতিটি
বিন্দু মুক্তা উৎপাদনকারী জলদবিন্দুতে পরিণত হলো।
কখনো সে হল ধ্রুবধারা, কখনো গম্বুজের মতো উচ্চশীর্ষ,
কখনো সে ঘূর্ণি বিন্দুমাত্র কখনো পরিধি রচনাকারীবৃত্ত।
লোক অশ্বের এ গতি দেখে বিস্ময় হতবাক হয়ে রইলো,
আবেগের প্রমত্ত হয়ে সে যেন নিজেকে ঘিরেই নৃত্য করছে)

তরবারি চালনার উদাহরণ–

چمکی، گری، اٹھی، ادھر آئی، ادھر گئی
خالی کئے ہڑے، تو صفیں خوں میں بھر گئی[১৩]

(ঝলছে উঠলো, নমিত হলো, জেগে উঠলো, এ দিকে এলো, ওদিকে গেল
সম্মুখ পরিস্কার হইলো পরে দেখা গেল সারির পর সারি রক্তে ভেসে গেল।

কারবালা প্রান্তরের প্রতিটি মুহুর্ত আনীস গভীর মায়া ও আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কারবালার মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবির অন্তরাঅত্মা কেঁপে উঠেছে, নিজে কেঁদেছেন, পাঠককেও কাঁদিয়েছেন। কবি ইমাম পক্ষের এক বীর 'হুরের' শহীদ হওয়ার দৃশ্যটি এভাবে এঁকেছেন–

قبلہ رو کیجئے لاشہ مرا اے قبلۂ دیں
پڑھتے یسین کہ اب ہے یہ دم باز پسیں
کوچ نزدیک ہے اے بادشہ عرس نشین

Dhaka University Institutional Repository

لیجئے تن سے نکلتی ہے مری جان حزین

بات بھی اب زبان سے نہیں کی جاتی

کچھ اوڑھا دیجئے مولا! مجھے نیند آتی ہے۔[১৪]

(হে ধর্মের কিবলা! আমার নিস্পন্দ দেহকে কিবলামুখী করুন

শেষ নিঃশ্বাস বইছে ইয়াসিন সূরা পাঠ করুন

হে স্বর্গের বাদশা! যাত্রা আমার আসন্ন

দেহ থেকে আমার ব্যাথিত প্রাণ নির্গত হচ্ছে.

জবান কথা বলতে অপারোগ হচ্ছে

হে প্রভু! আমাকে কিছু দিয়ে ঢেকে দিন, বড় ঘুম পাচ্ছে।)

মীর বাবর আলী আনীসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য অনুভূতিপূর্ণ, সহজ-সরল, স্বতঃস্ফূর্ততা ও সামঞ্জস্য চিন্তাধারার উপর নির্ভরশীল। আর একারণেই তাঁর বর্ণনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় হতে পেরেছিল। তাঁর সময়কাল ছিল কাব্যে অলঙ্কার-আতিশয্যের যুগ। তিনি সেই আতিশয্য হতে দূরে থেকে কাব্যকে রসঘন, করুণ রস, বীররস, বাৎসল্য রস ও প্রকৃতির বাস্তবানুগ বর্ণনায় সমৃদ্ধ করে উর্দু সাহিত্যের ঐতিহ্যকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যেখানে যেরূপ অলঙ্কারের প্রয়োজন সেখানে সেরুপ অলঙ্কার ব্যবহার করে ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আরবি ও ফারসি শব্দের পরিবর্তে স্থানীয় ভাবধারা প্রবর্তন করে তিনি উর্দু ভাষাকে সুমধুর ও রসপূর্ণ করার অসামান্য চেষ্টা করেছেন। ভাষার মাধুর্য ও উন্নতিকল্পে তিনি স্থানভেদে একই অর্থযুক্ত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে উর্দু ভাষার শব্দভাণ্ডারকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর উর্দু মরসিয়ার এমন সাজানো গোছানো সুর ও মাধুর্য এবং চিত্তাকর্ষের জন্য কেহ কেহ তাকে ভারতের সেক্সাপীয়ার বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মরসিয়া কাব্য জাতীয় মহাকাব্যের সুর প্রবর্তন করেছে বলে তাকে অনেক সময় হোমার, ভার্জিল বা মহাকবি বাল্মিকির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আনীসের পূর্বে লাখনোয়ী ও দিহলবী উর্দুর বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম এই দুই উপভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে উর্দু ভাষার উৎকর্ষ আরো ব্যাপক

*Dhaka University Institutional Repository*

হারে বিস্তার করতে সক্ষম হন। সাহিত্যে প্রকৃতির ও যুদ্ধের বর্ণনা তিনিই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। বস্তুত মরসিয়া কাব্যে তাহমীদ, যুদ্ধচিত্র এবং অন্যান্য চরিত্র বর্ণনায় তিনি যে ঝলক দেখিয়েছেন তাতে তাকে প্রসিদ্ধ ফারসী কবি ফিরদৌসী বা নিজামীর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। [১৫]

মীর বাবর আলী আনীসের মরসিয়া কাব্য কারবালার ময়দানের বিভিন্ন করুণ রসে পরিপূর্ণ। মরসিয়া কাব্যে আনীস সর্বাঙ্গে পুরোপুরি সফল হয়েছেন। তাঁর দরদভরা আন্তরিক বর্ণনা যেমন সহজ, তেমনি হৃদয়গ্রাহী, অতি করুণ ও মানবিক। তাঁর এ মধুমাখা সুরেভরা মরসিয়া পাঠ করে দুনিয়ার সবাই চোখের পানি ফেলে বুক ভাসিয়ে কারবালার যুদ্ধ ময়দানের সফরসঙ্গী শহীদগণ ও ইমাম হুসাইনের (রা.) আত্মার প্রতি সমবেদনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

## তথ্যসূত্র

১। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ: ১৪৮

২। সাইয়্যেদ এজাজ হোসাইন, *তারিখে আদবে উর্দু*, ইদারায়ে এশায়াতে উর্দু, লাহোর, অক্টোবর, ১৯৪৮, পৃ: ১৭৫।

৩। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫০

৪। এজাজ হোসাইন, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৭৭

৫। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে*, পৃ : ১৫৭

*Dhaka University Institutional Repository*

৬। *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, পৃ : ১০৬

৭। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫৯।

৮। ড. ইস্রাফিল, *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, পৃ;১০৬

৯। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৬১

১০। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৬১

১১। *উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও কবিতা*, পৃ : ১০৬।

১২। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৬৬।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৬৬।

১৪। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৬২।

১৫। অধ্যপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্রপাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫২।

Dhaka University Institutional Repository

# মীর্যা সালামত আলী দবীর

মির্যা সালামত আলী দবীর উর্দু কাব্য জগতের একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছিলেন মরসিয়া কবি। দুজন কবির স্পর্শে উর্দু মরসিয়া কাব্যের বিকাশ প্রসার ও পরিপূর্ণতা লাভ করে দবীর তাদের অন্যতম মির্যা সালামত আলী হলেন একজন জ্ঞানীগুনী ও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যে অতিসহজ কোন শব্দ বা অনভূতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনি কঠিন থেকে কঠিনতম ও নতুন নতুন বিদেশী শব্দ ব্যবহার করে তাঁর উর্দু কাব্য ও মরসিয়া বা শোকগাঁথা কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এছাড়া তাঁর উর্দু মরসিয়ার প্রতিটি পংক্তি অলংকারে ভরপুর। তাঁর কবিতা অতি উন্নতমানের অলংকার দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে তাকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগন বেশ সম্মানের চোখে দেখেন। দবীর হলেন তাঁর সময়ের একজন যুগশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কাব্যচর্চার মাধ্যমে বিশেষ করে তাঁর মরসিয়া কাব্যের দ্বারা উর্দু সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভ হয়। দবীর ব্যক্তি ও মানুষ হিসাবে খুবই অমায়িক ছিলেন। তিনি কখনোই কাউকে কষ্ট দিয়ে কোন কথা বলেন নি।

দবীরের আসল নাম, মির্যা সালামত আলী, দবীর হলো তাঁর উপাধী বা কাব্যিক নাম। এ নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তাঁর পিতার নাম মির্যা গোলাম হোসাইন। জীবনী সংগ্রহকারী ঐতিহাসিকগণ বলেন মির্যা সালামত আলী দবীরের বংশ ছিল সম্ভ্রান্ত। তিনি ১৮০৩ সালে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই পিতার সাথে লাখনৌতে চলে আসেন এবং লাখনৌতেই তাঁর শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয় এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা তিনি এখানে সমাপ্ত করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি কবিমনা ছিলেন, যেখানেই কবিতা পাঠের আসর বসত দবীর তথায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তার কবিতা শুনে ছোট বড় সবাই আকৃষ্ট হতেন। তিনি কাব্যে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মীর মুজাফফর হোসাইন জমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কাব্য পাঠ ও অনুশীলনীতে তিনি এমন সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করলেন যে, উস্তাদের চেয়েও তার সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধি পেল। অনেকেই কথা বলতে লাগলেন যে, দবীর তার শিক্ষকের চেয়েও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। "মাওলানা আযাদ দবীর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, দবীর শুধু তার উস্তাদের নির্মাণকৃত প্রাসাদকেই সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন নি বরং উস্তাদ থেকে যে জ্ঞান পেয়েছেন, তাকে আরো অনেক উন্নততর ও প্রসারিত করেছেন। যখন দিন দিন তার সুনাম ও সুখ্যাতি ধ্রুবতারার মতো প্রজ্জ্বলিত হতে থাকলো তখন 'উদ' রাজ দরবার থেকে তাকে সম্মান ও পুরস্কৃত করা হলো এবং তার প্রতি সুদৃষ্টি নিবন্ধিত হলো।"

মাওলানা আজাদের মন্তব্যটি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

مرزا دبیرؔ نے یہی نہیں کیا کہ اپنے استاد کی بنائی ہوئی عمارت کو قائم رکھا۔ بلکہ بقول آزاد مرحوم جو کچھ استاد سے پایا اسے بہت بلند اور

Dhaka University Institutional Repository

روشن کر کے دکھایا۔ جب شہرت کا ستارہ بلند ہوا تو دربار اودھ نے بھی سرپرستی کا ہاتھ بڑھایا۔"[১]

মির্যা সালামত আলী দবীর কাব্যের অনেক শাখা-প্রশাখায় কাজ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়াবলী হলো– রুবাই, সালাম, নোয়াহা ও মরসিয়া বা শোকগাঁথা। তিনি কাব্য জগতে সবচেয়ে বেশি মনোনিবেশ করেন উর্দু মরসিয়ার প্রতি। তিনি কমসে কম তিন হাজার উর্দু মরসিয়া লিখেছেন ও পাঠ করে শুনিয়েছেন। মির্যা দবীর এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কাব্যে আড়ম্বরপূর্ণ শব্দ, নতুন নতুন উদাহরণ ও উপমা প্রদান, ইস্তেয়ারা এবং উন্নত ও প্রসিদ্ধ শব্দ ও বাক্যর অনুপ্রবেশ ঘটানো। তাঁর ভাষা ছিল উন্নত । তিনি ভাষায় নিখুত ও চমৎকার শব্দ ব্যবহার করতেন যা ছিল অনুসরণীয়। তাঁর কাব্যগুলী এতো উন্নত হওয়ার কারণেই তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মরসিয়া কবি হিসাবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। উর্দু সাহিত্যের এ মহান কবি ও যুগশ্রেষ্ঠ মরসিয়াকার মির্যা সালামত আলী দবীর ১৮৭৫ সালে এ দুনিয়ার মায়াজাল ত্যাগ করে মহান প্রভূর দরবারে চলে যান। দবীরকে তাঁর নিজ বাসভূমিতেই দাফন করা হয়। [২]

দিল্লিতে যখন দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয় এবং দিল্লির দীপ্তমান আলো নিস্প্রভ হয়ে গেল। তিনি পিতার সাথে লাক্ষ্ণৌ আসেন এবং সেখানে অনুকূল পরিবেশে বসবাস করেন। পরবর্তিতে তিনি সেখানে বিবাহ করে জীবনযাপন করতে থাকেন। দিল্লির অরাজকতা দুর হলে দবীরের পিতা গোলাম হোসেন পূনরায় লক্ষ্ণৌ হতে দিল্লিতে নিজ আবাসভূমিতে ফিরে আসেন। কিন্তু মির্যা সালামত আলী দবীর পিতার সাথে ফিরে না এসে লাক্ষ্ণৌতেই থেকে যান এবং এখানে তিনি সাত বছর বয়সেই উস্তাদ মীর জমীর আলীর নিকট কাব্যে হাতেখড়ি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হতেই তিনি তিক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং কবিত্বের পূর্বাভাসও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রের উপর পড়ালেখা ও গভীর অধ্যয়ন করে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং অতি শীঘ্রই মরসিয়া কাব্য একজন প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর বাহ্য-আড়ম্বরপূর্ণ পাণ্ডিত্যের জন্য তার যুগে তিনিই মরসিয়া কাব্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি হিসাবে সর্বমহলে স্বীকৃতি পান। তার পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়ে খুশিতে সবাই হিল্লোলিত হন। মরসিয়া কাব্য রচনা করে সারা হিন্দুস্তানে তিনি সুনাম ও সুখ্যাতি লাভে ধন্য হন। লক্ষ্ণৌ ও তার বাইরে বিভিন্ন নগরীতে তিনি সরচিত কাব্য পাঠ করে শোনান। তার মরসিয়া কবিতা আবৃতি শোনার জন্য হাজার হাজার লোক পঙ্গপালের মতো তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন। [৩]

মির্যা সালামত আলী দবীরের বংশানুক্রমিক কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের বা কবিত্বের গৌরব ছিলনা। তিনি অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, অনাড়ম্বতা, অমায়িক ব্যবহার ও চিত্রাকর্ষণের দ্বারাই নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে সক্ষম হন। তাঁর পাণ্ডিত্যের গৌরবই তাকে মীর বাবর আনীসের উপর প্রাধান্য দান

Dhaka University Institutional Repository

করেছিল। আর কারণেই তিনি নিজের সময়ে অসংখ্য শিষ্য কর্তৃক উস্তাদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যা তার ব্যক্তি জীবনেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সে সময় লাক্ষ্ণৌতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সুপরিচিত, অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী দুইজন কবি মীর বাবর আলী আনিস ও মির্যা সালামত আলী দবীরের আগমনের কারণে লাক্ষ্ণৌতে মরসিয়া কাব্যের দু'টি দলের উদ্ভব হয়, যা সারা লাক্ষ্ণৌতে 'ধানীসিয়া' ও 'দবীরিয়া' গোষ্ঠী নামে পরিচিতি লাভ করে। তাদের অনুসারিগণ নিজ নিজ উস্তাদের মর্যাদার উপর অনেক বেশি প্রাধান্য দিতেন। উভয় গোষ্ঠীর সমর্থকদের মধ্যে প্রায়ই অনেক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা, আলোচনা, বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে একে অপরকে ঘায়েল করার জন্য বিদ্রুপপূর্ণ কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু দবীর ছিলেন বিশেষ অমায়িক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তিনি মীর আনীসকে খুব সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন, তাই দুই দলের বাক-বিতণ্ডা কখনই সীমা লঙ্ঘন করতে পারে নাই। [৪]

মীর আনীসের ন্যায় মীর্জা দবীরও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে অবশেষে তাঁর প্রিয় আবাসভূমি লাক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ১৮৫৫ সালে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন এবং ১৮৫৯ সালে পাটনায় গমন করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে এশটি রোগের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অতি কষ্টে দিনাপাতিত করতে থাকেন। তাঁর এ দৃষ্টিশক্তিহীনতার সংবাদ পেয়ে মাটিয়াবুরুজের অধিবাসী ওয়াজেদ আলী শাহ কলকাতার বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তাঁর জীবনে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস এনে দেন, পরবর্তীতে তিনি বেশ আরামেই জীবন অতিবাহিত করেন। কবিবর মির্যা সালামত আলী দবীর বিভিন্ন স্থানে সফরের মাধ্যমে জীবনের অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হন। [৫]

দবীর ছিলেন নৈপুণ্য ও শৈল্পিক গুণের অধিকারী, ভাষার উপর ছিল তাঁর অপরিসীম দক্ষতা। তিনি কাব্যে নতুন নতুন শব্দ ও উপমা প্রয়োগ, কল্পনার উড্ডয়ন ও শব্দের ঝংকার ও আড়ম্বরতার দিকে অধিক নজর দিতেন। তিনি কাব্যে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও পাণ্ডিতপূর্ণ বিদেশী শব্দ যথা আরবী ও ফার্সী শব্দ ব্যবহার করে উর্দু সাহিত্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকতেন। তার কাব্যে ভাব অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক না হলেও সরসতা ও সমৃদ্ধগুণে পরিপুষ্ট ছিল।

আনীস ও দবীরের কাব্য চর্চার মাধ্যমেই উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া কাব্য পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাদের উর্দু মরসিযা কাব্যই পরবর্তী যুগে এপিক বা জাতীয় মহাকাব্যরূপে বিকাশ লাভ করে। আর ফার্সী মসনবী কাব্যই পর্যায়ক্রমে উর্দু সাহিত্যে মরসিয়া কাব্যে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক যুগেও যে সকল দেশাত্মবোধক ও চিত্তাকর্ষক উত্তেজনাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় তার সব চিন্তাধারা ও কাব্যের গঠনপ্রণালী আনীস ও দবীরের মরসিয়া কাব্য হতেই সংগ্রহ করা হয়েছে। [৬]

*Dhaka University Institutional Repository*

ঐতিকহাসিকগণের মতামতের ভিত্তিতে জানা যায় মীর আনীস ও মির্যা দবীর উভয়ে মিলে মোট দশ লক্ষ পংক্তি মরসিয়া রচনা করেছেন। তাঁদের এ উচ্চ আদর্শও নৈতিকতা সম্পন্ন, হৃদয়গ্রাহী ভাবোদ্দীপ্ত মানবিক, উচ্চজ্ঞান সমৃদ্ধ ও অলংকারিক কাব্যের উপস্থিতির কারণে তাদের কাব্য-বন্যার স্রোতধারায় লাক্ষ্ণৌর গতানুগতিক অবক্ষয় দুর হয়। কুরুচিপূর্ণ দরবারী কাব্যের নোংরামীও বেহায়াপনা বিরুদ্ধে তারা বাঁধার প্রাচির দাঁড় করে দেয়। [৭]

মির্যা দবীরের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনাসমৃদ্ধ দুটি উর্দু কবিতা উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হলো, যার মধ্যে কবিবর দবীরের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়–

اے دبدبۂ نظم دوعالم کو ہلادے

اے طنطنۂ طبع جزو کل کو ملادے

اے بائے بیان معنی تسخیر کو حل کر

اے سین سخن قاف سے تا قاف عمل کر۔ [৮]

(হে কবিত্বের সমারোহ ও ঘটা, তুমি দুই জাহানকে প্রকম্পিত কর,

হে আমার সংগীত স্বভাবের অবরোহ, তুমি অংশ

ও পূর্ণতার মিলন ঘটিয়ে দাও।

হে বর্ণনার শক্তি, তুমি প্রসংগের আবর্তনের তাৎপর্যকে প্রকটিত কর,

হে রসনার বৈচিত্র্য, তুমি দুরবর্তী ককেসাস থেকে হিমালয় পর্যন্ত সবকিছুকে অনুবর্তী কর।)

মির্যা গালিবের মতই মির্যা দবীরের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সর্বব্যাপী যাকে উর্দুতে বলা হয় (আফাকিয়াত) । কারণ দবীর যে শোকাহত "কারবালার" করুণ কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন সেখানে কেবল একটি কাহিনীর রহস্য উদঘাটন করা উদ্দেশ্য নয়, গোটা মানব জীবনকে এবং মানব জীবনের এরকম যত শোকাবহ কাহিনী সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলোই দবীরের কাব্যের উপজিব্য। আর এজন্যই ককেসাস থেকে হিমালয় পর্যন্ত যত

Dhaka University Institutional Repository

ঘাত-প্রতিঘাত ও ইতিহাস ঐতিহ্য কালে কালে সংঘটিত হয়েছে কবির সবগুলীরই প্রয়োজন। উপরোক্ত কবিতায় এজন্য তিনি মহান প্রভূর কাছে অংশ ও পূর্ণতার মিলন কামনা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র একটি দেশও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা বলেন নি এবং ককেসাস থেকে হিমালয় বলে সমগ্র হিন্দুস্থানসহ বিশ্বব্যাপীকে বুঝিয়েছেন। এ সবকিছুর জন্য দবীর নিজের কবিত্ব শক্তির উপরই বেশি নির্ভরশীলতা প্রকাশ করেছেন এবং নিজেকে সবচাইতে বেশি আত্মবিশ্বাসী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

কারবালার প্রান্তের শত্রু বাহিনীর বিপক্ষে ইমাম হোসাইন (রাঃ) যুদ্ধে বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছেন। বীরদর্পে মহানায়কের ন্যায় কারবালার যুদ্ধ ময়দানে তাঁর প্রবেশ, তরে বিভিন্ন রনকৌশল ও সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করেছেন। এ সকল বর্ণনা সুনিপুণভাবে স্থান পেয়েছে মির্যা সালামত আলী দবীরের কবিতায়। দবীরের নিজস্ব বর্ণনাটি তুলে ধরা হলো নিম্নক্ত কবিতাগুচ্ছের মধ্য দিয়ে–

کس شیر آمدہ ہے کہ رن کانپ رہا ہے

رن اک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے

رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے

خود عرش خداوند زمن کانپ رہا ہے

شمشیر بکف دیکھکر حیدری کی پسر کو

جبرئیل لرزتے ہیں سیمٹے ہوئے پر کو۔[৯]

(এ কোন সিংহের আগমন হয়েছে যে বনভূমি কম্পিত হচ্ছে ?

বনভূমি তো ছার, স্বয়ং প্রবীণ আকাশ কম্পিত হচ্ছে।

কাফনের তলে রুস্তমের প্রান কাঁপছে ,

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার আরশে আজিম কাঁপছে।

হায়দার তনয়ের হাতে তলোয়ার দেখে

স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল পাখা গুটিয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। )

Dhaka University Institutional Repository

হোসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরের যুদ্ধের ময়দানে যেভাবে অবতীর্ণ হন তা বিস্ময়ের। এ প্রসঙ্গে দবীর বলেন-

انگشت عطارت سے قلم چھوٹ پڑا ہے

پنجہ خورشید سے علم چھوٹ پڑا ہے۔[১০]

(শনিগ্রহের আংগুল থেকে কলাম ছুটে পড়ে.গেল

সূর্যের পাঞ্জা থেকে নিশান খসে পড়লো।)

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় বলা যায় যে, উদীয়মান কবি মীর্যা দবীরের মতো এতো সমৃদ্ধশালী অর্থেও সামঞ্জস্য, নতুন নতুন শব্দের ব্যবহার, কঠিন অথচ সরস ও পরিপুষ্ট ভাবোদ্দীপ্ত, বাস্তব কাহিন সমৃদ্ধ কাব্য চর্চা লাক্ষ্ণৌর আর কারো কাব্যে ঘটেনি, লাক্ষ্ণৌর আরো অনেক কবি সাহিত্যিক মরসিয়া কাব্য চর্চা করেছেন কিন্তু তাদের রচনা ও কাব্য দবীরের সূর্য-সদৃশ্য ঔজ্জ্বল্যের সামনে নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মরসিয়ার মধ্য দবীরের ন্যায় করুণ রস, বীর রস ও বাৎসল্যরস ও পণ্ডিত্য পূর্ণ বিষয় ছিল অনুপস্থিত। মোট কথা দবীরের মাধ্যমেই মরসিয়া কাব্য সকল দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্যসূত্রঃ

১। সাইয়্যেদ এজাজ হোসাইন, *তারিখে আদবে উর্দু*, পৃ: ১৭৪

২। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৩। অধ্যপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্রপাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫৩

৪। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫৩।

৫। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৫২।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৪৪

৭। মানির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ১৩৭

৮। প্রাগুক্ত , পৃ : ৫৪।

৯. প্রাগুক্ত , পৃ : ১৫৬

১০. প্রাগুক্ত , পৃ : ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

# হাকিম মোমেন খাঁন মোমেন

হাকিম মোমেন খাঁন মোমেন ছিলেন অত্যন্ত অভিজাত ও সভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তার পূর্বপুরষগণ ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসি। তিনি স্বাধীনচেতা ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। সাহিত্য বিষারদগণ মোমিনকে তাগায্যুলের বাদশাহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রেমের যাবতীয় উপাদান দিয়ে পরিবেষ্টিত যে গীতিকবিতা তৈরী হয় তাকেই তাগায্যুল বলা হয়। তিনি তাঁর কবিতায় প্রিয়ার দৈহিক সৌন্দের্যের বর্ণনা, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনভূড়ু, বিরহের যন্ত্রনা, প্রিয়ার বে-পরওয়া চলাফেরা ও উদাসীনতা, সব কিছুই চিত্রায়িত করেছেন মনের তুলি দিয়ে এবং সুসজ্জিত করেছেন আপন মহিমায় যা নিখুঁত ও অতুলনীয়।

হাকিম মোমেন খাঁন মোমিন হলেন দিল্লির ঐতিহ্য ও অভিজাত্যের প্রতীক, সে কারণেই শেষ অবধি দিল্লি তাঁর উচ্চ শির লাক্ষৌর সামনে তুলে ধরতে পেরেছে। তাঁর আসল নাম হাকিম মোমেন খাঁ কিন্তু তিনি মোমেন নামেই বেশি প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম হাকিম গোলাম নবী খাঁ, তাঁর দাদার নাম হাকিম নামদার খাঁ। তিনি বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বকালে কাশ্মীর হতে দিল্লিতে আগমন করেন এবং রাজ পরিবারের চিকিৎসক হিসাবে বেশ কয়েকটি গ্রাম জায়গীররূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। রাজকীয় এ সম্মানের কারণেই ইংরেজদের শাসনকালেও এ হাকিম পরিবার ও তাঁর বংশধরগণ সরকার হতে পেনশন পান। হাকিম মোমেন খাঁন মোমেনও এই সরকারী ভাতা বা পেনশনের সুযোগ লাভ করেন তাঁতে তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালোভাবেই কেটে যায়।

দিল্লির এ উজ্জ্বল নক্ষত্র মহান কবি হাকিম মোমেন খাঁন মোমেন দিল্লীতেই জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই মোমেনের মধ্যে কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি তিক্ষ্নবুদ্ধি ও প্রখর মেধা, স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বংশের ঐতিহ্যনুযায়ী তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে হাকীমি বা চিকিৎসা শাস্ত্রেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন যা সব মহলে দৃষ্টি আর্কষণ করে। কথিত আছে তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও যথেষ্ট পান্ডিত্য লাভ করেছিলেন। অনেক পন্ডিত পর্যন্ত তার ভবিষ্যৎ বাণীর ফলপ্রসূর কার্যকারিতা দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যান। মোমেন তাঁর নিজের মুত্যু তারিখ সমন্ধে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ৫দিন, ৫ মাস বা ৫ বৎসর পরে তাঁর মুত্যু হবে। ঠিক তার ভবিষ্যদানী অনুযায়ী ৫মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ ছাড়াও তিনি সৎরঞ্জ বা দাবা খেলায় ও বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। [১]

Dhaka University Institutional Repository

এত বৈচিত্র্যময় গুণের অধিকারী হওয়া সত্বেও মোমিন এর কোনটিকেই তিনি জীবিকারূপে গ্রহণ করেননি। বরং তিনি কাব্য চর্চার প্রতি গভীর মনোযোগ দেন এবং তাতেই বিশ্বব্যাপী সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি কারো অধীনে ধরাবাঁধা ও নিয়মতান্ত্রিক কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন না।

মোমেন ছিলেন বড় আমোদপ্রিয় ও হাস্য রসিক কবি মনস্ক। তাছাড়া তিনি সু-পুরুষ, অত্মপ্রত্যয়ী প্রাণচঞ্চল ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম জীবনে মোমেন শাহ নাসীরের কাছে কাব্যানুশীলন শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তীতে কাব্য লেখায় এমনই হাতজশ এসে গেল যে, কারো নিকট হতে আর এই বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

হাকীম মোমেন খাঁন নিজ দেশ ও জন্মভূমিকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ প্রয়োজনের তাগিদে ও বিভিন্ন কারণে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে দিল্লি হতে পাঁচবার বাহিরে গমন করে রামপুর, জাহাঙ্গীর নগর ও  সাহারানপুর প্রভৃতি এলাকায় সফর করেছেন। কিন্তু দিল্লির প্রতি তার এতোই প্রাণের টান ছিল যে, যতবারই তিনি দিল্লি ছেড়ে অন্যত্র গেছেন ততবারই তিনি খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে নিজ ভূমিতে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৪২ সালে মির্যা গালিব দিল্লি কলেজের ফারসী বিভাগের অধ্যাপকের পদ প্রত্যাখান করলে টমাস সাহেব উক্তপদের জন্য মোমিনকে অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রয়োজন ভেদে দিল্লির বাইরে যাওয়া লাগতে পারে এমন শর্তের কারণে মোমিনও উক্ত অধ্যাপকের পদকে প্রত্যাখান করলেন। দিল্লি কলেজের অধ্যাপকের বেতন ছিল মাত্র ৮০ টাকা। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি ৩৫০ টাকা মাসিক বেতনে কপুরহলের মহারাজা তার দরবারী সভাকবি  হিসেবে চাকুরীতে আহবান জানালেন, কিন্তু তিনি সে আহবানেও সাড়া দিলেন না এজন্য যে, মহারাজা এ বেতনেই একজন গায়ককে নিয়োগ দান করেছিলেন। একবার টোঙ্গার নবাব উজীরুদ্দৌলা বাহাদুর মোমিনকে তার উপদেষ্টা দেখতে চাইলেন, কিন্তু টোঙ্গা অতি নগন্য শহর বলে দিল্লির মতো অতি সমৃদ্ধ জাকজমক শহর ছেড়ে সেথায় যাইতে অস্বিকার করলেন। এসব ইতিহাস ও  কাহিনীর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মোমিন হলেন মির্যা আসাদুল্লা খাঁ গালিব এর মতোই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন  আত্ম সম্মানের অধিকারীও  স্বাধীনচেতা  এবং অল্প চাহিদা সম্পন্ন কবি ছিলেন।

মোমেন তাঁর কবিত্ব শক্তি ও নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ও সগৌরব ছিলেন। তাঁর  কাব্য শক্তির ব্যাপারে এতোই গৌরব ছিল যে, তাঁর সমসাময়িক উর্দু কবিদের তো কোন পাত্তাই দেননি, বরং বিশ্ব বিখ্যাত ফারসী কবিদেরকেও তিনি বিশেষ মর্যাদা দিতে নারাজ। বর্ণিত আছে বিখ্যাত ফারসী কবি শেখ সাদীর লিখিত গুলিস্তানকেও তিনি অতি সাধারণ গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। তার অন্যান্য কাব্যের মধ্যে "মোমেন" তারীখ' লিখেই বিশেষ সম্মানী ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। [২]

*Dhaka University Institutional Repository*

মোমিন গযল, কাসীদা, মসনবীসহ কাব্যের সকল শাখাতেই অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি উর্দু কাসিদা রচয়িতাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মসনবী রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অবাধ বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। এ ক্ষেত্রে তাকে প্রখ্যাত মাসনবী রচয়িতা দয়া শংকর নাসিম এবং নওয়াব মির্যা শাওক এর সমতুল্য বলে মনে করা যেতে পারে। তবে মোমিনের বিশেষ সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে তাগায্যুলে, তাকে তাগায্যুলের বাদশা বলা হয়। গযল বা প্রেমকাব্য রচনাকারী হিসাবে তিনি উর্দু সাহিত্যকে এমনভাবে সজ্জিত করেছেন যা প্রেমকাব্য ও কবিতার অন্যান্য বিভাগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সুস্পষ্ট ব্যবধান তুলে ধরেছেন। উর্দু ভাষায় তাঁর গযলকে প্রেম চর্চার রঙ্গরস, প্রস্ফুটিত কটাক্ষ ও সুক্ষ্ম ইঙ্গিতের আদর্শ মুখপাত্র বলা যায়।

হাকিম মোমেন খাঁন উর্দু ও ফার্সী দু'ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর উর্দু ভাষায় লিখিত কাব্যের নাম হলো কুল্লিয়াত-এ উর্দু। ইহাতে তিনি গযল, কাসীদা, রুবাঈ, মসনবী কিত'আ, তারজি, বনদ ইত্যাদি সন্নিবিশিত করেছেন। তিনি ফার্সী কবিতাগুলোকে যেখানে স্থান দিয়েছেন তার নাম হলো দীওয়ান-এ-ফারসি। এতে আছে ৬টি কাসিদা, ১১৫টি গযল, ৮৫টি কিতআ এবং ১৭১টি রুবাঈ।

মূলত চিন্তার সূক্ষতা ও কল্পনার ঊর্ধ্ব-উড্ডয়ন মোমেনের কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও তার কবিতায় যেমন আছে শব্দের লালিত্য, তেমনি আছে গভীর ভাবের সমাবেশ। সামঞ্জস্য অলঙ্কারাদির ব্যবহারও প্রচুর দেখা যায় মোমেনের কবিতায়। তার কবিতায় রূপক ও উপমা প্রয়োগ বিদগ্ধজনেরই বোধগম্য ছিল। মোমিনের লেখা জন সাধারণের জন্য নয়। তিনি কবিদের কবি ও উস্তাদদের উস্তাদ ছিলেন। মোমিন উর্দু সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবিই শুধু ছিলেন না, তিনি যেমন সমসাময়িক সকল কবির নিকট হতে সুখ্যতি লাভ করেছেন। তেমনি তার অগণিত শিষ্যবর্গ হতে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে 'গুলশানে বেখার' নামক তযকিবার' রচয়িতা নবাব মোস্তফা খান শেফতা, মীর হুসাইন তাসকীন, সৈয়দ গোলাম আলী ওয়াহশত, নবাব আসগর আলী খান নসীম কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৫২ সালে এমহান কবি হাকিম মোমেন খাঁন মোমিন নিজ গৃহের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মোমিনের কবিতার কিছু নমুনা নিম্নরূপ-

بن ترے اے شعلہ رو آتشکدہ تن ہو گیا

شمع قد پر میرے پروانہ برھمن ہو گیا

Dhaka University Institutional Repository

بسکہ میں سارے برس روتا رہا غم میں ترے

چیٹھا ور بیساکھ کا بھی چاند ساون وہ گیا

آخر اشکوں کے بھر آنے نے ڈبویا ہے مجھے

چشم کا سوراخ تو کشتی کا روزن ہو گیا۔[৩]

(হে অগ্নিশিখা রূপিনী, তুমি কোন বলে

এই অগ্ন্যোপাসন-গৃহনিছক তনুতে রূপায়িত হয়েছে।

তোমার ঈশ্বদীপ অংগ ডহরে আমার পতংগ ব্রাহ্মণ হয়ে আরতি করছে।

আমিতো সারাবছর তোমার বিরহে কান্না করছি,

জ্যেষ্ঠ ও বৈশাখ মাসও শ্রাবণ মাসে পরিবর্তিত হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অশ্রুই আমাকে নিমজ্জিত করলো,

চোখের ডয়দ্র-পথ নৌকার উম্মুক্ত বাতায়নের অনুরূপ হয়েছে।)

হাকিম মোমেন খাঁ মোমেন অন্যত্র বলেছেন ঃ-

تاش کا ہمدم کفن لانا کہ بسل میں مر گیا

چلونوں سے چلوئہ خورشید سیما دیکھکر

یاد آیا سوئے دشمن اسکا جانا گرم گرم

پانی پانی ہو گیا میں موج دریا دیکھکر۔[৪]

(হে আমার বন্ধু, কাফন নিয়ে এসো, জাফরি পথে সূর্যের

ললাট দেখে আমি  মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছি।

*Dhaka University Institutional Repository*

শত্রুর দিকে আবেগতপ্ত গতিতে তার এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য মনে পড়লো,

নদীবক্ষের উর্মিমালা দেখে আমি লজ্জায় অভিভূত হয়ে গেলাম।)

চিন্তার দুরূহ সুক্ষ্মতা ও কল্পনার উর্ধ্বগামিতার জন্য মোমেন জনসাধারণের প্রিয়কবি হতে পারেননি। উপরের উদাহরণ দু'টি তার বাস্তব প্রমাণ। তিনি যে অত্যন্ত মুক্তমনের অধিকারী ছিলেন তাও তার আচরণের মাধ্যমে বুঝা যায়। আর এ কারণেই তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্যের ঝলক পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এ পন্ডিত্যপূর্ণ কাব্য চর্চা দিল্লির ইতিহাস এতিহ্য ও অভিজাত্যকে বিশ্বদরবারে বিশেষ করে লাক্ষ্ণৌর কাছে শির উঁচু করে তুলে ধরার প্রয়াস পায়।

মোমেন হলেন প্রেমময়ী রসিক কবি। প্রেমের সকল বাক্যলাপ ও অঙ্গসজ্জায় তার উর্দু গযল সজ্জিত হয়েছে। তিনি ওয়ালী, মীর ও গালিবের চেয়ে ব্যাপকভাবে প্রেমকে স্থান দিয়েছেন তাঁর কবিতায় এবং সমৃদ্ধ করেছেন উর্দু গযলকে। প্রেমের কোন উপাদানই বাদ পড়েনি তাঁর কবিতা থেকে। তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন বিচক্ষণতার সাথে। পাশাপাশি প্রিয়াকে না পাওয়ার আশংকাও ব্যক্ত করেছেন। প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে কবির বক্তব্য হলো-

ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا

جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں۔[৫]

(বন্ধুত্বের পরে তাকিওনা আর শত্রুর পানে

কেননা জাদুতে ভরা তোমার ডাগর চক্ষুদুটি।)

মোমেন তাঁর প্রিয়ার বে-পরওয়া চলাফেরা এ খামখেয়ালিকেও নিখুঁতভাবে অংকন করেছেন তার উর্দু কবিতায় যেমন প্রেমিকার উদাসীনতা, নির্দয় ব্যবহার, কথা দিয়ে কথার না রাখা ইত্যাদি। প্রিয়ার এরূপ ব্যবহারে কবি খুবই আহত। কবি কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রিয়াকে বারবার তার ওয়াদা রক্ষার কথা স্মরণ করে দিয়েছেন। এ কথাগুলি কবি যেভাবে তুলে ধরেছেন তার কবিতায়–

وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔

Dhaka University Institutional Repository

کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی۔

کبھی ہم بھی تم بھی تھے ہے آشناں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔[৬]

(তোমার আমার মাঝে ছিল, কভু শান্তির অনুভূতি তবমনে আছে কিনা আছে

সেই কথা দেওয়া, সেই পণ পূর্ণ করিবার স্মৃতি তবমনে আছে কিনা আছে।

তোমাতে আমাতে কভু ছিল প্রীতি, তোমাতে আমাতে কভু ছিল একই চিন্তার পথ।

তোমাতে আমাতে কভু ছিল পরিচিতি, তবমনে আছে কিনা আছে।)

মোমেনের কাব্যচর্চা ছিল মির্যা গালিবের মতই একদম স্বতন্ত্র ও আলাদা ধাঁচে। অতি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র ও সাধারণ বক্তব্যকে এমন ঢংয়ে তিনি বর্ণনা করতেন যা তার বর্ণনাশৈলির কারণে অনেক দামী মনে হতো, পাঠকের কাছেও তা নতুন বলে বোধগম্য হতো। এমনি একটি বিখ্যাত কবিতা হলো-

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا

جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا[৭]

(তুমি আমার পাশে থাকো

যখন আর কেউ থাকে না।)

নতুন নতুন অর্থবোধক শব্দ চয়ন এবং তার সুন্দর গাঁথুনি মোমেনের কাব্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেক গবেষণা করে কবিতার বহর নির্বাচন করতেন। যার কারণে তার কবিতাসমূহ সুললিত কণ্ঠে পঠিত হত।

এ ব্যাপরে কবির বর্ণনাভঙ্গি হলো-

کسی کا ہوا آج، کل تھا کسی کا

نہ ہے تو کسی نہ ہو گا کسی کا

کیا تم نے قتل جہاں ایک نظر میں

کسی نے نہ دیکھا تماشا کسی کا[৮]

(আজতুমি কার হয়েছো কাল ছিলে কার

না তুমি কারোর ছিলে না তুমি হয়ে কারোর

করেছ জগৎকে ধ্বংস এক পলকে

কেউ দেখেনি তামাশা কারোর।)

মোমেনের গযলের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, তিনি এ ব্যাপারেও বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। তিনি কখনো প্রিয়ার আচরণে আঘাত পেয়ে তাকে বিদ্রুপ করেছেন আবার কখনো তিনি নিজেকেও ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর বিদ্রুপাত্মক কবিতাগুলো সুক্ষ্মচিন্তা এবং উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। কবি তাঁর প্রিয়াকে বিদ্রুপ করে বলেছে-

کیا سنانا ہو کہ ہے ہجر میں جینا مشکل

تم سے بے رحم ہے مرنے سے تو آساں ہو گیا[৯]

(কি শুনালে ! বিরহে বেঁচে থাকা তো কঠিন

তোমার মতো নির্দয়ার জন্যে বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।)

কবি মাঝে মাঝে নিজেই নিজেকে বিদ্রুপ করেছেন। যা ধরা পড়েছে তাঁর উর্দু কবিতায়-

عمر ساری تو کی عشق بتاں میں مومنؔ

آخری وقت میں کیا خاک مسلماں ہونگے۔[১০]

(মুমিন সারা জীবন প্রেমেই কাটিয়ে দিলে

শেষ জীবনে কি ছাই মুসলামন হবে?)

মোমেন তার কবিতায় দেশী শব্দের পাশাপাশি অসংখ্য ফারসী বাক্যশৈলীরও ব্যবহার করেছেন। সমকালীন কবিদের মধ্যে মোমিন এবং গালিবের কবিতার মধ্যেই বিদেশি শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারা আসলে কবিতায় শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে বিখ্যাত কবি উরফী এবং বেদিলের পদাংককেই অনুসরণ করেছেন। মোমিনের ফারসি

*Dhaka University Institutional Repository*

বাক্যশৈলির  মধ্যে রয়েছে সজিবতা, সুক্ষ্মতা এবং রসময়তা পাঠককুল সহজেই তার রস আচ্ছাদনে সক্ষম হবেন।

## তথ্যসূত্র

১. অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ১৬৮

৪। মানির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ১৭১

২। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ১৬৯

৩। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃঃ ১৭০

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭১

৫. সম্বল নিগার, *উর্দু শায়েরী কা তানকীদী মুতালিআ*, ইডুকেশনালা বুক হাউস, আলী গড় ১৯৯৫, পৃঃ ৫৮

৬. প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫

৭. ওয়াকার আজিম (সম্পাদান), *ইনতেখাবে-এ- মুমিন উর্দু একাডেমি*, করাচি, জুনয়ারি, ১৯৫০, পৃ : ৬৩।

৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

৯। প্রফেসর আসাদুল হক শারদায়ী, *নয়ী আওর পুরানী শামা*, দি প্রিন্টিং লাইন, পাটনা, ১৯৯৬, পৃ ঃ ৬৪

১০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

# শেখ গোলাম হামদানী মুসহাফী

"মুসহাফী তাঁর সময়ের উর্দু সাহিত্যের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি খুবই কোমল হৃদয়ের অধিকারী, চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বড় মাপের একজন বিদগ্ধ কবি হওয়া সত্ত্বেও সকল শ্রেণির মানুষের সাথে বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র আচরণে অভ্যস্থ ছিলেন। মুসহাফী দিল্লির কবি হলেও লাক্ষ্ণৌর সংস্কৃতি চর্চা করেছেন বেশিরভাগ সময়। তার মাধ্যমেই লাক্ষ্ণৌর রীতি-নীতির লক্ষণগুলির প্রকাশ ঘটে।

মুসহাফীর আসল নাম হলো গোলাম হামদানী, আর মুসহাফী হলো তাঁর উপাধি বা কাব্যিক নাম। তাঁর পিতার নাম শেখ ওলী মুহাম্মদ। তিনি মুরাদাবাদ জেলার আমরোহার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিতগণের মতে মুসহাফী ১১৯০ হিজরিতে (১৭৭৬ সালে) দিল্লি গমন করেন। যৌবনকালেই অতি অল্প বয়সেই কাব্যচর্চায় সিদ্ধহস্ত হন। খুব দ্রুতই তাঁর কাব্যিক সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পরে এবং তার পান্ডিত্যের বহি:প্রকাশ ঘটে। দিল্লিতে থাকাকালীন তাঁর নিজ বাসগৃহে মুশায়েরার আসর বসত এবং এ আসরে তাঁরই প্রতিদ্বন্দী ইনশা, জুরআত, ও মীর হাসান সহ আরো অনেক নাম-দামী কবিগণ অংশগ্রহণ করতেন। খুবই ভালো সময় অতিবাহিত করছিলেন তিনি, কিন্তু দিল্লির বিপর্যয় শুরু হলে নওয়াব আসাফুদ্দৌলার শাসনামলে অসংখ্য নামী ও বিখ্যাত কবিগণ লাক্ষ্ণৌতে হিজরত করেন, তাদের ন্যায় শেখ গোলাম হামদানী মুসহাফীও ১৭৮৮ সালে লাক্ষ্ণৌ হিজরত করেন, এবং বাদশাহ শাহ আলমের পুত্র শাহজাদা সুলায়মান শুকুহের দরবারে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করলেন, শাহজাদা সুলায়মান শুকুহ তাকে অনেক সম্মান ও সমাদর করলেন, শাহজাদা তার কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে কবিগুরু হিসাবে গ্রহণ করলেন। মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন আজাদের মতে মুসহাফী ১২৪৮ হিজরিতে ১৮১৪ সালে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। [১]

মুসহফী তুখর মেধার অধিকারী একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আর পাণ্ডিত্য হিসাবে মুসহাফী সব মহলে স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি অর্জন করলেও চটুল স্বভাব ইনশাই শেষ পর্যন্ত শাহজাদা সুলায়মানকে অধিক মুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীকালে ইনশা তার দরবারী কবি হিসাবে মুসহফী হতে বেশি শ্রদ্ধা লাভ করেন।

মুসহফী ফার্সী ও উর্দু উভয় ভাষাতে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন এবং উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন। আরবী ভাষাতেও তাঁর প্রচুর দক্ষতা ছিল। বর্তমান আধুনিক কালে মুসহফীর একটি মাত্র ফার্সী দেওয়ানের উপস্থিত দেখা গেলেও আসলে তিনি ৪টি ফার্সী দেওয়ান লিখেছেন, কিন্তু এর তিনটিই ফার্সী কবিদের ও অন্যটি উর্দু

Dhaka University Institutional Repository

কবিদের জীবনীসংগ্রহ। মুসহাফী বিশেষ করে সুখ্যাতি লাভ করেছেন তাঁর উল্লিখিত উর্দু সাহিত্যিকদের জীবনীসংগ্রহ ও তাঁর বিখ্যাত সরস ও চিত্তাকর্ষক গজল সম্বলিত ৮টি দেওয়ান রচনা করার জন্য। তিনি গজল ছাড়াও আরো অনেক কবিতা যেমন- কাসিদা, কিত্আ প্রভৃতি রচনা করেছেন। মুসহফী বাদশা শাহ আলম পর্যন্ত ভারতীয় বাদশাহদের একটি শাহনামাও রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার সুখ্যাতি মুলত তাঁর উর্দু গজলের জন্য। [২]

কবি মুসহফীর যুগশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ হলো তিনি উর্দু সাহিত্যের কাব্যধারায় এমন সুনাম অর্জন করেছিলেন যে সে সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য জ্ঞান পিপাসু তরুণেরা তার দারসে এসে ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন এবং তার দারসে অংশগ্রহণ করে শিষ্য হওয়ার সুযোগ পাওয়ার কারণে তারা নিজেদেরকে ধন্য মনে করতেন অথচ তারাও সে যুগের উর্দু সাহিত্য ও কাব্য জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে গন্য ছিলেন। এমন যুগ শ্রেষ্ঠ উস্তাদগণ মুসহফীর শাগরেদ হওয়ার কারণেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সাধারণ মানুষের ধারনণা ছিল তাঁর শাগরেদরা যদি এতো উচ্চমানের যুগ শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হন, না জানি তাহলে তিনি (মুসহাফী) কত বড় মাপের জ্ঞানী, বিদগ্ধ, বিচক্ষণ ও পণ্ডিত। ঐতিহাসিকগণ বলেন, আমরা দেখতে পাই যে, ১৭৮১ সালে রচিত মীর হাসানের তজকিরার মধ্যেও মুসহাফীর নাম বেশ শ্রদ্ধার সাথেই সন্নিবেশিত হয়েছে। এতএব, বুঝা গেলো বিভিন্ন কারণেই মুসহাফী প্রসিদ্ধি চোখে পড়ার মতো ছিল। তাঁর শাগরেদদের মধ্যে আতিশ, খলীল, জমীল ও আসীর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। [৩]

মুসহফী উর্দু ভাষাও সাহিত্যের অনেক বড় মাপের একজন গজল কবি ছিলেন। সমালোচকগণ বলেন যে, কবিতা রচনায় মুসহফীর দক্ষতা ছিলো অপরিসীম। তিনি দ্রুত ও সহজে দ্বিধাহীন চিত্তে কবিতা লিখতে পারতেন। লোকেরা তখন তাকে দেখলে মনে করতো যে, তিনি কোন উস্তাদের কোন লেখা কবিতা নির্দ্বিধায় মুখস্ত করে নকল করে যাচ্ছেন। শিল্পকর্ম ও কবিতা রচনায় যে নিয়ম নীতি, মনোযোগ ও পরিশ্রম অত্যাবশ্যক মুসহফী সেগুলী কিছুই মানতেন না, স্বতঃস্ফুর্ততার উপরই মূলতঃ তিনি নির্ভর করতেন। কবিতা রচনায় তাঁর নিজস্ব কোন রং ঢং ছিলনা, তাঁর কবিতা রচনায় সামঞ্জস্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দু'একটি পংক্তিতে উচ্চমানের ধারা বজায় রাখতে পারলেও পরবর্তীতে পংক্তিগুলোতে সে মান ধরে রাখতে পারতেন না। তিনি কাব্য চর্চায় মূলত মীর সুজের পদাংঙ্ক অনুসরণ, কখনো মীর তাকীর আনুগত্য করতেন আবার কখনো মীর সৌদার রূপ ও ঢং অনুসরণ করে কবিতা রচনা করতেন। [৪]

সহজেও দ্রুত কবিতা লেখার কারণে তাঁর রচনায় কাব্য ভান্ডার ভরপুর ছিল। তিনি বিভিন্ন ধরনের শাখা উপশাখায় কাব্য রচনা করেছেন। তিনি অতি অভাব অনটনের কারণে বিভিন্ন সময়ে টাকার বিনিময়ে অনেক কবিতা বিক্রয় করেছেন, এবং যারা ক্রয় করেছেন তারা সে গুলীকে নিজেদের লিখিত কবিতা বলে চালিয়ে দিতেন। এ ব্যাপারে মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আজাদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

Dhaka University Institutional Repository

محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ تنگ دستی سے مجبور ہو کر مصحفیؔ اپنے اشعار فروخت بھی کرتے تھے ۔ جس کو لوگ اپنے نام سے شاعروں میں پڑھتے تھے۔ اور گمان یہ ہے کہ آزاد کا یہ بیان غلط نہ ہو گا ۔تصور کیجے کہ مصحفی کا کل کلام کتنا زیادہ ہو گا کہ ان گنت منتخب اشعار فروخت ہوجانے کے بعد بھی ان کے کلام کا اتنا ذخیرہ موجود ہے ۔کہ صدیوں کانام زندہ رکھنے کو کافی ہے۔[৫]

(অভাবের কারণে অরপারগ হয়ে মুসহাফী নিজের কবিতা সমূহ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছেন। যাকে লোকেরা নিজেদেও নামে কাব্য জগতে চালিয়ে দিতেন। আর এ ধারণাটা মিথ্যে হবেনা যে, যদি মুসহাফীর কাব্য নিয়ে চিন্তা করা যায় যে, তিনি কত বেশি কবিতা লিখেছেন, যে তিনি যা বিক্রি করেছেন সেগুলী ছাড়া বাকী কবিতাগুলি যদি একত্র করা যায় তাহলে তা এতো বড় যখিরা হবে যে তা শত বছর পর্যন্ত তাঁর পরিচয় বহন করবে। অন্যত্র আছে যদি তাঁর কাব্যসমূহ একত্র করা যায় তাহলে তা গালিবের মতোই এক বিশাল দিওয়ান হবে।)

মুসহফী খুবই উচ্চ মানসম্মত কাসিদা রচনা করতেন, তাতে উন্নতমানের শব্দাবলী চয়ন করে অভিনব সাজে সুসজ্জিত করতেন। তার কাসিদার একটি উদাহরণ নিম্নরূপঃ-

ان لوگوں کی مجلس میں یہ شور نہیں

بزم شعرا ہے مرغوں کا بالی ہے۔

کیا چمک اب فقط پرے نالے کی شاعری

اس عہد میں ہے تیغ کی بھالے کی شاعری[৬]

( এদের মজলিসে যে উম্মাদনা ছিল তার তুলনা দেখিনি,

একি কবিদের আসর, না মোরগের লড়াইয়ের আখড়া!

এ যুগের কবিত্ব তো তলোয়ার ও বর্শার চমক

আমার বেদনাময় কবিত্ব এখানে কি সমাদর পাবে?)

মুসহফীর বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে শাহজাদা সুলায়মান শুকুহ তাকে উস্তাদ হিসাবে মান্য করেন, কিন্ত চটুল ও চুর ইনশাআল্লা খাঁ যখন শাহজাদার দরবারে গৃহীত হন তিনি তার কৌতুকপূর্ণ ও রসালো বাক্যালাপের মাধ্যমে শাহজাদার মন জয় করে ফেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাদাও তখন মুসহাফীর চেয়ে ইনশাআল্লাহকে বেশি শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। আর তখন থেকেই মুসহাফীর সঙ্গে ইনশার মনোমালিন্য দেখা দেয়।

মুসহফী ও ইনশার সময়কার তর্কযুদ্ধ বেশ চিত্তাকর্ষক। এটিও উর্দু সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাদের তর্কযুদ্ধ আসলে ভিন্ন পথাবলম্বী তথা প্রাচীন ধারার বাহক ও আধুনিক মতবাদীদের মধ্যে সাহিত্যিক তর্ক ও বিতণ্ডা। এই তর্ক যুদ্ধে স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী আধুনিক মতবাদীদের ধারক ইনশাআল্লাহ খাঁরই শেষ পর্যন্ত বিজয় হলেও মুসহাফী বিদ্ধান ব্যক্তিদের নিকট কখনও হেয় প্রতিপন্ন হন নাই।

বস্তুত এই-তর্ক যুদ্ধ মুসহাফীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল বলেই মুসহাফী শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেন নাই। তবে এসব বাক বিতন্ডার মাধ্যমেই মুসহাফীর অনেক কৌতুকপূর্ণ কবিতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া মুসহাফী ছিলেন শান্ত ও গুরুগম্ভির চিত্তের মানুষ।

মুসহাফী শাহজাদা সুলায়মান শুকুহর দরবারে একটি গজল লেখলেন যার শেষ পংক্তিটি ছিলো নিম্নরূপ-

تھا مصحفی یہ مائل گریہ کہ پس از مرگ

تھی اسکی دھری چشم پہ تابوت میں انگلی۔[৭]

(মুসহফী এইরূপ বিষন্ন-হৃদয় হলেন যে, তার মৃত্যর

পর পর্যন্ত কফিনে তাঁর অঙ্গুলী চক্ষের উপর নিবন্ধ ছিল)

আর ইনশার অনুসারিগন এই কবিতাাকে বিকৃত করে গাইলেন-

تھا مشفی کانا جو چھپانے کو پس از مرگ

روکھے ہوئے تھا آنکھ پہ تابوت میں انگل[৮]

এ রকম বিকৃতি পংক্তিটি যখন সাধারণের নিকট প্রচারিত হলো জনসাধারণ এই ব্যঙ্গোক্তিতে বেশ আনন্দ উপভোগ করলেন। মুসহাফী তখন বিষন্ন হৃদয় গাহিয়ে উঠলেন-

مدت سے ہوں میں سرخرش صہبائی شاعری

ناداں ہے جس کو مجھ سے ہے دعائے شاعری

Dhaka University Institutional Repository

میں لکھنؤ میں زمزمہ سنجان شعر گو

برسوں دکھا چکا ہوں تماشا شاعری

پھٹتا نہیں ہے بزم امیران دھر میں

شاعر کو میرے سامنے غوگائے شاعری

ایک طرفہ خر سے کام پڑا ہے، مجھ سے کہ ھائے

سمجھے ہے آپ کو وہ مسیحائے شاعری۔[৯]

(বহুদিন যাবৎ আমি কবিত্বের মদ পান করে মত্ত হয়েছি,
যে আমার চেয়ে অধিক কবিত্বের বড়াই করে সে তো মূর্খ।

আমি লাক্ষ্ণৌ শহরে অনেকদিন
স্বর্গীয় স্রোত প্রবাহিত করে
কাব্যের রঙ্গীন ছটা দেখে এসেছি।

এই পৃথিবীর রাজন্যবর্গের দরবারে
এই কবিত্বের চটক কোন রূপেই
কাব্য হিসাবে সমর্থিত হবে না।

এক গাধার দল নিয়া আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি
তারা মনে করে যে তারা যেন কবিত্বের

Dhaka University Institutional Repository

অবতার হয়ে  অবর্তীর্ণ হয়েছে।)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, কখনো কখনো মুসহাফী ও ইনশার শিষ্যগণ শোভাযাত্রা করে কবিদ্বয়ের বিদ্রুপাত্মক কবিতাগুলী আবৃত্তি করতো। কিন্তু কখনো এসব পারস্পরিক উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্যে বাগ্মিতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়, এ সম্পর্কে নিম্নে এ ইনশার একটি কবিতা প্রদত্ত হলো–

تم جو کہتے ہو مجھے تم نے بہت رسوا کیا؟

کیا گنہ، کیا جرم، کیا تقصیر میں نے کیا کیا؟

واسطہ، باعث، سبب، موجب، جہت کچھ بات تھی

راز وہ کمبخت کیا تھا، میں نے جسے افشا کیا؟

کیا کہا؟ کس نے کہا، کس سے کہا، کب، کس گھڑی

کس جگہ کس وقت کس دم، آپ کا چرچا کیا؟

کچھ پتہ بھی، نام اس کا، شکل کیسی وضع کیا

جس کسی نے آن کر من کو راس ڈھب کا کیا

گبر ہے وہ، یا مسلماں یا نصاری یا یہود

اس طرح کا تذکرہ جس شخص نے میرا کیا

شیخ ہے وہ، یا مغل ہے، یا کہ سید یا پٹھان

موچھ ڈاڑھی ہے کہ مولا نے اسے کھونسا کیا؟

ہے جواں سا یا وہ امرد، یا کہ بوڑھا، یا ادھیر

مرد ہے یا حق تعالی نے اسے خنثی کیا۔[১০]

Dhaka University Institutional Repository

(তুমি যে বল, তুমি আমাকে বড় অপমান করেছ,

কিন্তু সত্যি বলতো, আমি কি পাপ, কি অত্যাচার, কি ভুল করেছি?

সম্পর্ক করেন, অভিপ্রায় এসবের কোনটি সেখানে ছিল?

কি সেই গোপন তথ্য যা আমি প্রকাশ করে ফেলেছি?

কি বলেছে? কে বলেছ? কখন বলেছে কোন মুহূর্তে বলেছে?

কোথায় কোন উপলক্ষ্যে আপনার সম্পর্কে আমি বলেছি?

বলুন তো তার ঠিকানা কি? নাম কি তার? দেখতে কেমন?

যে এমন করে এই কাহিনী প্লাবিত করলো,

সে কি অগ্নিপূজক, না মুসলমান, না খ্রিস্টান, না ইয়াহুদী,

আমার সম্পর্কে এমন কথা যে বললো সে লোকটি কে?

সে কি শেখ না মোগল, না সৈয়দ, না পাঠান,

তার কি দাঁড়ি গোফ আছে, না আল্লাহ তাকে মার্কুন্দা বানাইছে,

সে কি যুবক না কিশোর, না বৃদ্ধ, না অর্ধ বয়সী,

বিশ্বপ্রভু কি তাকে পুরুষ করেছেন না নপুংষক রূপে জন্মেছে।)

মুসহাফীকে ইনশার বিদ্রুপের উত্তর দিতে হতো। হাঁসির উদ্রেককারী কবিতা তাকে সে জন্যেই লিখতে হয়েছে। তাঁর রচনায় মৌলিকত্ব না থাকলেও উর্দু ভাষার সাহিত্য সম্ভারে তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ–

مئے پی اس چمن میں کون اٹھ گیا ہے جو ہے

انگرائوں عالم پھولوں کی ڈالیوں پر۔[১১]

(ফুলবনের চত্তর থেকে কে

সুরা পান করে চলে গেলো?

সবে যে ডালের উপরে গোলাপ

দলের ঘুম ভাংতে শুরু করছে। )

Dhaka University Institutional Repository

دیکھ شیشہ عاشق و معشوق کا ورق

گویا مقابلہ ہے خزاو بہار کا۔[১২]

(প্রেমিক প্রেমিকার ছবির পট পত্যক্ষ কর,

যেন পত্রঝরা হেমন্ত ও বসন্তকাল মুখোমুখি।)

شاھد رہی وہ تو آئے شب ہجر

چھپکی نہیں انکھ مصحفی کی۔[১৩]

(হে বিচ্ছেদের রাত্রি তুমি সাক্ষ্য থাকো,

মুসহাফীর চোখের পাতা আজ

পলকের জন্যও মুদিত হয়নি। )

মুসহাফী তার যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তিনি সাদামনের মানুষ ছিলেন। তিনি ব্যবহারে সুমিষ্টভাষি ও বিনম্র ছিলেন। তাঁর সুখ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে যায়। উর্দু ভাষার সকল দিকেই তিনি কবিতা চর্চা করেন। তিনি লাক্ষ্ণৌ দরবারের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি লাক্ষ্ণৌর দরবারি কবি হলেও মূলত দিল্লির কাব্য ধারাই মনেপ্রাণে জাগ্রত থাকতো। লাক্ষ্ণৌর বেহায়াপনাকে তিনি দূরে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। তিনি প্রাচীন কাব্যধারার অনুসারী ছিলেন। তিনি উর্দু কাব্যে এতোই নামকরা কবি ছিলেন যে, প্রফেসর ইহতেশাম হোসাইন তাকে উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাকে গণনা করতেন। তিনি উর্দু ভাষার উন্নতিকল্পেও অসামান্য অবদান রাখেন।

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্যসূত্র

১। সৈয়দ এজাজ হোসইন, *তারিখে আদবে উর্দু*, পৃ: ১২১

২। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১১৯।

৩। প্রাগুক্তা, পৃ : ১১৯

৪। সৈয়দ এজাজ হোসইন, *তারিখে আদবে উর্দু*, পৃ: ১২১

৫। প্রফেসর নূরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*, ইডুকেশনাল বুক হাউস আলীগড়, ২০০৪, পৃ: ১১১

৬। মানির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১১০।

৭। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১২০

৮। প্রাগুক্তা, পৃ : ১২০।

৯। প্রাগুক্তা, পৃ : ১২২।

১০। মনির উদ্দিন ইউসুফ, উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১১৪।

১১। প্রাগুক্তা, পৃ : ১১৬।

১২। প্রাগুক্তা, পৃ : ১১৭।

১৩। প্রাগুক্তা, পৃ : ১১৭।

.

Dhaka University Institutional Repository

# ইনশাআল্লাহ্ খাঁ

সৈয়দ ইনশাআল্লাহ্ খাঁ একজন আধুনিক ও সব্যসাচী উর্দু কবি ছিলেন। তিনি প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, হাঁস্যরস ও কৌতুক প্রিয়, অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর বাকপটুতা, কৌতুকময়ী গল্পের ও রসালো বক্তব্যের কারণে তিনি সবার কাছে একজন প্রিয় মানুষ হিসাবে অধিক সমাদৃত ছিলেন। ইনশার বিচক্ষণতা, বিদগ্ধ কথাবার্তা ও রসালো বাক্যলাপের কারণে শাহজাদা সুলায়মান শুকোহ মুগ্ধ হন, এবং পরবর্তী শাহজাদার দরবারে কবি মুসহাফীর চেয়ে তিনিই বেশি প্রাধান্য পান ও রাজদরবারের বিজ্ঞ কবি হিসেবে নিয়োগ পান। ইনশাআল্লাহ্ খাঁ আসলে দিল্লির কবি হলেও তিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় লাক্ষ্ণৌর দরবারী কবি হিসাবে কাটিয়ে দেন। কারণ দিল্লির রাজতখ্তের পতনের পর অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদের মতো তিনিও দিল্লি ছেড়ে লাক্ষ্ণৌর বাদশাহ ও রাজদরবার অলংকৃত করেন এবং নিজ দক্ষতা ও বিচক্ষনতার কারণেই সকল রাজ দরবারসহ সর্ব মহলে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আসিন হন।

ইনশার প্রকৃত ও পুরো নাম সৈয়দ ইনশাআল্লাহ খাঁন, কিন্তু কাব্যিক উপাধি হলো ইনশা, এ নামেই তিনি বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হাকিম মীর মাশাআল্লা খান। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল নজফ, সেখান থেকে দিল্লিতে এসে বসতি স্থাপন করে। দিল্লিতে এসে তাঁর পিতা নিজের যোগ্যতা বলে রাজদরবারের কবিরাজ বা শাহী-ত্ববীব পদে নিয়োগ পান। কারণ তাদের বংশ কবিরাজি পেশায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। এ কারণে মোঘল সম্রাজ্য পর্যন্ত বংশানুক্রমভাবে তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইনশার পিতাও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাঁর কাব্যিক নাম ছিল 'মাসদার'। দিল্লি রাজতখ্ত পতন হলে তিনি দিল্লি ছেড়ে বাংলার তৎকালিন রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলে আসেন এবং এই মুর্শিদাবাদেই কবি ইনশাআল্লা খাঁর জন্ম হয়। এ মহান কবিবর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার কাছে গ্রহণ করেন। কবি প্রতিভা ইনশার জন্মগত ও বংশানুক্রমে ছিল। এ কারণেই তিনি খুব শীঘ্রই একজন প্রতিভাবান কবিরূপে সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হন। [১]

ইনশার কাব্যপ্রতিভার যে বর্ণনা আবে-হায়াতে পাওয়া যায় তা এক অপূর্ব সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ। আবে হায়াতের বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

جب یہ ہونہار نونہال تعلیم کے چمن سے نکلا ریشہ میں کونپل پتے پھول پھل کی قوائے مختلفہ موجود تھین ۔ اس طرح کہ جس سر زمین پر لگے وہی کی آب و ہوا بموجب بہار دکھلانے لگے ۔ ایسا طباع اور عالی دماغ آدمی ہندوستان میں کم پیدا ہو ہو گا ۔ وہ اگر علوم میں سے کسی ایک فن کی طرف متوجہ ہوتے تو سدھا سال تک وحید عصر گنے جاتے ۔ انہیں نے کسی سے اصلاح نہیں لی۔ والد کو ابتدا میں کلام دکھایا۔ حق یہ ہے کہ شعر شاعری کا کوچہ جہاں سے نرالا ہے۔ [২]

*Dhaka University Institutional Repository*

(যখন প্রতিভাসম্পন সেই নব চারাগাছটি শিক্ষা-উদ্যান হতে বের হয়ে আসল, তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রতঙ্গে কলি,পাতা, ফুল ও ফলের বিভিন্ন গুণাবলী যেন সঞ্চিত ছিল।এমনিভাবে যে, যেরূপ মাটির মধ্যেই রোপিত হোক না কেন, সে স্থানের প্রকৃতি অনুযায়ী বসন্তের সৃষ্টি করে দিচ্ছিল। এ কবি-প্রকৃতি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতে খুব অল্পই জন্মলাভ করেছে। তিনি সাহিত্যের যে শাখাতেই মনোনিবেশ করেছেন, সেথায় শতাব্দীকালের জন্য যুগ-অপ্রতিদ্বন্দী বলে বিবেচিত হয়েছেন। তিনি কাব্য সাধনায় কারো নিকট হতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। কেবল প্রথম জীবনে তাঁর পিতার নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কাব্য সাধনার মূল গতিবিধিই আশ্চর্য )

ইনশা যৌবনের শুরুতেই মুর্শিদাবাদে ছেড়ে দিল্লিতে আসেন। তখন দিল্লির রাজতখ্তে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাট বিশেষ কাব্যানুরাগী ছিলেন বলে জানা যায়। সম্রাট শাহ্ আলম কবি ইনশার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও সম্মান প্রদর্শন করেন। আর কাব্যনুরাগী, কাব্যরসিক ও কৌতুকপ্রিয় সব্যসাচী কবি ইনশাও সুমধুর ভাষা ও কবিতা দিয়ে বাদশাহকে এমনভাবে বশ করলেন যে, বাদশাহ এক মুহূর্তের জন্যও কবি ইনশার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারলেন না। কবিকে বাদশাহ যথেষ্ট আর্থিক সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অতি চঞ্চল ও উচ্চ অভিলাসি কবি ইনশা তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি তাঁর কাব্যের যথার্থ মূল্যনির্ধারণের জন্য দিল্লি ছেড়ে লাক্ষ্ণৌর পথে অগ্রসর হন। লাক্ষ্ণৌতে গিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের পুত্র যুবরাজ শাহজাদা সুলায়মান শুকোহর কাছে আশ্রয় নিলেন। শাহজাদাও কাব্যানুরাগী ছিলেন, তাছাড়া পিতার দরবার থেকে আগুন্ত বলে শাহজাদা ইনশার বিদগ্ধ, বিচক্ষণ ও হাস্যরস বাক্যালাপের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। যদিও সে সময়ে তার দরবারে মুসহাফী. জুরাৎ, মির্জা কাতিল ও অন্যান্য কাব্য প্রতিভাবান কবিগণ কবিতা চর্চা করতেন, এবং মুসহাফীর কাছ থেকে বাদশাহ কাব্যরস গ্রহণ করতেন ও তাকে উস্তাদ হিসাবে মান্য করতেন, কিন্তু ইনশা তাঁর দরবারে যোগদান করার পর তাঁর কাব্যে প্রতিভা ও রসিকতার প্রতি বিমুগ্ধ হন এবং পরবর্তীতে মুসহাফীকে বাদ দিয়ে ইনশাকেই কাব্যগুরু হিসাবে গ্রহণ করেন।

ইনশার পার্থিব চাহিদা এতোই বেশি ছিল যে, তাঁর উচ্চবিলাসি জীবনের খোরাক মিটানোর জন্য বাদশাহ সুলেমান শুকোহর দরবার ত্যাগ করে সাদাৎ আলী খানের দরবারের মুসাহিব পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি সহজেই নবাবকে আমোদবিলাসী ও রসানুরাগী করে তোলেন। এমনভাবে নবাবকে প্রভাবিত করেন যে, তিনি রাজকার্যেও পর্যন্ত নবাবের চির-সহচর হয়ে যান। রাজকার্যের কোন ব্যাপারেই ইনশার কথা অমান্য করা হতো না। তিনি যাকে যা দিতে বলতেন নবাব তাকে তাই দিয়ে দিতেন, এমন বন্ধুসুলভ ভাব ছিলো নবাবের সাথে। [৩]

Dhaka University Institutional Repository

কবি ইনশা যেমন রসিক কবি ছিলেন, তেমনি একজন বিখ্যাত বহুভাষাবিদও ছিলেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ ছিল যা একাধিক ভাষায় রচিত হয়েছিল। তিনি একাধারে আরবী, ফার্সি, তুর্কি ভাষায় যেমন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি হিন্দুস্তানী ভাষা ছাড়া প্রাদেশিক অন্যান্য ভাষাসমূহেও তাঁর বিশেষ দখল ছিল। তাঁর রচিত "দরিয়ায়ে-লতাফাৎ" হিন্দুস্তানী ভাষার প্রথম শ্রেষ্ঠ তুলনামূলক ব্যাকরণ হিসাবে আজীবন অমর হয়ে থাকবে। এয়াড়াও তিনি ব্রজভাষা, পুশত্, পাঞ্জাবী, পুরবী, কাশ্মিরী, মারাঠা, গুজরাটি ও আফগানী ভাষায় দক্ষ ছিলেন এবং কবিতাও লিখতে পারতেন। গভীর ভাষাজ্ঞান ও পাণ্ডিত্বের জন্য অনেক সময় ইনশাকে ভারতের দ্বিতীয় আমীর খসরূ বলে অভিহিত করা হয়।

ইনশাকে অনেকটা তার সময়ের বাংলার কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ তাঁরা উভয়েই শব্দকুশলী কবি এবং উভয়েই সুললিত ও রসাল শব্দচয়নে সিদ্ধহস্ত। খাঁটি কবি বলতে যা বুঝায়, তাদের কেউই সেরূপ ছিলেন না। তবে কাব্যের রস সৃষ্টিতে তাদের যে, যথেষ্ঠ হাত ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। [৪]

ইনশা প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে যেকোন মুহূর্তে নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে কবিতা রচনা করতে পারতেন। রাজ দরবারের সভাকবি হিসাবে যখন-তখনই নবাবদের কবিতা আবৃতি করে শুনিয়ে মন খুশি করে দিতেন। এমনি এক ঘটনা ও কবিতা নিম্নরূপ।

একদিন চোবদার রাতের বেলায় এসে খবর দিল, নবাব আপনার অপেক্ষা করছেন। আমি গেলাম, গিয়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকে নবাব বসে আছেন চার-পায়ার উপর। সামনে ফুলের মালা। নবাব আমাকে বললেন, ইনশা কবিতা শোনাও। কবি ইনশা সাথে সাথে গেঁয়ে উঠলেন–

لگا چھیر کھٹ میں چار پہے اچھلا تو نے جولے کے گجرا

تو موج دریائے چاندنی میں ویسا چلنا تھا جیسے بجرا۔ [৫]

(আপনার চার পা-ই দুলে উঠলো যখন আপনি ফুলের মালা নিয়ে ও

উচ্ছাসিত হলেন যেন জ্যোৎস্নার নদীতে বজড়া চলতে শুরু করেছে।)

নবাব এমন কবিতা আবৃতি দেখে ও শুনে বিস্মিত হলেন ও হাঁসলেন।

ইনশার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তাও ছিল দারুন। বুদ্ধি প্রয়োগের এই ক্ষমতার সংগে স্বাধীন চিন্তারও সংযোগ ছিল। একদা কবি নবাবের সংগে খেতে বসেছেন। সেদিন বড় গরম পড়েছিল। ইনশা তাঁর পাগড়ি খুলে রেখে খোলা মাথায়ই আহার করছিলেন। এমন সময় নবাব তাঁর মাথায় বসিয়ে দিলেন একটি চাটি। ইনশা থতমত খেয়ে গেলেন, বললেন,

*Dhaka University Institutional Repository*

"হুজুর ছোট বেলায় মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি খোলা মাথায় বসলে শয়তানে নাকি চাটি মারে, কথাটি বড় সত্য"। [৬]

ইনশা নবাব সাদাৎ আলী খানের মুসাহিব পদে নিযুক্ত থাকাকালীন, একদিন কোন এক ব্যক্তির পাগড়ী খাপছাড়া অবস্থায় সজ্জিত দেখে নবাব সাহেবের কবিত্ব মন ফুটে উঠল এবং তিনি বলে উঠলেন–

پاگری تو نہیں ہے فراسس کی ٹوپی

কিন্তু সাদাৎ আলী খানের কবিত্বের দৌড় আর সামনে অগ্রসর হল না, তিনি তার মুসাহিবকে সম্পূর্ণ গজলটি তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। ইহার উত্তরে ইনশা গাইলেন–

یاں بکت سلام اترا ابلیس کی ٹوپی

ہے شیخ کے سب ویسی ہی تلبیس کی ٹوپی

جس سے کی پڑی کانپے ہیں ابلیس کی ٹوپی

دیتے ہیں کلہ اپنے مریدان کو جو صوفی

کہتے ہوئے یہی تھی سر ہی رجرج کی ٹوپی[৭]

অন্য আরেক দিন ইনশা মুসাহিব হিসাবে নবাবের সাথে নৌকা ভ্রমণে বের হয়েছেন, আর নবাব সাদাৎ আলী খাঁন ইনশার কোলে মাথা রেখে নদীর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পথে একটি গৃহের সামনে লেখা দেখতে পাওয়া গেল–

حویلی علی نقی خان بہادر کی

তখন কবিবর ইনশাকে লক্ষ্য করে নবাব সাহেব বললেন, মনে হচ্ছে কেহ গৃহ নির্মাণ সময় নির্দেশক (আরবী ধারাতে) 'তারীখ' লিখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কাব্যাকারে লেখে উঠতে পারে নাই। তুমি ইহা হতে রুবায়ী-ছন্দ একটি তারীখ বলে দাও। কবিবর ইনশা তৎক্ষণাৎ গাইলেন–

Dhaka University Institutional Repository

نہ عربی نہ فارسی نہ ترکی

نہ سم کی تال کی نہ سر کی

یہ تاریخ کہی ہے کسی لڑکی

حویلی علی تقی خان بہادری[৮]

(এটি আরবী নয়, ফার্সী নয়, তুর্কী নয়,

এটি সীম নয়, তাল নয়, মাথাও নয়,

এটি কোন কন্যার জন্মতারিখ উল্লেখ করেছে

হুয়ালী আলী নকী বাহাদুরের কন্যার জন্ম তারিখ)

ইনশা কৌতুকপ্রিয় কবি ছিলেন। একদিন নবাবের দরবারে নবাব সাদাৎ আলী খানের বংশ গৌরব নিয়ে কথা উঠছে। নবাব বললেন, ভাই আমিও 'নুজী বুৎতার-ফাইন' অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলহ শরীফ্ কবি কৌতুক করে বলে উঠলেন, আপনি 'আনজাব'। সারা দরবার ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। 'আনজাব' হলো 'নজীব' (শরীফ) শব্দের সর্বোচ্চ মানের শব্দরূপ (Superlative Degree) কিন্ত প্রচলিত অর্থে বাঁদীর গর্ভজাত। [৯]

নবাব সাদাৎ আলী খানের সাথে এতো ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও একসময় তার সাথেও কবি ইনশার মনোমালিন্য দেখা দেয়। কবির ছেলে তা'য়ালাল্লার মৃত্যু হলে কবির মাথা নষ্ট হয়ে যায়। একদিন নবাব কবির বাড়ীর দরজা দিয়ে সাওরীতে যাচ্ছিলেন, কবি নবাবকে সর্ব সাধারণের সামনে ইচ্ছেমত গালি গালাজ করলেন। নবাবের দরবার থেকে বেতন-ভাতা বন্ধ হয়ে গেল। শেষ জীবনে নবাবের চরম দুঃখ কষ্ট নেমে আসলে।

ইনশা খুব সৌখিন ছিলেন এবং প্রকৃতি প্রেমী ছিলেন। তাইতো প্রকৃতির রূপ ও চাদনী রাতের সৌন্দর্যের বর্ণনা ফুটে উঠেছে তার কবিতায়–

چودھویں تاریخ اک ابر تنک سا تھا جو رات

صحن گلشن میں عجائب سیر میں دیکھا گیا

جھلملی سی چادر مہتاب اوپر برق کا

Dhaka University Institutional Repository

وہ دوپٹہ بادلے کا سا جو لہرایا کیا

یوں لگا معلوم ہوتے ہیں یہ دو پریاں بھم

ایک نے گویا کہ سایہ دوسرے پر آگیا

بولئے گل بولی۔ کہ آپس میں بدلی اور ہنی

چاندنی بائی نے بی خیلا سے پہنایا کیا۔[১০]

(পাতলা মেঘের আবরণে চতুর্দশীর রাত ছিল,

ফুল বনের চত্বরে আমি আশ্চর্য দৃশ্য দেখছিলাম।

বিদ্যুতের উপরে চাঁদের উত্তরীয় ঝিলমিল করছিল,

উম্মাদিনীর দোপাট্টা যেন চঞ্চল হয়ে উড়ছে।

মনে হচ্ছিল, দুই পরী পরস্পরকে ছায়া দিয়ে ফিরছে,

ফুলের সুরভি কথা কয়ে উঠলো,

বল ওরা দু'জনে ওড়না বদল করছে,

জ্যোৎস্না-বাইজী অকপটে নৃত্যরত হোল।)

কবিবর ইনশার শেষ জীবনে দুঃখের ঘনঘটা কালো মেঘ নেমে এসেছিল। আর্থিক দৈন্যদসায় দিন কাটাতে হয়েছিল। তাঁর শেষ জীবনের সেই করুণ ঘটনাটি তারই ঘনিষ্ট বন্ধু কবি সা'আদাত ইয়ার খান রংগীন বর্ণনা করেছেন। একদা তিনি লাক্ষ্ণৌতে ইনশাকে দেখতে যান। ইনশার বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখেন, সর্বত্র শূন্যতা ও নীরবতা বিরাজ করছে। দ্বারে করাঘাত করলে কে এক বৃদ্ধা ভিতর থেকে জবাব দিল। সা'আদাত ইয়ার খাঁন নিজের পরিচয় দিলেন। দ্বার খুলে গেল, দেখা গেল বৃদ্ধা স্বয়ং কবির স্ত্রী।

সা'আদাত ইয়ার খানের বর্ণনাটি আবে-হায়াতেও বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নরূপ–

"میں اندر گیا دیکھا کہ ایک کونے میں انشا بیٹھے ہیں تن برہنہ ہے دونوں زانوں پر سر دھرا ہے آگے راکھ کر ڈھیر ہیں ایک لوٹا سا حقہ پاس رکھا ہے یا تو وہ شان شکوہ کہ جمگھٹ دیکھتے تھے وہ گرمجوشی اور مجھلیوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا یہ حالت دیکھی۔ بے اختیا

Dhaka University Institutional Repository

دبھر آیا۔ میں بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیااور دیر تک رویا۔ جب جی ہلکاہوا۔ تو میں نے پکارا کہ سید انشاء۔ سید انشاء سر اٹھا کر اس نظر حسرت سے دیکھا جو کہتی تھی کہ کیا کروں آنکھ آنسو نہیں۔ میں نے کہا کیا حال ہے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا شکر ہے پھر اس طرح سر کو گھٹنوں پر رکھ لیا کہ نہ اٹھایا۔[১১]

(আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম, কবি এককোণে বসে আছেন, গায়ে কাপড় নেই, মাথাটা দুই হাঁটুর উপর আনত হয়ে আছে। একটা ভাংগা হুক্কা তাঁর সামনে আর পাশেই নিভে যাওয়া তামাকের আংগার স্তুপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। হায় যেখানে আনন্দ-কোলাহল স্বর্গ প্রত্যক্ষ করেছি, সেখানকার এই অবস্থা। অশ্রুসংবরণ করা আমার জন্য কঠিন হল। কেঁদে ফেললাম। তারপর একটু শান্ত হয়ে ডাকলাম,সৈয়দ ইনশা, সৈয়দ ইনশা ভাই কেমন আছ। মাথা তুলে কবি জবাব দিলেন, আল্লাহর শুকুর। তারপর আবার মাথা আনত হয়ে এলো হাঁটুর উপর।)

কবি ইনশা যৌবনকালে সারা দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বেড়াতেন। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে হাঁসি ফুটিয়েছেন। রসাল বাক্যলাপ দিয়ে রাজদরবারের সবাইকে হতবাক করে দিয়েছেন। নিজের উচ্চবিলাসী জীবনযাপনের জন্য তিনি সবসময় দুনিয়াদারীর পিছনে ছুটেছেন এবং সুখময় জীবনের জন্য বিভিন্ন রাজ দরবারে ঘুরে চাটুল ও কৌতুকপ্রিয় বক্তব্য প্রদান করেছেন। কিন্তু শেষ বয়সে এসে তাকে এর চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তিনি যদি যৌবনকালে নিজের জীবনের আসল মূল্য রক্ষা করে চলতেন, হাস্যরস, কৌতুক ও চাটুলতা না করতেন তাহলে শেষ সময়ে তাঁর এমন অবস্থা হয়তো হতো না। তাই আমাদের কবিবর ইনশার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

**তথ্যসূত্রঃ**

১। সায়্যেদ এজাজ হোসাইন, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃ : ১১৬।

২। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১১২।

৩। সায়্যেদ এজাজ হোসাইন, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃ : ১১৭।

৪। অধ্যাপক হরেন্দ্র চন্দ পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১১৩।

৫। অধ্যাপক মনির উদ্দিন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১১৯।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ১২০

৭। শ্রী হরেন্দ চন্দ পাল *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, ,পৃ : ১১৫।

৮। প্রাগুক্তা, পৃ : ১১৬।

৯। মনির উদ্দিন ইউসুফ উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ : ১২০।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ : ১১৬।

১১। সায়্যেদ এজাজ হোসাইন, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃ : ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

## মুহাম্মদ ইব্রাহীম খাঁন জওক

"মুহাম্মদ ইব্রাহীম খাঁন জওক" দিল্লির সর্বশেষ মোগল সম্রাট বাহাদুরশাহ জাফরের সভা কবি ছিলেন তিনি তার কাব্য প্রতিভা দিয়ে মোগল সম্রাটের দরবারকে অলংকৃত ও বহু রঙ্গে রঙ্গিন করে সুসজ্জিত করতে সক্ষম হয়েছেলেন। জওকের কবি-খ্যাতি মহান কবি মির্যা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিবের মতোই পুরো হিন্দুস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পরার পর তা ক্রমে ক্রমে উপমহাদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে আলোক সজ্জা প্রজ্জলিত করে বিশ্ব দরবারের সুমহান আসনও অলংকৃত করেছিল। জওক ছিলেন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সুললিত কণ্ঠের অধিকারী একজন প্রতিভাবান উর্দু কবি। জওকের কণ্ঠে উর্দু ভাষা ও উর্দু কবিতা এমন সুমধুর সংগীত লহরী উত্থিত করলো যে, সারা উর্দুভাষী হিন্দুস্তানের উৎসুক জনগণ দিল্লীর দিকে কানপেতে চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করতে লাগলো। সে সুললিত ও সুমধুর ঝংকারের উর্দু কবিতা শ্রবণ করার জন্য।

কবিবর জাওকের আশ্চর্য স্মরণ শক্তি ও তাঁর মেধা এবং তীক্ষ্নবুদ্ধিমত্তার জন্যই এতো সুনাম ও খ্যাতি লাভ করতে পেরেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, নরম ও বিনয়ী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। নিম্নে এ মহান প্রতিভাবান কবি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হবে।

জওকের আসল নাম শেখ ইব্রাহীম, জওক তাঁর উপাধী। পিতার নাম শেখ মুহাম্মদ রমজা আলী। তাঁর পিতা একজন সাধারণ গরিব সৈনিক ছিলেন। জওক ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। নবাব লুৎফে আলী খানের হেরেমের দারওয়ানের চাকুরী করতেন। অতএব এ থেকে বুঝাই যায় যে, আভিজাত্যের গৌরব জওকের ভাগ্যে ধরা পড়েনি । বাল্যশিক্ষাও তার খুব ভাল মতো হয়নি। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পিতা হাফেজ গোলাম রসূলের কাছে বাল্য শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন। হাফেজ গোলাম রসূলও একজন

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত কবি ছিলেন, তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই কবিতার আসর বসতো। সেখানে জওক তাঁর স্বরচিত উর্দু কবিতা পাঠ করতেন। এছাড়াও তিনি প্রসিদ্ধ কবিদের বিখ্যাত বিখ্যাত কবিতা মুখস্ত করতেন। তাছাড়া এ সময়ে দিল্লীতে আমির ওমারাদের গৃহে ও রাজ দরবারের মাশায়েরার আসর বসতো। জওক সে সব মাশায়েরায় কবিতা পাঠ করতেন। তাঁর কবিতা পাঠ ও কাব্য প্রতিভা দেখে মুশায়েরার প্রবীন কবিগণ বিস্মিত হয়ে যেতেন। তাঁর এরূপ কাব্য প্রতিভাই তাকে উস্তাদের আসনে সমাসিন করে। এমনকি তখন দিল্লীর নবাবগণ ও তাকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করলেন। নবাবগণ তাঁর যোগ্যতা দেখে তাকে "খাকানীয়ে হিন্দ" উপাধীতে ভূষিত করেন। পরবর্তীতে তাকে "খান বাহাদুর উপাধিও প্রদান করা হয়। জওক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮ বছর বয়সে মারা যান। মৃত্যুর তিন ঘন্টা আগেও তিনি একটি উর্দু কবিতা পাঠ করে ছিলেন, কবিতাটি নিম্নরূপ-

کہتے ہیں آج ذوقؔ جہاں سے گزر گیا

کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے۔[১]

(বলা হয় আজকের এ দিন জওক

দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন,

তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন,

খোদা তুমি তাকে ক্ষমা কর।)

জওকের আরেক বাল্য শিক্ষক হলো শাহ নাসির। তিনি তাঁর বাল্য বন্ধু সাথী মীর কাজিম হুসেন এর শিক্ষক শাহ নারি এর কাছে কাব্য অনুশীলন করতে লাগলেন। কবি শাহ নাসির জওকের তীক্ষ্ণ মেধা বুদ্ধিমত্তা ও কবিত্ব শক্তির অপুর্ব স্ফুরণ দেখে একেবারে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন যে, আমার খুব হচ্ছে কারণ আমার শিষ্যই হয়ত গুরুর চেয়ে বেশি সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করবে। ঠিক তাই হয়েছে। অতি অল্প দিনেই জওক উস্তাদের মর্যাদা লাভ করলেন। শাহ নাসির সাহেব শিষ্যের কাব্য থেকে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করলেও জওকের এই ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ কাব্যই জনসাধারণ ও কাব্য প্রেমীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পায়।

দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ছিলেন, তিনি অনেক কবিতাও লেখেছেন। তাঁর দরবারে নিয়মিত মুশায়েরার আসর বসতেন। কবিবর সাহচার্য শাহজাদার কবি-প্রাণে খুশির হিল্লোল বয়ে দেয়। জওকের বয়স তখন মাত্র ২০ বছর। শাহজাদাহ কবিকে তাঁর দরবারে মাসিক চার টাকার বেতনে সভাকবি পদে নিয়োগ দেন এবং শাহাজাও কবির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর কবির বেতন চার টাকা হতে ক্রমে ক্রমে ১০০ টাকা পর্যন্ত হলো। এছাড়াও বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান হতেও রাজদরবার হতে

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন এনাম বা পুরস্কার এবং উপহারও উপঢৌকন পেতে থাকলেন। বাদশাহকে এক কাসিদা উপহার দেওয়ার কারণে তদানীন্তন দ্বিতীয়-আকবর শাহ কবিতে "খাকানী ই-হিন্দি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

আর মীর্জা আব্দুল মুজাফ্ফর বাদশাহ হয়ে যখন বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করলেন, তিনিও কবির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করলেন। বর্ণিত আছে যে, একবার এই বাহাদুর শাহ খুব অসুস্থ হলে কবি জওক বাদশাহকে একটি স্বরচিত কাসীদা পাঠ করে শোনালেন। বাদশাহ কসিদাটি শুনে প্রাণে খুব আনন্দ পেলেন এবং মুগ্ধ হলেন। বাদশাহ কবিকে নানা প্রকার উপঢৌকন দিলেন এবং কবিকে খাঁন বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করলেন। এরপর কবি বাদশাহকে আরো একটি কাসীদা উৎসর্গ করেন, তাতেও বাদশাহ খুশি হয়ে কবিকে একটি "গ্রাম" জায়গিররূপে দান করে দিলেন। [২]

কবিবর শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহীম খাঁন জওক গালিবের ন্যায় এক সুফীসাধক ও ধার্মিক এবং সুহৃদ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রতিদিন নামাজ-রোজাসহ সকল ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি যেমন যত্নবান থাকতেন তেমনি দুনিয়ার সকল কার্যক্রম পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার চেষ্টা করতেন। উর্দু কবিতা চর্চা ছাড়াও তিনি ফার্সী, হিন্দী ইত্যাদি ভাষার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন বিদ্যায়ও তাঁর ব্যাপক আগ্রহ ও সখ ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যা যেমন সংগীত জ্যোতিষ শ্রাস্ত্র, খাব নামাহ বা স্বপ্নতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, তাসাউফ বা সুফী-ধর্মতেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বদা সাদামাটা, সহজ-সরল ও অতি সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন। দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য ও চাকচিক্যের প্রতি এবং অর্থের ও পদের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিলনা। তিনি নিজ জন্মভূমি ও দেশকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, এজন্য অর্থের লোভে নিজ দেশ ও ভূমি ত্যাগে তাঁর অনীহা ছিল।

কবিবর জওকের অসমান্য কাব্যপ্রতিভা লক্ষ্য করে কাব্যানুরাগী, হায়দাবাদের দেওয়ান চান্দুলাল সাহিত্যিক সমাগমে মুখরিত কাব্যিক পূন্যভূমিতে এসে তাদেরকে সাহিত্য ও কাব্যিক রস প্রদান করার জন্য বারংবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কবি জওক হায়ারাবাদ যেতে অস্বীকার করে দেওয়ান চান্দুলালকে একটি কবিতা লিখে পাঠান। যা নিম্নরূপ–

گرچہ ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن

کون جائے ذوقؔ پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر [৩]

(আজকাল যদিও দক্ষিনাত্যে কাব্যের বড় সম্মান,

কিন্তু দিল্লীর ক্ষুদ্রপথ ত্যাগ করে জওক কি করে যাবে।)

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত কবিতার মাধ্যমে কবি বুঝাতে চান নিজের দেশের ক্ষুদ্র গলিপথও অনেক ভালো ভিনদেশের উঁচু দালান-কোঠা ও প্রশস্ত পথ হতে। জওক ইচ্ছে করলে অধিক অর্থ উপার্জনের জন্য হায়দারাবাদ যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি সেখানে না গিয়ে দিল্লীর এক অখ্যাত গলিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছেন। এতে বুঝা যায় তিনি অল্পেতুষ্ট ছিলেন, জাগতিক তেমন চাহিদা তাঁর কখনোই ছিলনা।

দিল্লীতে জওক গালিবের সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। যদিও তিনি গজল কবিতায় মির্যা গালিবের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন নাই, কিন্তু এ কথা বিনা দ্বিধায় স্বীকার্য যে, কাসীদা কবিতায় তিনি তাহার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকার ছিলেন। ভাবের অর্থের দিকে লক্ষ্য করলে যদিও জওকের কবিতা গালিবের কবিতার তুল্য নয়, কিন্তু সহজ-সরল ও সাদা-মাটা প্রকাশভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করলে জওকের কবিতা গালিবের কবিতার সমপর্যায় মানা যেতে পারে। জওকের সুযোগ্য শিষ্য ও আবে হায়াতের প্রনেতা মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন আজাদ বলেন, উস্তাদ জওক পঞ্চাশ বছর কাব্যচর্চা করে যা কিছু লিখেছিলেন তার অধিকাংশই সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিনষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বিশেষভাবে গজল ও কাসীদা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়ায় তিনি অন্যান্য কবিতার মধ্যে রূবায়ী, মুখম্মাস ও তারিখ ইত্যাদি রচনা করেছেন।

তিনি পত্রাকারে "নামায়ে-জাহানু সূজ" নামে একটি প্রসিদ্ধ মসনবী-কাব্যও লেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তা পরিসমাপ্ত পারেননি। তাঁর কাব্য-অনুসারি ও অনেক শিষ্য ছিলো, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– দাগ, জাফর আজাদ, জহীর ও আনোয়ার। জওক আভিধানিক শব্দ কাব্যে প্রয়োগ করার চেয়ে প্রচলিত মুখের ভাষাকে সুরুচির অনুবর্তী করে অপরূপ ছন্দ মাধুর্যে ও সুরের ঝংকার করাকেই তিনি আসল কৃতিত্ব বলে মনে করতেন। অসাধারণ কবিত্বশক্তির সাথে কল্পনার সংমিশ্রণ করে তিনি যে কল্পচিত্র উপস্থাপন করতেন ছন্দের জাদুতে তা প্রাণ সঞ্চার করতো। তিনি কাব্যে সহজ-সরল ও নিখুঁত রচনাশৈলী ও অর্থপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন। এ ভাষায় তিনি দক্ষ ও পণ্ডিত ছিলেন। নিম্নে এরূপ একটি কবিতা লক্ষণীয়–

مشکل ہے میرے عہد محبت کا ٹوٹنا

اے بے وفا! یہ تیری خدا کی قسم نہیں۔

یاں لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں

واں ایک خامشی تری سب کے جواب میں

اے سمع، تیری عمر طبیعی ہے ایک رات

ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔[৪]

(আমার যুগের প্রতি ভালোবাসা ভেঙ্গে ফেলা কঠিন

হে অকৃতজ্ঞ! এটাই কী খোদার কাছে তোমার ওয়াদা ছিল।

হয়তো মুখে লাখ লাখ শব্দ কষ্টে উচ্চারণ করা

অথবা চুপ থেকে সকল কিছুর উত্তর দেওয়া।

হে প্রদীপ! তোমার জীবন তো আসলে একটি রাত মাত্র

ইহা তুমি হেঁসেও কাটাতে পারো

অথবা কেঁদেও কাটাতে পারো।)

গালিব যখন তাঁর শ্বশুরালয়ে এলাহী বখশের গৃহে বেড়াতে আসেন সেদিন জওকের সাথে গালিবের পরিচয় ঘটে। প্রথম দিনের আলাপ-পরিচয়ের পর থেকেই জওক গালিবের প্রতি বিরূপ মন প্রদর্শন করেন। এ বিরূপতাই পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়েছিলো এবং এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জওকের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। নিম্নে পাশাপাশি গালিবের ও জওকের রচনার এক কৌতুকপ্রদ তুলনামূলক উপমা তুলে ধরা হলো–

উপমাটি কোন কবিরই স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রকৃত কবিতা থেকে নেওয়া হয়নি। সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র জাওয়াবখতের বিবাহ উপলক্ষে গালিব একটি "সিহরা" (বাংলা প্রীতি উপহার জাতীয় লেখা) রচনা করেন। কবিতাটির শেষ পংক্তিতে গালিব বলেন যদি কেউ পারে তবে এর চাইতে ভালো কোন 'সিহরা' রচনা করে দেখাক'– ইংগিতটি ছিল জওকের দিকে। গালিবের চ্যালেঞ্জ জওক গ্রহণ করেছিলেন। গালিব বলেন–

خوش ہوا ے بخت کہ ہے آج ترے سر سہرا

باندھ شہزادہ جواں بخت کے سر پر سہرا۔[৫]

(হে সৌভাগ্য তুমি নন্দিত হও, কারণ তোমার শিরে আজ মুকুট

শাহাজাদা জাওয়াঁ বখতের শিরে বীরের মুকুট পরিয়ে দাও।)

*Dhaka University Institutional Repository*

জওক বলেন–

اے جواں بخت مبارک ہو تجھے سر پر سہرا

آج ہے یمن و سعادت کا ترے سر سہرا۔ [৬]

হে জাওয়াঁ বখ্ত, তোমার শিরে বিয়ের মুকুট সৌভাগ্য হয়েছে

আজ তোমার শির মুকুটরূপী কল্যাণ ও মঙ্গলকে ধারণ করছে।

গালিব বলল–

کیا ہی اس چاند سے مکھڑے پہ بھلا لگا ہے

ہے ترے حسن دل افروز کا زیور سہرا۔ [৭]

এই চাঁদের মতো মুখে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে,

তোমার মনোরম সৌন্দর্যের একাকার হয়েছে বিয়ের মুকুট।

জওক বললেন–

وہ کہے صلی علی یہ کہے سبحان اللہ

دیکھئے مکھڑے پہ جو تیرے مہ و اختر سہرا

سر پر طرہ ہے مزین تو گلے میں بدھی

کنگنا ہاتھ میں رہیا ہے، تو منہ پر سہرا

ایک کو ایک پر تزین ہے دم آرایش

سر پر دستار ہے دستار کی اوپر سہرا۔ [৮]

(কেউ বলছে, 'আল্লাহর প্রশংসা' কেই বলছে 'তাঁরই মহাত্ম্য',

যখন তারা তোমার মুখে শোভামান দেখেছে

*Dhaka University Institutional Repository*

চন্দ্র ও নক্ষত্র খচিত বিয়ের মুকুট।

শিরে শোভামান অলকগুচ্ছ, গলায় ফুলের মালা,

হাতে কংকন এবং মুখের উপর বিয়ের মুকুট।

সজ্জার নৈপুণ্য একের উপর অন্যকে দান করেছে মাহাত্ম,

শিরে পাগরি আর সেই পাদরির উপর বিয়ের মুকুট।)

অপর একটি শ্লোক, গালিব সেখানে বলেন–

ناؤ بھر بھی پروے گئے ہونگے موتی

ورنہ کیوں لاتے ہیں کشتی میں لگا کر سھرا۔[৯]

(নৌকা বোঝাই করে হয়তো মুক্তা গাঁথা হয়েছিল,

তা না হলো নৌকায় করে কেন বিয়ের মুকুট আনা হবে?)

জওক বলেন–

آج وہ دن ہے کہ لائے در انجم سے فلک

کشتی زر میں مہ نو کی لگا کر سھرا۔[১০]

(আজ তো সে দিন যে, নক্ষত্রলোক থেকে আকাশ

সোনার তরীতে করে নতুন চাঁদের মুকুট নিয়ে এসেছে।)

জাওকের শ্লোকগুলী অতি সহজ ও সাবলিল ভাষায় সুন্দরভাবে লেখা অন্যদিকে গালিবের শ্লোকগুলো খুবই দুর্বোধ্য। আরেকটি শ্লোকে মির্যা গালিবে বলেন–

رخ پہ دولہا کے جو گرمی سے پسینہ ٹپکا

ہے رگ ابر گھر بار سراسر سھرا۔[১১]

Dhaka University Institutional Repository

বরের মুখের উপর থেকে যখন ঘাম ঝরে পড়লো,

তখন বিয়ের মুকুটের ধমনীগুলো

অবিরত মুক্তা ঝরাতে শুরু করলো

জওক বলেন–

روئے فرخ پہ جو میں تیرے برستے انوار

نار بارش سے بنا ایک سراسر سھرا

تالیش حسن سے مانند شنائے خورشید

رخ پر نور یہ ہے تیرے منور سھرا۔[১২]

(তোমার ভাগ্যবান ললাটের উপর যখন সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হলো,

তখন তোমার বিয়ে মুকুটখানি আগাগোড়া বর্ষণধারার অনুরূপ হলো

সৌন্দর্যের কিরণ সম্পাতে তোমার জ্যোতির্ময় মুখের উপর

ঝলমল করে উঠলো তোমার বিয়ের মুকুট।)

পরিশেষে বলা যায় জওক উর্দু গজল ও কাসীদা উভয় বিষয়েই সুদক্ষ ও সুনিপুণ শিল্পী ছিলেন। তিনি বাহাদুর শাহ জাফরের প্রশংসাজ্ঞাপক অনেক কাসীদাই রচনা করেছিলেন। তাঁর গজল ও কাসীদায় সহজ-সরল ও সাধারণ মানুষের মৌখিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাঁর কাব্যসম্ভার এত অর্থবহ, সরস ও মাধুর্যে ভরপুর ছিলো যে, তা উর্দু সাহিত্যের মহামূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হয়েছে। জওক একজন প্রভাবশালী কবিগুরু ছিলেন তিনি তাঁর জীবিতকালে সকল কবিগুণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি মির্যা গালিব ও মোমিনের চাইতেও বেশী জনপ্রিয় কবি ছিলেন। সম্রাটের সভাকবি হওয়ার কারণে ও একই সাথে সম্রাটের কাব্যগুরু হওয়ার কারণে দিল্লীতে তাঁর প্রভার ও প্রতিপত্তি সবার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

## তথ্যসূত্র

১। সাইয়্যেদ ইজাজ হুসাইন, *তারিখে আদাবে উর্দু*, ইদারায়ে এশায়াতে উর্দু লাহোর। আক্টোবর ৪৮, পৃ-১৪৭।

২। অধ্যাপক শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৬৬

৩। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৬৬

৪। প্রফেসর নূরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*, ইজুকেশনাল বুক হাউস, আলীগড়, ২০০৪, পৃ : ১১৯।

৫। মনির উদ্দীন ইউনুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৭৪।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৫।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৫।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৬।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৬।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৬।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

# নবাব মির্জা খান দাগ

১৮৫৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী লাক্ষ্ণৌ জয় করার পর ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহে মোগল শাহানশাহ রাজ দরবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে লাক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর যে সকল কবিগণ অর্থ-উপার্জনের খোঁজে বাহিরে বেড়িয়ে পড়েন তাদের মধ্যে সমগ্র হিন্দুস্তানের নামকরা কবি নবাব মির্জা খান দাগও ছিলেন। দাগ ছিলেন রাজদরবারের নামজাদা কবি জওকের শিষ্য। তিনি উর্দু কাব্যের প্রাচীনরীতি মেনেই কাব্য চর্চা করেন। তবে তিনি খুব সহজভাবে সৌখিনতার সাথে হাস্যরসময় কবিতা লিখতেন। তিনি যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। তাঁর রচনার সৌন্দর্য-মাধুর্য, স্বতঃস্ফূর্ততাও ভাষার বিশুদ্ধতা সারা হিন্দুস্তানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি তাঁর যুগের সর্ব উত্তম বাণীকার বলে স্বীকৃত ছিলেন। দাগই দরবারী কাব্য সাহিত্যের সর্বশেষ প্রতিভূ ছিলেন।

নবাব মির্জা খাঁন তাঁর আসল নাম, দাগ তাঁর উপাধি বা কাব্যিক নাম। তাঁর পিতার নাম নবাব শামসুদ্দীন খাঁন। দাগ ১৮৩১ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। পরে তাঁর মাতা দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহের পুত্র মির্জা মুহাম্মদ সুলতানের সাথে দ্বিতীয় বারের মতো বিবাহ করে সংসার শুরু করেন। এই সুযোগে দাগ মায়ের সাথে নব পিতার আশ্রয়ে দিল্লীর লাল কেল্লায় প্রবেশ করে বসবাস করার সুযোগ পান। জওক ছিলেন সে সময় রাজ দরবারের সভাকবি, সম্রাট ও তাঁর পুত্রের উস্তাদ। তাঁর মাতার অতি আগ্রহের কারণে তিনি রাজকীয় কবি জওকের শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। জওক তাকে অনেক ভালোবাসতেন এবং বিভিন্ন মুশায়েরায় দাগকে সাথে নিয়ে যেতেন, এতেই দাগের মনে কাব্য চর্চার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হয়। বাল্যকালেই তিনি আরবী, ফারসী সাহিত্যের চর্চা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর আরবী ও ফারসী চর্চার শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধ গিয়াসুল লুগাত প্রণেতা পারস্যের অধিবাসী মৌলবী গিয়াস-উদ্দীন ও মৌলবী আহমদ্ হোসেন। এ দু'জন উস্তাদের কাছেই তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্যের গভীর জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ঘোড়দৌড়, নানারূপ কারুকার্য বা আর্ট শিল্প, সুন্দর হস্তাক্ষর ও কৌতুক বা হাস্যরসিকতায় বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কবিত্বশক্তি ছিল তাঁর প্রকৃতিগত, তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দাগ একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং চারিদিকে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পরে। [১]

১৮৫৬ সালে দাগের নতুন পিতা মির্যা মুহাম্মদ সুলতানের মৃত্যুর কিছুদিন পর অন্যান্য মান্যগন্য ও পণ্ডিত কবি সাহিত্যিকদের ন্যায় লালকেল্লা ছাড়তে হলো এবং দিল্লীও ছেড়ে দিতে হলো। দাগের জীবনে একটি বিপদ নেমে এলো, রিযিকের সন্ধানে তিনিও ব্যাকুল হলেন অন্যন্য কবি সাহিত্যিকদের ন্যায়। লাক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর কবিদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী খানের রাজ দরবার। নবাব ইউসুফ আলী খাঁন ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যাৎসাহী ও কাব্যপ্রেমিক। তিনি দাগকে অনেক আগ থেকেই চিনতেন ও জানতেন, দাগ সেখানে সপরিবারে আশ্রয় নিলেন। নবাব তাকে অনেক সম্মান দেখালেন। ইউসুফ আলী খাঁনের মৃত্যু হলে রামপুরের নবাব হন কলব আলী খান। তিনি নবাব কলব আলী খানের মোসাহেব পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি অনেক এনা'ম প্রাপ্ত হন। দাগের প্রতি নবাব কলব আলী খানের শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম, কবিও নবাবকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। তিনি মাঝে মধ্যেই দিল্লীর প্রতি মায়া করতেন এবং দিল্লীতে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যাক্ত করতেন কিন্তু নবাবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিলো আরো বেশি। কবি সে সম্পর্কে বলেন–

ہر چند رام پور میں گھبرا رہا ہے داغؔ

کس طرح جائے کلب علی خان کو چھوڑ کر۔[২]

(রামপুরে দাঘের মনে বিচ্ছেদের দুঃখ,

কিন্তু কলব আলী খাঁনকে ছেড়ে সে কি করে যায়?)

দাগ নবাব বাহাদুরের সাহচর্যে ছিলেন প্রায় ২৪ বছর। সেই সুদীর্ঘকাল তিনি খুব সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে যাপন করেছেন। আর এজন্য দাগ অনেক সময় রামপুরকে "আরামপুর" বলে অভিহিত করেছেন। দাগ নবাব কলব আলীর সাথে পবিত্র মক্কায় হজ্বের উদ্দেশ্যে গমন করেছেন। তিনি নবাবের সাথে দেশ-বিদেশের আরো অনেক স্থানেই সফর করেছেন। নবাবের সাথে কলিকাতায় গিয়ে প্রায় ৩/৪ বছর অবস্থান করেছেন। কিন্তু ১৮৮৬ সালে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে নবাবকে অন্যত্র যেতে হয় এবং তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দাগ মোট ৩০ বছর রামপুরায় অবস্থান করেছিলেন। অতপর দাগ রামপুর ছেড়ে দিল্লীতে ফিরে আসেন। এরপর জীবিকার খোঁজে আরো বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। যেমন– লাহোর, অমৃতসর, তিশানকোট রাজ্য, বাংগালোর, আগ্রা, আলিগড়, মথুরা, জয়পুর সংগ্রাম রাজ্য ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সর্বশেষ ১৮৮৮ সালে রাজা গিরিধারী প্রসাদের মাধ্যমে দাগ হায়দ্রারাবাদ পৌছান। কিন্তু হায়দ্রারাবাদের নবাব নিজামের সহিত সাক্ষাত করে কোন লাভ হয় নাই। উপায় না দেখে তিনি আবারও দিল্লী চলে যান। পরে ১৮৯১ সালে নিজাম কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আবার হায়দ্রাবাদে আসেন। এখানে এসে দাগ নিজাম মীর মহযুব আলী খাঁনের সভা কবি ও উস্তাদ পদে নিয়োগ পান। এ নিয়োগের ফলে দাগের জীবনে আবার অফুরন্ত আরাম-আয়েশ ও সম্মান এবং প্রতিপত্তির অধিকারী হন। আর উত্তরোত্তর তাঁর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি হতে থাকে। তাঁর মাসিক ভাতা প্রথমে ৪৫০ টাকা ছিলো। সেটি বেড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা হয়। এছাড়া সাময়িক অন্যন্য উপহার-উপঢৌকন তো আছেই। দাগ হায়দ্রাবাদে যে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন এতো সুখ মনে হয় আর কোন কবি পাননি। এইভাবে দীর্ঘ ১৮ বছর

*Dhaka University Institutional Repository*

সুখের স্বর্গে অতিবাহিত করেন। অবশেষে ১৯০৫ সালে হায়দ্রারাবাদেই দাগ ইন্তেকাল করেন।[৩]

দাগ মসনবী, কাসীদা, কিত্আসহ কাব্যের সকল শাখাতেই তিনি রচনা করেছেন। তবে গজল কাব্যেই দাগের বিশেষ সুনাম ও প্রসিদ্ধি পাওয়া যায়। দাগের উল্লেখযোগ্য কাব্যসমূহ নিয়ম্নরূপ–

১। চারটি দেওয়ান : সেগুলী হলো–

ক) গুলজারে দাগ

খ) আখতাবে দাগ

গ) মিহতাবে দাগ

ঘ) ইয়াদগারে দাগ

এর দুইটি রামপুরেই থাকাকালিন রচিত হয় ও প্রকাশিত হয়। অন্যগুলী হায়দ্রারাবাদে রচিত হয়।

২। ফরিয়াদে দাগ– এটি একটি মসনবী কাব্য। দাগের কলিকাতা থাকাকালিন সেখানকার হিজাব উপাধিধারী প্রসিদ্ধ মুণ্ডীবাই এর সাথে পরিচয় ঘটে এবং পরে তার সাথে প্রেম নিবেদন হয়। পরে রামপুরের মেলায় পুনরায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়েই প্রেম বিনিময় ও চিত্তবিনোদন করে। এই সকল প্রেম কাহিনী নিয়ে এই মসনবীটি রচিত হয়।

দাগ তাঁর যুগের একজন অতিবড় মাপের কবি ছিলেন। তিনি অতি সহজ, সরল, সরস চিন্তার আলোকে বাকপটু ও চিত্তচাঞ্চল্যকর শব্দ বিন্যাসের জন্য তিনি সবার কাছেই বাহবা পেয়েছেন। তিনি অতি সহজ সরল ও সাবলীল শব্দমালা ব্যবহার করতেন এবং সবসময় সর্বসাধারণের মৌখিক ভাষাকেই তাঁর কাব্যে স্থান দিয়েছেন। সাধারণ মানু কে অনন্দ দেওয়ার জন্য যা যা করা দরকার তার সবই দাগের কাব্যে উপস্থিত। মাওলানা আলতাফ হোসাইন হালী দাগের সম্পর্কে বলেন–

داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں

نہ سنیگا کوئی بلبل کا ترانہ ہر گز۔[৪]

(দাগ ও মাজরূহের কবিতা

শুনে নাও এই বাগানে,

*Dhaka University Institutional Repository*

পরে আর এই বাগানে কোন

বুলবুলের গান শুনতে পাবে না)

দাগ মাত্র বিশ বছর বয়সেই তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি লাভ করেন। বর্ণিত আছে তাঁর সমসাময়িক কবি মির্যা গালিব স্বয়ং নিজে তাঁর দু'টি পংক্তি অত্যন্ত আবেগে পুনপুন পাঠ করে তরুন কবি দাগকে উৎসাহ দিয়েছেন। পংক্তি দু'টি নিম্নরুপ–

رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں

ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔[৫]

এ পংক্তি দু'টিতে ভাষা যেন মুখের ভাষার মতোই সহজ-সরল অথচ কবিত্বের রং ও ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য উভয়ই চুড়ান্ত নৈপুণ্যের সংগে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাষার এই সহজ কাব্যময় অভিব্যক্তিই আবেগ সৃষ্টিকারী কবিতা রচনার কারণেই দাগের উর্দু কাব্য আজও অন্যতম শিল্প হিসাবে পঠিত।

দাগের তরুণ বয়সের আরো একটি কবিতা নমুনা হিসাবে পেশ করছি-

شرر و برق نہیں شعلہ و سیماب نہیں

کس لئے پھر یہ ٹھہرتا دل بیتاب نہیں۔[৬]

(অগ্নি শিখা নয়, বিদ্যুৎ কিংবা পারদও নয়,

তবে কেন এ অধীর হৃদয় এমন পেরেশানির পরিচয় দেয়।)

কবি দাগ যৌবনকালেই সিপাহী বিদ্রোহের করুণ দৃশ্য সচোখে অবলোকন করেছেন এবং তা দেখে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি। "শহরে আশুব" কবিতায় যে ধ্বংসের চিত্র এঁকেছেন তাঁর কিছু নমুনা পেশ করছি–

فلک زمین و ملائک جناب تھی دلی

بہشت و خلد سے بھی انتخاب تھی دلی

Dhaka University Institutional Repository

جواب کاہے کو تھالا جواب تھا دلی

مگر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی

پڑی ہیں آنکھیں وہاں جو جگہ تھی نرگس کی

خبر نہیں کہ اے کھا گی نظر کس کی۔[৭]

(আকাশের আশ্রয় ও ফেরেশতাদের প্রাসাদ ছিল দিল্লী
বেহেশত ও জান্নাতের চেয়েও সুন্দর শোভা ছিল দিল্লীর
তাঁর অনুরূপ কোথায়? সে যে ছিল অনুপথ

কিন্তু যখন স্মৃতির চোখে চাইলাম, দেখিলাম দিল্লী স্বপ্নমাত্র
যেখানে নারগিছ, ফুলগুলী কাটতো সেখানে এখন দৃষ্টি পড়ে
বলতে পারি না, দৃষ্টি উপলক্ষগুলীকে কে আত্মসাৎ করল।)

দাগের কবিতার আরো কিছু উদাহরণ–

ہم نے اس کے سامنے اول تو خنجر رکھا دیا

پھر کلیجہ رکھ دیا، دل رکھ دیا، سر رکھ دیا،

زندگی میں پاس سے دم بھر نہ ہوئے تھے جدا

قبر میں تنہا مجھے یاروں نے کیوں کر رکھ دیا

داغ کی شامت جو آئی اضطراب شوق میں

حال دل کمبخت نے سب ان کے منہ پر رکھ دیا۔[৮]

*Dhaka University Institutional Repository*

(প্রথমে আমি তার সামনে খঞ্জর রেখেদিলাম,

পরে কলিজা, হৃদয় এবং শির রাখলাম।

জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যাদের চোখের অদেখা হতামনা,

তারা কি করে আমাকে একাকি রেখে এলো?

দাগের আবেগে যখন অমংগলসূচক উচ্ছাস এলো

তখন হতভাগা হৃদয় সবকিছু তাঁর সামনেই রেখে দিল।

*Dhaka University Institutional Repository*

**তথ্যসূত্রঃ**

১। সাইয়্যেদ ইজাজ হোসাইন, *তারিখে আদাবে উর্দু*, *ইদারায়ে এশায়াতে উর্দু*, লাহোর, ১৯৪৮, পৃ : ১৬৩।

২। শ্রী হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ২০২।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ : ২০৪।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ : ২০৬।

৫। নুরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*,, পৃ : ১৪৫।

৬। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ২৩২

৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ২৩৩।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ : ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

# বাহাদুর শাহ জফর

বাহাদুর শাহ জফর শুধুমাত্র একজন বিখ্যাত কবিই ছিলেন না, বরং তিনি সমগ্র হিন্দুস্তানের সকল কবি সাহত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবকও ছিলেন। বিশেষ করে কবি জওকও মহান কবি মির্যা গালিবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক ছিলেন। বয়সের দিক থেকেও 'জফর' এ দুই কবিদ্বয়ের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বাহাদুর শাহ জফর ছোট বেলা থেকেই কাব্যানুরাগী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত কবিতা লিখা, বিভিন্ন মোশায়েরায় কবিতা পাঠে যোগদান করা, স্বরচিত কবিতা পাঠ করা, কবি সাহিত্যিকদের প্রতি সুদৃষ্টি প্রদান ও তাদের কাব্যচর্চার পথ প্রশস্থ করে দেওয়ার কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। কাব্যের প্রতি তাঁর এমন সুদৃষ্টি ও অভিভাবকের ভূমিকার কারণেই সকল কবি সাহিত্যকগণ তাঁর দরবারে ভীর জমাতেন। তিনি কবিতার প্রতি এমন আসক্ত ছিলেন যে, তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তৎকালিন দু'জন নাম করা ও বিশ্ব বিখ্যাত উর্দু কবি ইব্রাহিম খাঁন জওক ও মির্যা গালিবকে তার সভা কবি ও শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি কাব্য চর্চার পাশাপাশি একজন উঁচু মাপের সংঙ্গীত শিল্পি ও রচয়িতা হিসাবেই প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আবু জফর সিরাজুদ্দিন বাহাদুর শাহ দিল্লির দ্বিতীয় সম্রাট মির্যা আবু জফর আকবর শাহ এর সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। তিনি দিল্লীর লাল কেল্লায় ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দিল্লির মোগল সম্রাজ্যের সর্ব শেষ রাজা ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি পড়ালেখার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন, বিশেষ করে উর্দু কবিতা লেখা ও শেখার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়। তাঁর এমন আগ্রহ দেখে তাঁর পিতা মির্যা আবু জফর আকরব শাহ তাকে কাব্য শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য প্রথমে বিখ্যাত উর্দু কবি শাহ নাসিরের কাছে পাঠান। জফর গভীর মনোযোগ সহকারে দীর্ঘ দিন নাসির শাহের কাছে উর্দু কবিতা শেখেন। কবি নাসির শাহ বাহাদুর শাহ জফরকে উর্দু কাব্য চর্চায় অনেক দূর অগ্রসর করতে সক্ষম হন। এরপর দিল্লীর মসনদে বসে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব পালনকালীন দরবারের সভা কবি ও শিক্ষক হিসাবে জওক কে নিয়োগ দেন এবং তাঁর কাছে উর্দু চর্চা করেন। জওকের মৃত্যুর পর মহান কবি মির্যা গালিবকে তাঁর সভাকবি ও শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দিয়ে উর্দু কাব্যের বিভিন্ন শাখায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। [১]

কবি সম্রাট বাহাদুর শাহ জফর যখন স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর পিতা দ্বিতীয় আকবর শাহ নামে মাত্র হিন্দুস্থানের বাদশাহ, সকল ক্ষমতা ও শক্তি ইংরেজদের হাতে এবং ধীরে ধীরে

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজরা ভারতের সকল রাজ্যক্ষমতা দখল করে নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছেন তখন তাঁর পিতার আর কিছু করার ছিলনা, তাঁর পিতা- আকবর শাহকে ইংরেজরা একদম ক্ষমতাশূন্য করে ছিল। জফর এর পবিত্র হৃদয়ে ইংরেজদের এ নির্মম আচরণের তীর সজোড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং অনুভূতিপ্রবণ কবি শাহাজাদার মধ্যে স্বীয় অসহায়ত্ববোধ অন্তরের অন্তস্থলে সঞ্চালিত হয়েছিল। রাজমহলে অতি আরাম আয়েশের মধ্যে বেড়ে উঠলেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য এ করুন দৃশ্য ভুলতে পারেননি। এ সকল অসহায় সময়ের বর্ণাগুলি অতি করুণ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সম্রাট কবি বাহাদুর শাহের অসংখ্য কবিতায়। এমনি কিছু অসহায়ত্বের বর্ণনাচিত্র চোখে পরে জফরের নিম্নোক্ত কবিতায়--

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں

جو کسی کام نہ آسکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں

مرا رنگ روپ بگڑ گیا، مرا یار مجھ سے بچھڑ گیا

جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں

ہیئے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں

کوئی آکے شمع جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں

میں نہیں ہوں نغمۂ جانفزا، مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا

میں بڑے بروگ کی ہوں صدا میں بڑے دکھی کی پکار ہوں۔[২]

(আমি নই কারো চোখের আলো, না কারো হৃদয়ের শান্তি,

আমি এক মুষ্টি মাটি যা কারো উপকারে আসবে না।

আমার চেহারা বিকৃত হয়েছে, তাই

আমার বন্ধু আমাকে ত্যাগ করেছে,

যে ফুলবন হেমন্তে উজার হয়েছে

*Dhaka University Institutional Repository*

আমি তারই এক অকাল বসন্ত।

'ফাতেহা' পড়তে এখানে কে আসবে?

দুটি ফুল আমার সমাধিতে কে দিবে?

একটি প্রদীপ জালাতেই বা কেন

আসবে? আমি যে নিথর এক ধ্বংসস্তুপ

প্রাণকে উজ্জীবিত করে এমন করে

এমন কোন সংগীত আমি নই, আমার

কথা শুনে কার কি লাভ?

আমি এক বিরাট বৈরাগ্যের কণ্ঠস্বর,

আমি এক দুঃখীর কাতর আহ্বান।)

জফর ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক এবং সঙ্গীত শিল্পি ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর হিন্দি গান উর্দু কাব্যের এক নতুন রূপ ও রঙ সৃষ্টি করেছে। তাঁর রচিত ঠুমরী রীতির গান সারা উত্তর ভারতে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। জফরকে নতুন উর্দু সঙ্গীতের বাণীকারও বলা হয়ে থাকে। নমুনা স্বরূপ তাঁর একটি কবিতা নিম্নরূপ-

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا ہوں وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکاء

جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔[৩]

(জফর কখনো সে লোককে মানুষ হিসাবে গণ্য করে না,

সে যতই জ্ঞানী ও বিদ্বান হোক না কেন,

যিনি বিলাসিতায় খোদাকে ভুলে থাকেন,

যিনি রাগের সময় খোদাকেও ভয় পান না।)

জফরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মনের বেদনা ও দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয়ের সরল সহজ, গভীর অনুভূতি প্রকাশ। গালিবের মতো জটিল ও কঠিন কোন শব্দের ব্যবহার নেই তাঁর কবিতায় এবং উস্তাদ জওকের মতো নিপুণ শিল্প ও কলা-কৌশলও নেই তাঁর উর্দু

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায়। তিনি অতি সহজ ভাষায় নিজের জীবনের সকল সুখ দুঃখের কথাগুলী বর্ণনা করেছেন।

সম্রাট কবির এমনি কিছু কবিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো–

خدا جانے حلاوت کیا تھی آب تیغ قاتل میں

لب ہر زخم ہے گویا اھا ھاھا اھاھا

شرار و برق میں کیا فرق سمجھوں میں دونوں میں

ہے شعلہ بھبوکا سا اھاھاھا اھاھا

ظفر میں کیا کہوں عالم طبیعت کی روانی کا

کہ ہے امڑا ہوا دریا اھاھاھا اھاھا[8]

(না জানি হন্তার তরবারির আঘাতে কি আস্বাদনই না ছিল,

প্রতিটি খত মুখর হয়ে বলছে, 'আহা হা হা, আহা হা হা।'

স্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুতের পার্থক্য কি বুঝবো? উভয়ের মধ্যেই,

কি সুন্দর এক জ্যোতিষ্মান শিখা রয়েছে।)

জফর স্বভাবের সচলতার কি বর্ণনা আমি দেব, যেন সে,

এক বন্যাক্রান্ত নদী সতত ধাবমান রয়েছে সামনের দিকে।)

বাহাদুর শাহ জফর যে, ইংরেজদের শাসন ও নিয়মনীতির অনুগামী ছিলেন এবং অন্যের হুকুমের গোলাম হয়ে নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করেছেন, তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর নিম্ন বর্ণিত কবিতায়–

جو کچھ لکھا تھا پیشانی مین سب وہ اپنی پیش آیا

بہلا تھا سو بھلا دیکھا، برا تھا سو برا ہ دیکھا

Dhaka University Institutional Repository

ظفر کی سیر اس گلشن کی ہم نے، پر کسی گل میں

نہ کچھ الفت کی بو پائی، نہ کچھ رنگ وفا دیکھا۔[৫]

(কপালে যা লেখা ছিল, তা সবই পেয়েছি,

ভালো যা ছিল, তা ভালোই দেখলাম, মন্দ যা মন্দই দেখলাম।

আমি জফর এই ফুল বাগানে অনেক বার গমন করেছি,

কিন্তু সে ফুলের মধ্যে না প্রেমের গন্ধ আছে,

না প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন রং আছে।)

সত্যিকার অর্থে জফর সারাজীবন এক অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করেছেন। জীবনের অসহায়তা নিয়তির রূপ নিয়েছে। পৃথিবীতে অন্যের জন্য যা অবধারিত আনন্দের এমন অবস্থায় মানুষ হয় আত্ম-সমাহিত আর শ্রেষ্ঠ আত্মা এমন প্রতিকুলতার মধ্যেই জীবনের রূপ-রস ও আনন্দ খুঁজার চেষ্টা করে।

ভাগ্যহত কবি সম্রাট জফরের মধ্যেই সেই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি মনের সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন নিজের সমাহিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে। নিষ্ক্রিয় জীবনের হাতে আত্মসমর্পণ হয়তো পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বাধ্যগতভাবে কোন মানুষ করে থাকে, কিন্তু সত্যিকার কোন কবির পক্ষে তা অসহ্য জালা। আর অসহ্য সেই জালার প্রকাশই হলো কবিতা।

কবি সম্রাট জফরের মধ্যে তাই ঘটেছে। কবি সম্রাট বলেন–

مینہ خوب برستا ہے جو ہوتی ہے ہوا بند

بہتے ہیں ظفر اشک دم ضبط فغاں اور[৬]

(বাতাস বন্ধ হলে মেঘ

অধিক বারিবর্ষণ করে

হে জফর, কান্না চেপে রাখলে

চোখের পানি বেশি ঝরে পরে।)

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেষ্ঠ আত্মা নিজের মধ্যে সমাহিত হয়েও মনুষ্যত্বের সন্ধান করে এবং তখন তার পরিচ্ছন্ন বিবেক উচ্চারণ করে গভীর অনুতাপ। কবি সম্রাট জফর তাঁর পরিচ্ছন্ন বিবেকের মাধ্যমে তেমনি গভীর অনুতাপ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি বলেন–

جو عرش سے ہے فرش تلک آدمی میں ہے دیکھا آنکھ کھول کر

کیا کیا نہیں ہے اس میں کہ سب کچھ اسی میں ہے پر چاہئے نظر

دل پہلا رنگ کدرت سے صاف کر مانند آئینہ

پھر تو بغور دیکھ کہ اس آرسی میں ہے کیا حسن جلوہ گر۔[৭]

(আকাশ ও জমিনের মাঝে যা কিছু

আছে তা সবই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান,

চোখ খুলে তুমি তা দেখ,

কি সেখানে নেই? সবই আছে,

শুধু দেখবার জন্য মত্যে দৃষ্টি প্রয়োজন।

প্রথমে নিজের মনকে খুলস থেকে

পরিষ্কার করো আয়নার মতো

তারপর লক্ষ্য করে দেখ সে

আরসিতে প্রতিবিম্ব হয়েছে কি অপূর্ব সৌন্দর্য।)

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। এবং সে বিদ্রোহে সিপাহী মঙ্গল পান্ডে নিহত হয়ে ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। সিপাহী বিদ্রোহের হোতা বলে ইংরেজগণ ভারত সম্রাটকে অভিযুক্ত করে এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু বার্ধক্যের জন্যে করুণা করে সেই দণ্ডাদেশ মাফ করে কবি সম্রাটকে রেংগুনে নির্বাসিত করেছিল। কারাগারে তাঁর দুই পুত্রের কর্তিত মস্তক থালায় ঢেকে তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল, বৃদ্ধ সম্রাট থালার আবরণী সরিয়েছিলেন নিজের হাতে, সারা দিনের দুশ্চিন্তায় কাতর বৃদ্ধ সম্রাট

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুধায় অন্ন কামনা করেছিলেন আবরণীর অন্তরালে। পরাজিত ভাগ্যহত এক বৃদ্ধের সংগে যা এমন নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছিল ইতিহাস তাদের দিয়েছে শুধু ধিক্কার। [৮]

রেংগুনে বন্দী কবি সম্রাটের একখানা গজল বর্ণনা করার মাধ্যমে বাহাদুর শাহ জফরের জীবন কাহিনী সমাপ্ত করছি। গজল খানি নিম্নরূপ–

لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار میں

کس کی بنی ہے عالمِ ناپائدار میں

بُلبُل کو باغباں سے نہ صَیّاد سے گلہ

قسمت میں قید لکّھی تھی فصلِ بہار میں

کہہ دواِن حسرتوں سے کہیں اور جابسیں

اتنی جگہ کہاں ہے دلِ داغدار میں

ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان

کانٹے بچھا دیے ہیں دل لالہ زار میں

عُمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن

دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں

دِن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی

پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کُنج مزار میں

Dhaka University Institutional Repository

کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے

دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں[৯]

(নির্জন এই জনপদে মন ভালো লাগে না,
নশ্বর এই পৃথিবীতে কারই বা বাসনা পূর্ণ হয়েছে?

বুলবুল তার সমব্যাথী কিংবা শিকারী
কারও অপবাদ উচ্চারণ করছে না,
বসন্তকালেই ভাগ্য এই বন্দী
জীবন নির্ধারিত করে রেখেছিল।

এই মনস্তাপগুলিকে বলে দাও
অন্য কোন স্থান খুঁজে নিতে,
কারণ এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে
আর এতটুকু জায়গাও বাকি নেই।

গোলাপের একটি ফুল ভালোবেসেই
বুলবুল পরিতুষ্ট আছে,
বিপুল ফুলবনের সর্বত্র কাঁটা বিছিয়ে
দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ আয়ু চেয়ে এনেছিলাম চারটি দিনের জন্য,

*Dhaka University Institutional Repository*

তার মধ্যে দু'টি কেটে গেলো
অনাগত আশার মধ্যে, আর দু'টি প্রতিক্ষায়।

জীবনের দিন শেষ হলো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে,
এখন পদদ্বয় প্রসারিত করে কবরে শুতে পারবো

জফর কত দুর্ভাগ্য সমাধিস্থ হওয়ার জন্য,
সে বন্ধুদের গলিতে দুই গজ জায়গা
পর্যন্ত লাভ করতে পারলোনা।)

Dhaka University Institutional Repository

**তথ্যসূত্রঃ**

১। প্রফেসর নুরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃঃ ১২৭

২। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৭

৩। প্রফেসর নূরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃ : ১২৭

৪। মনির উদ্দীন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৮০

৫। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৮১

৬। প্রগুক্ত, পৃ : ১৮৩

৭। প্রাগুক্ত, পৃ : ১৮২

৮। প্রফেসর নুরুল হাসান নকবী, *তারিখে আদাবে উর্দু*, পৃঃ ১২৭

৯। মনির উদ্দিন ইউসুফ, *উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ : ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

# উপসংহার

মির্যা আসাদল্লাহ খাঁ গালিব উপমহাদেশের একজন বিস্ময়কর কাব্য প্রতিভা। তিনি শুধুমাত্র কবিই নন, ছিলেন যুগ প্রবর্তক। ক্ল্যাসিক্যাল এবং আধুনিক উভয়ের সংমিশ্রণে গালিব হয়ে উঠেছিলেন উর্দু সাহিত্যের একজন ধ্রুপদি কবি।

গালিবের কবি-মানস আশ্চর্য বৈচিত্র্যে ভাস্বর। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তার কবিতা। কোন বিশেষ একটি মাত্র বিষয় বা আবেগে স্থিত নয় তার কবি-কর্ম। বরং তিনি তার কবিতায় আত্মম্ভরিতা, কৌতুক ও রসিকতা, প্রেম ও সৌন্দর্য, দর্শন তত্ত্ব, সুফিবাদ, প্রকৃতির চিত্রায়ণ, বিভিন্ন চরিত্রের চিত্রায়ন, বর্ণনাভঙ্গী, নতুনত্ব সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন। মির্যা্ রফী' সওদা ও মীর তকী মীরের পর থেকে উর্দু কবিতার যে গতানুগতিকতা, বাক-সর্বস্বতা, তুচ্ছতা ও সামাজিক উদাসীনতা প্রসার লাভ করেছিল, গালিবের মাধ্যমে তার অবসান হয়। তার মাধ্যমে উর্দু কবিতা তার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ভঙ্গিটি খুঁজে পায়।

তিনি ফার্সি কবি বেদিলের কবিতা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। যার ফলে তার প্রাথমিক পর্যায়ের অধিকাংশ কবিতাই দুর্বোধ্য। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভার বলে গালিব একজন মহান কবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

প্রেম, মদিরা, রহস্যবাদ এই ছিল উর্দু কাব্যের জগত। প্রাথমিক ও মধ্যযুগের কবিরা এই প্রচলিত কাব্যধারা থেকে মুক্ত হতে পারেননি, অন্য অর্থে-মুক্ত হতে চাননি। সেই জন্য তাঁদের কবিতা একেবারেই কৃত্রিম ও কাল্পনিক রয়ে যায়। এ ব্যাপারে তাঁদের অনুভূতি ছিল কম। এর চেয়েও উদ্বেগের বিষয় ছিল, জীবন ও জগতের নানা সমস্যার ব্যাপারে তাঁদের কবিতায় তেমন কোন লেখা হচ্ছিল না। কবিরা তাদের তৈরী একটি নির্দিষ্ট কল্পনার জগতেই রয়ে গিয়েছিলেন।

গালিব এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রথম কবি। অবশ্য শুরুতে তিনিও তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়ের উপর কবিতা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি তার অসারতা বুঝতে পারেন। সেই জন্য কবিতাকে অধিক যুক্তিসঙ্গত ও জীবনঘনিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে তিনি এক নতুন সুর সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি জীবন ও তার নানাবিধ সমস্যা, মানুষ ও তার হৃদয়ের নানাবিধ ভাবধারা, প্রেম ও মনোবৈজ্ঞানিক প্রভাব

ও প্রতিক্রিয়া ইত্যকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পরম অনুভবের বিষয়। এর ফলে পাঠক গভীর আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু এটাও স্বাভাবিক ছিল যে, গালিব তাঁর পূর্বসরীদের দ্বারা স্থাপিত দু'শ বছরের পারস্পরিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন করতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে, গালিবের কবিতা ক্ল্যাসিক এবং আধুনিক উভয়ের সংমিশ্রণে উর্দু কাব্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

বাংলা ভাষায় ভিন্নভাষী কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা অনেক করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে গালিবের উপস্থিতি তেমন একটা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় গালিবের চর্চা অনেকটা উপেক্ষিতই বলা চলে। তবে তার কাব্যের দুর্বোদ্ধতা এক্ষেত্রে প্রধান কারণ হতে পারে। একজন উপেক্ষিত অথচ বিস্ময়কর প্রতিভাবান একনিষ্ঠ সাধক কবির যথার্থ মুল্যায়নের উদ্দেশ্যেই আমি এ গবেষণা কর্মের প্রয়োজনিয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করেছি।

উপরিউক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, আমার এ সামান্য প্রয়াসের কারণে যদি গালিবের উর্দু কাব্যের গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীগণ সামান্য উপকৃত হয়, তাহলে আমার এ ছোট্ট প্রয়াসকে আমি স্বার্থক বলে মনে করব ।

*Dhaka University Institutional Repository*